INTERMEDIATE BENGALI SELECTIONS

INTERMEDIATE BENGALI SELECTIONS

THIRD EDITION

(*Thoroughly Revised*)

PUBLISHED BY THE

UNIVERSITY OF CALCUTTA

1930

প্রথম সংস্করণের

ভূমিকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভার অনুমোদন-ক্রমে এই রচনা-সংগ্রহ প্রকাশিত হইল। কিন্তু আজ আমাদের বিশেষ দুঃখ এই যে, যাঁহার আগ্রহে, যত্নে ও উৎসাহে এই সংগ্রহ-কার্য্য আরব্ধ হইয়াছিল, আমরা তাঁহাকে ইহা দেখাইতে পারিলাম না।

রচনা-সংগ্রহের বিশেষ সুবিধা এই যে, ইহার ভিতর দিয়া ছাত্রগণের প্রখ্যাত-নামা লেখকগণের বিশেষ বিশেষ লেখার সহিত সহজেই পরিচয় ঘটে এবং তাঁহাদের অন্যান্য রচনা পড়িবার আকাঙ্ক্ষা তাহাদের মধ্যে স্বতঃই স্ফুরিত হয়। তদ্ভিন্ন, একই পুস্তকে নানা বিষয়িণী রচনার সমাবেশ থাকায় ভাব-সম্পদ্-বৃদ্ধিরও বিশেষ সুবিধা ঘটে। এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই রচনা-সংগ্রহ সম্পাদিত হইল। ইহাতে বঙ্গ-সাহিত্যের বিখ্যাত লেখকগণের রচনা যথাসম্ভব মুদ্রিত হইয়াছে এবং কয়েকটী রচনার এমন অংশ প্রদত্ত হইয়াছে যে, উক্ত রচনাগুলি পাঠকালে যেন মূল পুস্তক পড়িবার স্পৃহা জাগরিত হয়।

পরিশেষে এই পুস্তকে যে সমস্ত রচনা গৃহীত হইয়াছে, তজ্জন্য যে সমস্ত স্বত্বাধিকারী আমাদিগকে রচনাগুলি প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

* তারকা-চিহ্নিত অংশগুলি স্বত্বাধিকারীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

* তারকা-চিহ্নিত অংশগুলি স্বত্বাধিকারীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

তারকা-চিহ্নিত অংশগুলি স্বত্বাধিকারীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

সূচীপত্র—গদ্যাংশ

তারকা-চিহ্নিত অংশগুলি স্বত্বাধিকারীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

---

* তারকা-চিহ্নিত অংশগুলি স্বত্বাধিকারীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

পদ্যাংশ

তারকা-চিহ্নিত অংশগুলি স্বত্বাধিকারীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

* তারকা-চিহ্নিত অংশগুলি স্বত্বাধিকারীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

রচয়িতা ও বিষয়	যে পুস্তক হইতে গৃহীত	পত্রাঙ্ক
গিরিশচন্দ্র ঘোষ—		
*পাণ্ডব-গৌরব (শ্রীকৃষ্ণ ও ভীম)	পাণ্ডব-গৌরব ...	২৯৪
*সিদ্ধার্থের বৈরাগ্য ...	বুদ্ধদেব ...	৪১২
শ্রীকামিনী রায়—		
*পুণ্ডরীক ...	আলো ও ছায়া ...	৩০১
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—		
*ভারতবর্ষ ...	গান ...	৩০৭
*বঙ্গভাষা ...	ঐ ...	৩০৯
*প্রতিমা ...	ঐ ...	৩৫৩
*স্বদেশ আমার ...	...	৪৩২
শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—		
শেষ ...	প্রচার (মাসিক পত্র) ...	৩১০
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—		
*কয়াধু ...	বিদায়-আরতি ...	৩১'
চিত্তরঞ্জন দাশ—		
অন্তর্য্যামী	...	৩১

* তারকা-চিহ্নিত অংশগুলি স্বত্বাধিকারীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

* তারকা-চিহ্নিত অংশগুলি স্বত্বাধিকারীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

* তারকা-চিহ্নিত অংশগুলি স্বত্বাধিকারীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

---

* তারকা-চিহ্নিত অংশগুলি স্বত্বাধিকারীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

পদ্যের প্রথম পংক্তির সূচী

(অকারাদিক্রমে সজ্জিত)

গদ্যাংশ

INTERMEDIATE BENGALI SELECTIONS

জাতীয় ভাব—ইহার উপাদান

স্বদেশের এবং স্বজাতির প্রতি অনুরাগ কাহারই কখন একেবারে যাইতে পারে না। অন্তঃকরণ-বৃত্তির সংগঠন ইন্দ্রিয়-দ্বারা সংগৃহীত বাহ্যবস্তুনিচয়ের বিভূতি-সমবায়েই জন্মে। সকল দেশেরই বাহ্যবস্তুসমূহের প্রকৃতিতে এক একটী বিশেষ লক্ষণ আছে। একদেশজাত এবং একদেশপালিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে বাহ্য প্রকৃতি একরূপ হওয়াতে এবং একদেশজাত জনগণ পরস্পর সংসৃষ্ট থাকাতে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ-বৃত্তিও একরূপ হইয়া যায়। এই একরূপতাই স্বদেশের এবং স্বজাতির প্রতি ভালবাসার গূঢ় কারণ এবং সেই কারণ, পুরুষপরম্পরাক্রমে কার্য্যকারী হওয়াতে জাতীয় ভাবটী মনুষ্যের অন্তরাত্মাকে অতি গূঢ়তর রূপেই অধিকার করিয়া থাকে।

উল্লিখিত কারণসম্ভূত মৌলিক জাতীয় ভাবটী জনগণের অন্তঃকরণ-গঠনের বিশিষ্টতায় এবং নানা বাহ্য সাদৃশ্যে প্রকট

হয়। তাহার মধ্যে (১) আকার এবং রূপ-সাদৃশ্য, (২) ধর্ম্ম- এবং আচার-সাদৃশ্য, (৩) ভাষা এবং উচ্চারণ-সাদৃশ্য, (৪) রাজ্য-শাসন এবং সামাজিক প্রণালীর সাদৃশ্য—এই কয়েকটী অতি প্রধান। তদ্ভিন্ন পরিচ্ছদে, গৃহনির্ম্মাণে, গৃহোপকরণে, ভোজনাদি বিবিধ অনুষ্ঠানে একজাতীয় লোকের মধ্যে অনেক প্রকার সাদৃশ্য উপলব্ধ হয়। এই সকল প্রধান এবং অপ্রধান উভয় প্রকার সাদৃশ্যের উপলব্ধি এবং তজ্জনিত একটী বিশেষ সহানুভূতি, যে সকল লোকের মধ্যে দৃষ্ট হয়, সেই সকল লোকের হৃদয়ে জাতীয় ভাব বিশিষ্টরূপেই প্রকটিত হইয়া আছে, বলা গিয়া থাকে।

এস্থলে আর একটী কথা আছে। সাদৃশ্যের উপলব্ধি দুই প্রকারে হয়। উহা বিধিমুখেও হয় আর নিষেধমুখেও হয়। অমুক অমুকের সদৃশ, এরূপে সাদৃশ্য-জ্ঞান হইতে পারে; আর অমুক অমুক হইতে যত বিসদৃশ, অমুক তত বিসদৃশ নয়, এরূপেও সাদৃশ্যের উপলব্ধি হইতে পারে।

এখন এই ভারতভূমির প্রতি উল্লিখিত সূত্রগুলি প্রয়োগ করিয়া দেখা যাউক, এতদ্দেশবাসীদিগের জাতীয় ভাবে ঐ সূত্রগুলি খাটে, কি খাটে না এবং কতদূর খাটে।

প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষ একটী মহাদেশ। ইহাতে সমুদ্র এবং পর্ব্বত, ঊষরভূমি এবং উর্ব্বরভূমি, উপত্যকা এবং অধিত্যকা, জলময় প্রদেশ এবং জলহীন প্রদেশ,—সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতিক ভেদ-লক্ষণে লক্ষিত স্থান সকল আছে—ভারতবর্ষ সমস্ত পৃথিবীর প্রতিকৃতি-স্বরূপ। ফলতঃ এইটীই ভারতবর্ষ দেশের বিশিষ্টতা এবং এই জন্যই এতদ্দেশবাসীদিগের হৃদয়ে অনন্যদেশ-সাধারণ একটী বিশিষ্ট ভাবের অধিষ্ঠান হইয়া আছে। ইহারা

সংকীর্ণমনা হয় না, ইহাদের প্রকৃতি সহজেই অতি উদারভাবসম্পন্ন হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশবাসী জনগণের মধ্যে অপর যতই পার্থক্য থাকুক, ইহার সকল ভাগেরই লোকদিগের চিত্তে একটী চমৎকার উদারতা আছে। ইহারা পৃথিবীর অপর সকল জাতীয় লোক অপেক্ষা পরকে আপনার করিয়া লইতে পারে। ইহাদিগের সর্ব্ব প্রদেশেরই সুপ্রসিদ্ধ কবিগণ ভেদবুদ্ধির দোষ এবং উদারতার গুণকীর্ত্তন করেন। এই জন্যই ভারতবর্ষীয়েরা সর্ব্ব প্রদেশেই এমনি আতিথেয় যে, এক কপর্দ্দকও পাথেয় সম্বল না লইয়া বিদেশীয়েরাও এই মহাদেশের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে পারেন।

ভারতবর্ষীয়দিগের এই মৌলিক বিশিষ্টতার বিকাশ, তাহাদিগের অত্যুদার ধর্ম্ম-প্রণালীতে অতি সুস্পষ্টরূপেই দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষীয়দিগের শাস্ত্রে পরধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষভাব একেবারেই নিষিদ্ধ হইয়া আছে, এবং অধিকারিভেদের ব্যবস্থার দ্বারা ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সর্ব্ব প্রকার গোলযোগের মূল পর্য্যন্ত একেবারে নিরাকৃত হইয়া আছে। অপর কোন দেশের ধর্ম্ম-প্রণালীতে অধিকারিভেদের উল্লেখ নাই। ভারতবর্ষীয়দিগের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বিশিষ্টতার এই চরম দৃষ্টান্ত।

স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে, আচার লইয়া ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে বড়ই আঁটা-আঁটি এবং ঝগড়া-ঝাঁটি দেখা যায় বটে, কিন্তু দুই একটী ক্ষুদ্র প্রদেশ ভিন্ন ইহার কোন বিস্তৃত ভাগের প্রচলিত আচারের সহিত অন্য বিস্তৃত ভাগের প্রচলিত আচারের তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ সাদৃশ্য দেখিতে পাইবে। ইহা-দিগের পরস্পরে যতই আচারভেদ থাকুক, অপর জাতীয়দিগের সহিত যত, আপনাদিগের মধ্যে কুত্রাপি তত নয়।

ভারতবর্ষের মধ্যে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু যখন সংস্কৃত-ভাষী আর্য্যেরা সমস্ত দেশে ব্যাপক হয়েন নাই, তখন ভারতবর্ষে যত ভাষাভেদ ছিল এখন আর তত নাই। এখনও যাহা আছে, তাহার প্রতি এক সংস্কৃত ভাষার শক্তি অনুক্ষণ প্রযুক্ত হইতেছে, এবং তদ্দারা প্রদেশীয় বিভিন্ন ভাষাগুলিকে ক্রমশঃ পরস্পরের সন্নিহিত করিতেছে। কোন একখানি নব্য মহারাষ্ট্রীয়, কি তেলেগু, কি হিন্দি, কি বাঙ্গালা, কি উড়িয়া পুস্তক লইয়া দেখ, সকল ভাষাই এক সংস্কৃত হইতে আপন আপন উপজীব্য শব্দ সকল গ্রহণ করিতেছে, এবং সকল-গুলিই ভারতবর্ষীয় মাত্রের আশু বোধগম্য হইয়া আসিতেছে। উচ্চারণ-প্রণালী সকল ভারতবর্ষীয় লোকেরই যে একবিধ, তাহার অপর প্রমাণের প্রয়োজন নাই—এই বলিলেই হইবে যে সংস্কৃত বর্ণমালাতে ভারতবর্ষের সকল ভাষাই লিখিত হয়; তামিল ভাষাতে সকল বর্ণের ব্যবহার হয় না বটে, প্রতি বর্গের আগুক্ষর-দ্বারা তদ্বর্গীয় সকল বর্ণের কার্য্যসিদ্ধি হয়, কিন্তু তাহাতে উচ্চারণের যেমন পার্থক্য বুঝায়, তাহা তেমন মৌলিক পার্থক্য নহে, সুতরাং কালক্রমে সে পার্থক্যও বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। মুসলমানদিগের কতক শব্দের উচ্চারণ এরূপ যে সংস্কৃত বর্ণমালায় সেগুলি অবিকল লিখিত হয় না। কিন্তু খ এবং জ এই দুইটী মাত্র বর্ণ সৃষ্ট হওয়াতে সে ত্রুটি আর লক্ষিত হয় না। আর বঙ্গদেশীয় মুসলমানদিগের কাব্য গ্রন্থাদিতে ঐ ত্রুটি তাঁহাদিগের নিকটেও ধর্ত্তব্য হইত না।

সমস্ত ভারতবর্ষের রাজ্যশাসন এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে এক হইয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের অধীশ্বরী এখন ভারতেশ্বরী হওয়াতে আমরা সকল ভারতবর্ষীয় এক সম্রাটের অধীনে এক মহাসাম্রাজ্যবাসী বলিয়া

আপনাদিগকে সুস্পষ্টরূপেই জানিতেছি। এক্ষণে আমাদের সাধারণ সুখ, দুঃখ, আশা, ভরসা, আকাঙ্ক্ষা এবং নৈরাশ্য এক-সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এতদূর না হউক, কখন কখন ভারতবর্ষের অতি সুবিস্তৃত ভূমিভাগ সকল একচ্ছত্রের অধীন হইত—মান্ধাতা, শ্রীরামচন্দ্র, যযাতি, যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, অশোক প্রভৃতি আর্য্য নরপালগণ সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন—আর আকবর্ সাহ প্রভৃতি কয়েকজন মুসলমান সম্রাট্ও ভারতভূমির অনেকানেক প্রদেশ আপনাদিগের করতলস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সেই সকল সাম্রাজ্য-স্থাপনের ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাগের পরস্পর-সম্মিলনোপায় অনেক দূর সুসিদ্ধ হইয়াছিল। তাহার উপর এক্ষণে যে অচ্ছেদ্য, অভেদ্য আয়স শৃঙ্খলে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ দৃঢ়সম্বদ্ধ হইল—ইহার ফল আরও অনেক অধিক হইবে এবং সত্বরেই ফলিবে।

সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-প্রণালীর ন্যায়, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই যে সমপ্রকৃতিক তাহা অপর জাতিদিগের রীতি-পদ্ধতির সহিত তুলনা করিলেই স্পষ্টরূপে প্রতীত হয়। অপর জাতিদিগের সহিত আমাদের সকলেরই পার্থক্য যত অধিক—নিজেদের মধ্যে পৃথক্ ভাব তত নয়। ভারতবর্ষের যেখানেই যাইবে, সর্ব্বত্রই ঘর-দ্বারের শ্রীছাঁদ, খাওয়া-দাওয়ার পারিপাট্য, ক্রিয়া-কলাপের রীতি-পদ্ধতি মোটামুটি একই প্রকার দেখিতে পাইবে।

অতি সুবোধ এবং বহুদর্শী কোন ইউরোপীয়ের সহিত ১৮৬৩ অব্দে, এই সকল বিষয়ে আমার কথা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—"ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে পরস্পর যেরূপ পৃথক্ ভাব আছে, তাহা কোন্ বৃহৎ সাম্রাজ্যে নাই?—রুসিয়ার

ভিতরে, অষ্ট্রীয়ার ভিতরে ইহা অপেক্ষা অধিক না হউক, নূ্যন নয়। এখন মৌলিক বর্ণভেদের পার্থক্য ধরিয়া ইউরোপে জাতি-সংঘটনের কতক চেষ্টা হইতেছে। ফরাসী সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়ন্ লাটিন বংশীয়, স্পেনীয় এবং ইটালীয়দিগকে ফরাসীদিগের সহিত একমত করাইতে চাহেন—রুস-সম্রাট্ শ্লাভ বংশীয় সকল লোককে রুসের সহিত সম্মিলিত হইতে বলেন—টিউটন্ বংশীয় জর্ম্মনেরা প্রুসিয়ার অধিনায়কতা স্বীকার করিয়া ডেন্‌মার্ক এবং হলণ্ডের প্রতি অতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। বিভিন্ন জাতীয়দিগের স্ব স্ব বর্ণাত্মকতা লইয়া অনেকটা লড়াই-ঝগড়া, মারামারি, কাটাকাটি হইবে এবং ইউরোপীয়দিগের জাতি-সংঘটনে কতকটা বর্ণাত্মকতা সংসাধিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু জাতীয় ভাব বর্ণাত্মকতাতেই নিবদ্ধ নয়। দেখ, মান্দ্রাজ-প্রদেশীয় লোকেরা তোমার বর্ণের লোক নহে, সে বিষয়ে তাহাদের অপেক্ষা আমার সহিত তোমার মিল অধিক। কিন্তু মান্দ্রাজীদের সহিত তোমার ধর্ম্মে মিল, সামাজিক রীতিতে মিল, আর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, আর একটী বিষয়ে মিল।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সে সর্ব্বপ্রধান বিষয়টী কি? তিনি বলিলেন—“লোক সকলের মধ্যে সকল প্রকার বিভেদকে নষ্ট করিয়া সম্মিলন এবং একতা জন্মাইবার অমোঘ উপায়—এক রাজার শাসন এবং এক শাসনপদ্ধতি; এই উপায়ের দ্বারা বিভিন্ন প্রকৃতিক, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন বর্ণসম্ভূত জনগণের মধ্যেও জাতীয় ভাব জন্মে, কারণ, এক শাসনপদ্ধতির অবশ্যম্ভাবী ফল জনগণের সমসুখদুঃখতা বা সহানুভূতি; এবং তাহাই জাতীয় ভাব জন্মিবার সর্ব্বপ্রধান কারণ, এবং ঐ ভাবের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।”

তিনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কতকটা অবিকল ফলিয়াছে। তাঁহার কথা যে ইউরোপ-সম্বন্ধে আরও ফলিবে, তাহার অনেক চিহ্ন স্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে। তিনি ভারতবর্ষীয়দিগের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও কি সুসিদ্ধ হইবে না? তাহারও কি অস্ফুট লক্ষণ দেখা যাইতেছে না? আমার বোধ হয় ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে জাতীয় ভাব-গ্রহণের প্রকৃত অধিকারীর সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে, ইহাদিগের পরস্পর সহানুভূতি দিন দিন বাড়িতে থাকিবে, এবং তাঁহার অনুমান ঠিক হইয়া দাঁড়াইবে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা

যদি জিজ্ঞাসা করি, হে আত্মন্! ধর্ম্ম-জীবনের বাল্যকালে কি মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলে? আত্মা উত্তর দেয়—অগ্নিমন্ত্রে। বাল্যকালাবধি আমি অগ্নিমন্ত্রের উপাসক, অগ্নিমন্ত্রেরই পক্ষপাতী। অগ্নির অবস্থাকে পরিত্রাণের অবস্থা জ্ঞান করি। অগ্নিমন্ত্র কি? শীতলতা কি বুঝিতে হইলে, উত্তাপ বুঝিতে হয়। আমি দেখিয়াছি, অনেক জীবনে শীতলতা থাকে, অগ্নি থাকে না; অনেক জীবনে অগ্নি থাকে, শীতলতা থাকে না। অনেকের শীতল স্বভাব, মনের ভিতরে শান্তি, তাঁহারা কার্য্যবিহীন, তাঁহাদের কার্য্যে অত্যন্ত ঠাণ্ডা ভাব। গতি মৃদু, কথা অগ্নিবিহীন, হৃদয়ে তেজ অল্প, চক্ষু কোমল,—এই সকল ব্যাপার দেখিলে শৈত্যপ্রধান জীবন নির্দ্ধারণ করি। পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছেন, তাঁহারা শীতলতা ব্রত বলিয়া সাধন করেন; তাঁহারা চলেন শীতলভাবে, কার্য্য করেন শীতলভাবে; সাধন যদি শেষ করিতে হয়, শেষ করেন শীতলভাবে। তাঁহারা শীতল প্রদেশেরই অন্বেষণ করেন; বাস করেন শীতল প্রদেশ লইয়া। তাঁহারা শীতল যোগ সাধন করিতে চান; শীতল মুক্তি পাইবার অভিলাষী হন। স্বর্গে সেখানেও শীতল স্থানে শীতলভাবে থাকিবার আশা করেন। যদি পৃথিবীতে তাঁহাদের সম্মুখে অগ্নি ও জল স্থাপন করা হয়, তাঁহারা অগ্নি ছাড়িয়া জলে প্রবেশ করেন। স্বর্গীয় অগ্নি ও জল যদি তাঁহাদিগকে দেওয়া হয়,

আশা ও ভক্তির সহিত তাঁহারা জলের দিকে দৃষ্টি করেন। কবে সেই জল পাইবেন, কেবল এই আশা করেন।

শীতলতা যদি প্রধান ভাব হয়, তবে তাহা নিস্তেজ করে মনুষ্যের স্বভাবকে; শিথিল করে স্বভাবের বন্ধনকে। তেজ যদি থাকে, তাহা নিস্তেজ হয়; শক্তি শক্তিহীন হয়; বীর্য্য, উদ্যম অবসন্ন হইয়া পড়ে। জল আসিয়া সমস্ত অগ্নিকে নির্ব্বাণ করে, ভীরুতা আসিয়া সাহসকে গ্রাস করে; সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য আসিয়া উদ্যম, উৎসাহ বলিয়া যা কিছু উত্তেজক ভাব আছে, এক এক করিয়া সমুদয়কে নির্ব্বাসিত করে। ধর্ম্ম-ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া শয্যাশায়ী হইবার উদ্যোগ করে তাহারা, যাহারা শীতলতা ভিন্ন আর কিছুই চায় না। নিষ্ক্রিয় উপাসনা ও বিশ্রামের পক্ষপাতী হইয়া শৈত্যপ্রধান জীবন ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইতে থাকে। দুঃখ যেদিকে, সেদিকে তাহারা যাইবে না; যেখানে শান্তি, নির্ভয়, সেইখানে গিয়া লুকাইয়া থাকিবে। এ সমুদয়ের বিপরীত দিকে যাহা দেখিতে পাও, তৎসমুদয় অগ্নি। এ সকলের বিপরীত ভাব অগ্নিপ্রধান জীবনে দেখিতে পাইবে। এই ব্যক্তির জীবনে, গোড়া হইতে এ পর্য্যন্ত, এই উৎসাহ-উদ্যমের অগ্নি ক্রমাগত জ্বলিতেছে। ইহা যে সাময়িক বীরত্বের ভাবে দেখা দিতেছে, তাহা নয়। কখনও কখনও দেখা যাইতেছে, তাহা নয়। ধর্ম্মের অভিধানে লেখা আছে, উত্তাপের অর্থই জীবন; উত্তাপের বিপরীত মৃত্যু। শরীর যদি সম্পূর্ণরূপ শীতল হইয়া পড়ে চিকিৎসকেরা সিদ্ধান্ত করিবেন, মৃত্যু। কিছুমাত্র অগ্নি নাই, একটুও উত্তাপ নাই, দেখিলেই বলিবেন, প্রাণ-অগ্নির নির্ব্বাণ হইয়াছে। ধর্ম্ম-জীবনেও উত্তাপ না থাকিলে মৃত্যু। এই জন্যই বাল্যকাল

হইতে আমি অগ্নির পক্ষপাতী; অগ্নিমন্ত্রেই আমার দীক্ষা একটু ঠাণ্ডাভাব দেখিলেই মন ছুড়্‌ছুড়্‌ করে।

শরীরে হাত দিলেই ভিতরে জীবন কি মৃত্যু বুঝা যায়; আত্মাকেও দেখিবামাত্র তেমনই জীবিত কি মৃত জানিতে পারা যায়। আমি পাপী কিনা বুঝিতে বরং সময় লাগে, কিন্তু জীবন আছে কিনা অতি সহজেই জানা যায়। কিসে? উত্তপ্ত কি শীতল দেখিলেই তাহা নির্দ্ধারণ করা যায়। এই কারণেই প্রার্থনা করি, সাধন করি, কিসে আত্মা উত্তাপযুক্ত, 'সতেজ থাকে। অগ্নির ভিতরে জীবন থাকে বলিয়াই অগ্নিকে আমি বরণ করি, আলিঙ্গন করি ও অত্যন্ত ভালবাসিয়া থাকি। উত্তাপ দেখিলেই ভরসা হয়; আনন্দ হয়, উৎসাহ হয়। যদি দেখি, অগ্নির তেজ কমিতেছে, বুঝি, এবার এ লোক জলে ঝাঁপ দিয়া মরিবে। যদি দেখি, পাঁচ বৎসরের উৎসাহের পর কেহ ঠাণ্ডা হইতেছে, বুঝিয়া লই, এ লোক এবার পাপ করিতে চলিল, এবার মৃত্যু আসিয়া ইহার ঘাড় ধরিবে। এই জন্যই উত্তাপবিহীন অবস্থাকে অপবিত্র অবস্থা মনে করিতাম। যে দিন প্রাতঃকালে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত না হইয়া শয্যা হইতে উঠিতাম, মৃত্যু ভাবিতাম। নরক ও শীতল ভাব, আমি একই মনে করিতাম। কি মনের চারিদিকে, কি সামাজিক অবস্থার চারিদিকে, সততই উৎসাহের অগ্নি জ্বালিয়া রাখিতাম। একদলের কাছে সেবা করিলাম, আর একটী দল কবে হইবে; দশটী দল প্রস্তুত করিলাম, আর দশটী দল কবে প্রস্তুত করিব, ইহারই জন্য ব্যগ্র থাকিতাম। এক বিভাগে কাজ করিতাম, আর এক বিভাগে কবে কাজ করিব; কতকগুলি লোকের সঙ্গে আলাপ করিলাম, আর কতকগুলি লোকের সঙ্গে কিসে আলাপ করিতে পাইব;

কতকগুলি শাস্ত্র সঙ্কলন করিয়া সত্য সংগ্রহ করিলাম, পাছে সেই সত্যগুলি লইয়া থাকিলে সেগুলি পুরাতন হইয়া পড়ে, এইজন্য কিরূপে অপর কতকগুলি পড়িয়া সত্য সংগ্রহ করিব, কেবল এই চেষ্টাই ছিল। ইহাই উত্তাপের অবস্থা।

ক্রমাগত নূতন ভাব লইবার, নূতন পাইবার, নূতন সম্ভোগ করিবার ইচ্ছা হইতেছে। এ লোক ক্রমাগত নূতন দিকেই দৌড়িতেছে। নূতন মাত্রই উত্তাপবিশিষ্ট; পুরাতনের অর্থই শীতল। কত ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্ম দেখিলাম; চাকরী পুরাতন হইল, পাঠ অধ্যয়ন পুরাতন হইল, বড় বড় যুবার মৃত্যু হইল। কত উৎসাহী পুরুষ ছিলেন,—পাপ করিলেন না, নরহত্যা করিলেন না, অবশেষে জলে ডুবিয়া মরিলেন। কত ব্রাহ্ম অনেক দিন বৈরাগ্য সাধন করিলেন, অবশেষে তাঁহাদের জীবন যাই শীতল হইয়া আসিল, সংসার তাঁহাদের নিকট হইতে সুদ শুদ্ধ আসক্তি আদায় করিল, টাকার লোভে শেষটা মরিতে হইল। অনেক উৎসাহী যুবা দেখিয়াছিলাম, তাঁহারা এ বিভাগে কি ও বিভাগে, এ দলে কি ও দলে, এ গ্রামে কি ও গ্রামে, কোথায় যে লুকাইয়া রহিলেন, দেখা যায় না। এক সময়ে কেমন উৎসাহী বীরের ন্যায় ছিলেন, এখন এমন ঠাণ্ডা যে কাছে বসিলেও উত্তাপ বোধ হয় না। এমনই ঠাণ্ডা যে আপনারা কেবল মরিতেছেন তাহা নয়, তাঁহাদের জীবন হইতে অপরের জীবনে জল প্রবিষ্ট হইতেছে। কত লোকেই তাহাতে মরিতেছে। পাছে হস্ত-পদ শীতল হয়, পাছে চক্ষু ঠাণ্ডা হয়, পাছে হৃদয় উদ্যমবিহীন হয়, ইহার জন্য আমি সর্ব্বদা সাবধান। একটু ঠাণ্ডা ভাব, পুরাতন ভাব দেখিলাম, মনে হইল, করি কি? কাজ-কর্ম্ম যে পুরাতন হইতেছে, উপাসনা যে পুরাতন হইতেছে;

বলিলাম "দয়াময়, এ বিপদ্ হ'তে সন্তানকে বাঁচাও।" এই বলিবামাত্র হোমের আয়োজন করিলাম, ঘি ঢালিতে লাগিলাম। ঈশ্বর যিনি অগ্নিস্বরূপ, তাঁহাকে ডাকিতে ডাকিতে দেখি, সমুদ্র, নদীর উপরে আগুন ভাসিতেছে; পর্ব্বতে আগুন জ্বলিতেছে; জীব-শরীরে পর্য্যন্ত আগুন রহিয়াছে। নব নব সত্য অমনই এদিক্ হইতে ওদিক্ হইতে প্রকাশিত হইল।

যদি মিথ্যা কথা কই তা হ'লেই কি পাপী? তা নয়। যদি উপাসনাতে ঠাণ্ডা ভাব হয়, যদি আমার কথায় শ্রোতারা ভীরু হয়, উৎসাহহীন হয়, তাহা হইলেও আমি ঘোর পাপী। কেননা পৃথিবীতে ঠাণ্ডা বিষ ঢালিতে আমি আসি নাই। অত্যন্ত নিশ্চিন্ত নিশ্চেষ্ট যদি হই, কেবল আমার সর্ব্বনাশ হইবে না, আর দশজনেরও সর্ব্বনাশ হইবে। সর্ব্বদা উত্তাপ না থাকিলে সর্ব্বনাশ হইতে পারে। এইজন্য আশাগুলিকে সতেজ করিয়া, বিশ্বাসকে সতেজ করিয়া, সতেজ উদ্যম লইয়া থাকিব। যখনই মনে হইবে শীতল ভাব আসিতেছে, বুঝিব কাম, ধূর্ত্ত ব্যবহার, কপটতা সব সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে: মনে করিব পাপের শয্যায় শয়ন করিয়াছি। উপাসনার ঘরে গিয়া যদি দেখি কেবল জল, বুঝিব, অন্ধকার উপাসনা মারিবে। ধ্যান করিতে ইচ্ছা নাই, শব্দ এক একটা বলিতেছি; মনের ভিতর দেখিতেছি, তেজের সহিত বলিতেছি না; বুঝিব, উত্তাপ নাই, মৃত্যুর ব্যাপার। কার্য্যালয়ে বসিয়া কার্য্য করিতেছি, অথচ উত্তাপ নাই; বুঝিতে হইবে, প্রভুর কার্য্য করিতেছি না, মরণের কার্য্য করিতেছি। সেই জন্যই আমি প্রথম হইতে অগ্নিমন্ত্রের আদর করিতেছি। বিশ্বাসী দলের মধ্যে শান্ত ভাব আছে, জানি। কিন্তু দোষ হউক আর গুণ

হউক আমি চিরদিনই উত্তাপপ্রিয়। নিষ্ক্রিয় হওয়া আমার পক্ষে সহজ নহে ; দল ছাড়িয়া এক স্থানে লুকাইয়া থাকা এক প্রকার অসম্ভব। অগ্নিতে মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত পূর্ণ করিয়াছি। এই ভাব লইয়া সেবা করিলাম, পরিশ্রম করিলাম, ধ্যান, সাধন করিলাম। নির্জ্জনে ব্রহ্মদর্শন কেমন তাহাও অনুভব করিলাম, সমুদয় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলাম, কিন্তু শীতলতার কূপে পড়িয়া প্রাণ হারাইলাম না, এই সৌভাগ্য মনে মনে বোধ করিতেছি।

শীতল যাহারা তাহারা ভীরু হয় ; পাঁচ দশ বৎসর সাধন করিয়া পলায়ন করে। শীতলতা এমনই যে অগ্নিকে একেবারে নিবাইয়া ফেলে। গরম কি নরম ? দেখিবে, ক্রিয়া আছে কি না ; উদ্যম আছে কি না। যদি দেখ আর বড় চেষ্টা করিতে ইচ্ছা হয় না, আর কার্য্য করিতে কোন আমোদ হয় না, আর দশজনে মিলিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে উৎসাহ হয় না, অমনই চিকিৎসক ডাক, তোমরা মরিতে বসিয়াছ। তোমরা ব্রহ্মভক্তগণ, তোমাদের ধ্যানে উদ্যম, উৎসাহ থাকিবে না ? ধর্ম্ম-কার্য্যে উত্তাপ থাকিবে না ? কখনই ইহা হইবে না। নিরাশার ঠাণ্ডা কথা তোমরা মুখে এনো না। হাত-পা যেমন গরম থাকিলে শরীরে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তেমনি কার্য্য, চিন্তা, আশা, বিশ্বাস, কথা, ব্রত, এ সমুদয়ে উত্তাপ থাকিলে ধর্ম্ম-জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাইবে। তোমার অঙ্গুলিতে এমনই উত্তাপ থাকিবে যে স্পর্শমাত্র তোমার অঙ্গুলি হইতে আমার অঙ্গুলিতে তাপ সঞ্চালিত হইয়া আসিবে। আশী বৎসরের বৃদ্ধের এমনই তেজ যে, রসনা হইতে কথা বাহির হইতেছে, অমনই লক্ষ লক্ষ লোক উত্তেজিত হইতেছে। কাছে আসিলেই লোকে

বলিবে, আশী বৎসর বয়স হইল, উৎসাহ এখনও কমিল না!
এইরূপ তেজ, উৎসাহ, উত্তাপ, অগ্নি প্রত্যেকের রাখিতে হইবে।
উৎসাহদাতা, প্রাণদাতা যিনি, তাঁহাকেই ডাকি, উৎসাহের
সহিত অগ্নিস্বরূপকে ডাকি। অগ্নি, অগ্নি, অগ্নি, রসনা ইহাই
কেবল উচ্চারণ করুক, হৃদয় সর্ব্বদা এই মন্ত্র সাধন করুক।

হে দয়াসিন্ধো! হে অগ্নিস্বরূপ ব্রহ্ম! এই পৃথিবীতে সংসার
অনেক কূপ নির্ম্মাণ করিয়া বসিয়া আছে। সুযোগ পাইলেই
মানুষকে ধরিয়া নিক্ষেপ করে, বিনাশ করে। জননি! যতক্ষণ
উত্তাপ থাকে আত্মাতে, ততক্ষণ আমরা তোমার। সংসার যদি
কূপের জলে ফেলিয়া দেয় আর উত্তাপ থাকে না, আর ধর্ম্ম সাধন
করিতে পারি না, শৈত্য আসিয়া নষ্ট করিতে থাকে। হে
প্রেমময়! আরও বাক্যে, কার্য্যে, চিন্তায় তেজ দাও, যেন
অকালে শীতলতারূপ মৃত্যুগ্রাসে না পড়ি।

এই পরম সৌভাগ্য যে, মা বলিয়া এখনও ডাকিতেছি;
এখনও দুই পার্শ্বে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে। সেই বাল্যকালে
অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি বলিয়া রোগ, সন্তাপ, বিপদ্, আপদের
মধ্যে তোমার পবিত্র চরণ পূজা করিতেছি; এখনও বন্ধু-বান্ধব
লইয়া নাচিতেছি, তোমার নামের গীত গান করিতেছি। কত
লোক আসিয়াছিলেন, কত ভাব দেখাইয়াছিলেন, তাঁহারা
অনেকেই পলায়ন করিলেন। অগ্নিমন্ত্রে যদি আমায় দীক্ষিত না
করিতে, তোমাকে পুরাতন বলিতাম, নববিধান বলিতাম না।
তুমি উৎসাহ দিয়া বাঁচাইলে। দেখিলে যখন সব পুরাতন হইয়া
আসিতেছে, তখন প্রকাণ্ড নববিধানকে পাঠাইয়া দিলে।
নির্ব্বাণপ্রায় হইতেছিল যখন সমস্ত দীপালোক, তখন প্রকাণ্ড

গ্যাসের আলোক জ্বালিলে। ধন্য, ধন্য তুমি, বলিয়া উঠিল সমস্ত সাধকগণ। তাহারা আর একশত বৎসর অধিক আয়ু লাভ করিল, সমস্ত নিরাশা, ভয় চলিয়া গেল। একটা বাদ্যের পরিবর্ত্তে একশত বাদ্য স্থাপন করিয়া, বিধানের শ্রীহরি, তোমার নাম গান করিতে লাগিলাম। এদেশের পথ-ঘাট শান্ত হইয়া আসিতেছিল, যুবক-সম্প্রদায় নিস্তেজ, নিরুদ্যম ও নিস্তব্ধ হইয়া পড়িতেছিল, কত ব্রাহ্ম ভ্রাতা, ব্রাহ্মিকা ভগিনী উৎসাহ-হারা হইয়া ধর্ম্মের পথ ছাড়িয়া সংসারে ঢুকিতেছিলেন, হে করুণাসিন্ধো উৎসাহদাতা! তোমার ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার মানস করিয়া সকল দুরবস্থার মধ্যে তুমি পথ-ঘাট সমস্ত অগ্নিময় করিয়া দিলে। নিস্তব্ধ রসনাকে এমনই উত্তেজিত করিলে যে, সেই অবসন্ন রসনা আগুনের মত কথা কহিতে লাগিল। বৃক্ষলতায় আবার তোমায় দেখিলাম, সংসারে আবার তোমায় দেখিলাম, জলের মধ্যে পুনরায় তোমাকে দর্শন করিলাম, আর আগুনের ভিতর ত কথাই নাই। গেলাম গেলাম করিয়া আবার বাঁচিলাম। পুরাতন হইতে তুমি দিলে না। নবীন উদ্যম, উত্তাপ পাইয়া রহিয়া গেলাম। পাপ না করিলেও মরিতাম; নিতান্ত মিথ্যা-বাদী শঠ না হইলেও কেবল সংসারের হাতে পড়িয়া মরিতাম। আজও যেখানে নগর-কীর্ত্তন হইতেছে, কি প্রেমমত্ত বৈরাগীদের মত্ততাই দেখিতেছি। ধন্য, ধন্য তুমি! এমনই চির-নবীন ধর্ম্ম দিয়াছ যে, কাহারও উৎসাহ আর কমিতে চায় না। আর যে কেহ কোন কালে ইহা লইয়া বলহীন, উৎসাহহীন হইয়া মরিতে পারে, একথা বিশ্বাস করি না। নববিধানে মরণ ত নাই,—শীতলতা একেবারে নাই। আমার গুণে নয়, ভাইদের গুণে নয়, তোমার

শুণে। উৎসাহ আর কমিবে না; এমন নৃত্য করিব যে আর থামে না। যে মা বলিয়া ডাকিতেছি, এ মা বলা আর শেষ হইবে না। শরীর পুড়িয়া যায় শ্মশানে, আগুন নিবিয়া যায়, মনের আগুন ত কোন মতেই নিবিবে না। যদি ব্রহ্মাগ্নিতে কেহ শরীর-মন পূর্ণ করিতে পারে, দেখিবে এ অগ্নি নিবিবার নয়। কি অগ্নিই জ্বালিলে! ভক্তির আগুন, বিশ্বাসের আগুন, প্রেমের আগুন জ্বালিয়াছ। এ আগুনে ত কেউ মরিবে না। এ অগ্নি লইয়াই থাকি। এই সুখেই জীবন কাটাই, আশীর্ব্বাদ কর। অক্ষয় ব্রত দাও, অক্ষয় উৎসাহ দাও, যাহার কোন ক্রমেই নির্ব্বাণ হয় না। অগ্নির ভাবে উৎসাহিত কর, সেই ভাবে নৃত্য যেন করি। যে নৃত্য থামে না, সেই নৃত্যে নাচাও। যে অগ্নির নির্ব্বাণ হয় না, সেই অগ্নি জ্বাল। তোমার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি, দয়াময়, আমাদিগকে এই ভিক্ষা দাও।

কেশবচন্দ্র সেন।

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা

হল্‌দীঘাটার যুদ্ধ

তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। একদিকে অসহ্য অবমাননার প্রতিশোধ-বাঞ্ছা, অপরদিকে শিশোদীয়া-কুলের চিরস্বাধীনতা-রক্ষার স্থির-প্রতিজ্ঞা। একদিকে মোগল ও অম্বরের অসংখ্য সুশিক্ষিত সৈন্য, অপরদিকে মেওয়ারের অতুল ও অপরিসীম বারত্ব।

হল্‌দীঘাটার উপত্যকায় ও উভয় পার্শ্বের পর্ব্বতের উপর দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত সজ্জিত রহিয়াছে, দলে দলে যোদ্ধৃগণ আপন আপন কুলাধিপতির চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া অপূর্ব্ব রণ দিতেছে; কখনও বা দূর হইতে তীর বা বর্শা নিক্ষেপ করিতেছে, কখনও বা কুলাধিপতির ইঙ্গিতে বর্ষাকালের তরঙ্গের ন্যায় দুর্দ্দমনীয় তেজে শত্রুসৈন্যের মধ্যে পড়িয়া ছারখার করিতেছে।

পর্ব্বত-শিখরের উপর অসভ্য-জাতিগণ ধনুর্ব্বাণহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বর্ষার বৃষ্টির ন্যায় তীর নিক্ষেপ করিতেছে, অথবা সুবিধা পাইলেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড শত্রুসৈন্যের উপর গড়াইয়া দিতেছে।

অদ্য তুমুল উৎসবের দিন, সে উৎসবে কেহ পরাঙ্মুখ হইল না, চোহান ও রাঠোর, ঝালা, চন্দাবৎ ও গাওয়ৎ, সকল কুলের যোদ্ধৃগণ ভীষণনাদে শত্রুর উপর পড়িতে লাগিল। এক দল হত হয়, অন্য দল অগ্রসর হয়; অসংখ্য সৈন্যের শবরাশির উপর দিয়া অসংখ্য সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিন্তু দিল্লীর অসংখ্য সৈন্যের বিরুদ্ধে এ বীরত্ব কি করিবে? দিল্লীর ভীষণ কামানশ্রেণী হইতে ঘন ঘন মৃত্যুর আদেশ বহির্গত হইতে লাগিল, দলে দলে রাজপুতগণ আসিয়া জীবনদান করিল।

এই বিঘোর উৎসবে প্রতাপসিংহ পশ্চাতে ছিলেন না। যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে অম্বরাধিপতির দিকে তিনি ধাবমান হইলেন, কিন্তু দিল্লীর অসংখ্য সেনা ভেদ করিয়া তথায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না।

তৎপরে প্রতাপসিংহ, সলীম যথায় হস্তী আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই দিকে নিজ অশ্ব ধাবমান করিলেন। এবার ভীষণনাদে রাজপুতগণ মোগলসৈন্য বিদীর্ণ করিয়া অগ্রসর হইল। স্তরে স্তরে মোগলসৈন্য সজ্জিত ছিল, কিন্তু বর্ষাকালের পর্ব্বত-তরঙ্গের ন্যায় সমস্ত প্রতিবন্ধক ভেদ করিয়া প্রতাপসিংহ ও তাঁহার সৈন্যগণ অগ্রসর হইলেন, বর্শা ও অসির আঘাতে মোগলদিগের সৈন্যরেখা লণ্ডভণ্ড করিয়া অগ্রসর হইলেন। সলীম ও প্রতাপসিংহ সম্মুখীন হইলেন।

দুই পক্ষের প্রসিদ্ধ যোদ্ধৃগণ নিজ নিজ প্রভুর রক্ষার্থে অগ্রসর হইলেন। অচিরে যে তুমুল হত্যাকাণ্ড, যে গগনভেদী জয়নাদ ও আর্ত্তনাদ আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। রাজপুত ও মোগলদিগের বিভিন্নতা রহিল না, শত্রু ও মিত্রের বিভিন্নতা রহিল না। দুই পক্ষের পতাকার চারিদিকে শব রাশীকৃত হইল।

প্রতাপের অব্যর্থ খড়্গাঘাতে সলীমের রক্ষকগণ ভূতলশায়ী হইল। তখন প্রতাপ সলীমকে লক্ষ্য করিয়া দীর্ঘ বর্শা নিক্ষেপ করিলেন, হাওদার লৌহে সেই বর্শা প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় সলীম সেদিন জীবনরক্ষা পাইলেন। রোষে তর্জ্জন করিয়া প্রতাপ অশ্ব ধাবমান

করাইলেন, অশ্ববর চৈতকও প্রতাপের যোগ্য লম্ফ দিয়া হস্তীর শরীরের উপর সম্মুখ-পদ স্থাপন করিল। প্রতাপের অব্যর্থ আঘাতে হস্তীর মাহুত হত হইল। হস্তী তখন প্রভুর বিপদ্ জানিয়াই যেন সলীমকে লইয়া পলায়ন করিল। তুমুল শব্দে দুর্দ্দমনীয় প্রতাপসিংহ ও তাঁহার সঙ্গিগণ পশ্চাদ্ধাবন করিলেন; মোগলসৈন্যের শ্রেণী বিদীর্ণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রতাপসিংহের সে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়া হিন্দুগণ অর্জ্জুনের কথা স্মরণ করিল, মুসলমানগণ মুহূর্ত্তের জন্য মনে মনে প্রমাদ গণিল।

তখন মুসলমানগণ নিজের বিপদ্ দেখিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। মুসলমান যোদ্ধগণ ভীরু নহে, পঞ্চশত বৎসর ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছে, অদ্য হিন্দুর নিকট অবমাননা স্বীকার করিবে না। একবার "আল্লাহু আকবর" শব্দে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিয়া প্রতাপকে চারিদিকে বেষ্টন করিল। রাজপুতগণ পলায়ন জানে না, প্রভুর চারিদিকে হত হইতে লাগিল। শরীরের সপ্তস্থানে আহত হইয়াও প্রতাপ বিপদ্ জানেন না, তখনও অগ্রসর হইতেছেন।

পশ্চাৎ হইতে কয়েকজন রাজপুত যোদ্ধা মহারাণার বিপদ্ দেখিলেন এবং হুঙ্কার শব্দ করিয়া শিশোদীয়ার পতাকা লইয়া অগ্রসর হইলেন। পতাকা দেখিয়া সৈন্যগণ অগ্রসর হইল, প্রতাপ যে স্থানে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তথায় যাইয়া উপস্থিত হইল, সবলে প্রভুকে সেই নিশ্চয়-মৃত্যু হইতে সরাইয়া আনিল। সে উদ্যমে শত রাজপুত প্রাণদান করিল।

পুনরায় প্রতাপসিংহ যুদ্ধমদে সংজ্ঞা হারাইয়া মোগলরেখার ভিতর প্রবেশ করিলেন। পুনরায় তাঁহার রাজচ্ছত্র শত্রুবেষ্টিত

দেখিয়া রাজপুতগণ পশ্চাৎ হইতে অগ্রসর হইয়া সমরোন্মত্ত বীরকে নিশ্চয়-মৃত্যুর কবল হইতে সবলে উদ্ধার করিয়া আনিল।

কিন্তু প্রতাপসিংহ অন্ত ক্ষিপ্ত—উন্মত্ত! জ্ঞানশূন্য হইয়া তৃতীয়বার মোগলসৈন্যরেখার ভিতর প্রবেশ করিলেন। এবার মোগলগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইল, রোষে হুঙ্কার করিয়া শতশত সেনা প্রতাপকে বেষ্টন করিল। প্রতাপের বহির্গমনের পথ রাখিল না। এবার মোগলগণ এই কাফের বীরকে হত করিয়া দিল্লীশ্বরের হৃদয়ের কণ্টকোদ্ধার করিবে, মানসিংহের অবমাননার প্রতিশোধ দিবে।

পশ্চাতে রাজপুতগণ মহারাণার বিপদ্ দেখিয়া বার বার তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিল; কিন্তু মোগলসৈন্য অসংখ্য, রাজপুতদিগের প্রধান প্রধান বীর হত হইয়াছে, রাজপুতগণ হীনবল হইয়াছে, এবার প্রভুর উদ্ধার অসম্ভব।

বার বার দলে দলে রাজপুতগণ প্রভুর উদ্ধার-চেষ্টা করিল, দলে দলে কেবল অসংখ্য শত্রু বিনাশ করিয়া আপনারা বিনষ্ট হইল, মোগলরেখা অতিক্রম করিতে পারিল না, এবার প্রভুর উদ্ধার করিতে পারিল না।

দূর হইতে দৈলওয়ারার অধিপতি এই ব্যাপার দেখিলেন; মুহূর্ত্তের জন্য ইষ্টদেবতা স্মরণ করিলেন, পরে আপনার ঝালাবংশীয় যোদ্ধা লইয়া সম্মুখে ধাবমান হইলেন। মেওয়ারের কেতন স্বুবর্ণ-সূর্য্য একজন সৈনিকের হস্ত হইতে আপনি লইলেন এবং মহা কোলাহলে সেই কেতন লইয়া ঝালাকুলের সহিত অগ্রসর হইলেন।

সে তেজ মোগলগণ প্রতিরোধ করিতে পারিল না, বীর দৈলওয়ারাপতি শত্রুরেখা বিদীর্ণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঝালাকুল,

যথায় প্রতাপ উন্মত্ত রণকুঞ্জরের ন্যায় যুদ্ধ করিতেছিলেন, তথায় উল্লাসরবে উপস্থিত হইলেন। সবলে প্রভুকে রক্ষা করিলেন, প্রতাপকে সেই শত্রুরেখা হইতে উদ্ধার করিয়া আনিলেন ও সেই উদ্যমে সম্মুখরণে আপনার প্রাণদান করিলেন।

পতনশীল দেহের দিকে চাহিয়া মহানুভব প্রতাপ বলিলেন, "দৈলওয়ারা! অদ্য আপনার জীবন দিয়া আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ।" দৈলওয়ারা ক্ষীণস্বরে উত্তর করিলেন, "ঝালা স্বামিধর্ম্ম জানে, বিপৎকালে মহারাণার পার্শ্ব ত্যাগ করে না।"

প্রতাপসিংহ স্মরণ করিলেন, ফাল্গুন মাসের শেষদিন রজনীতে দৈলওয়ারাপতি এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। দৈলওয়ারাপতির জীবনশূন্য দেহ ভূতলে পড়িল।

দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত যোদ্ধার মধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র সে দিন ভূতলশায়ী হইল, অবশিষ্ট আট সহস্র মাত্র যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিল। প্রতাপসিংহ অগত্যা হল্‌দীঘাটার যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। মোগলগণ জয়লাভ করিল; কিন্তু সে যুদ্ধকথা সহসা বিস্মৃত হইল না। বহু বৎসর পরে দিল্লীতে, দাক্ষিণাত্যে বা বঙ্গদেশে প্রাচীন যোদ্ধৃগণ যুবক সেনাদিগের নিকট হল্‌দীঘাটা ও প্রতাপসিংহের বিস্ময়কর গল্প বলিয়া রজনী অতিবাহিত করিত।

রমেশচন্দ্র দত্ত।

একা

(শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর উক্তি)

"কে গায় ওই ?"

বহুকাল-বিস্মৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় ঐ মধুর গীতি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। এত মধুর লাগিল কেন ? এই সঙ্গীত যে অতি সুন্দর, এমত নহে। পথিক পথ দিয়া আপন মনে গায়িতে গায়িতে যাইতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি দেখিয়া, তাহার মনের আনন্দ উছলিয়া উঠিতেছে। স্বভাবতঃ তাহার কণ্ঠ মধুর ;—মধুর কণ্ঠে, এই মধুমাসে, আপনার মনের সুখের মাধুর্য্য বিকীর্ণ করিতে করিতে যাইতেছে। তবে বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্যের তন্ত্রীতে অঙ্গুলী-স্পর্শের ন্যায় ঐ গীতিধ্বনি আমার হৃদয়কে আলোড়িত করে কেন ?

কেন কে বলিবে ? রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—নদী-সৈকতে কৌমুদী হাসিতেছে। অর্দ্ধাবৃতা সুন্দরীর নীলবসনের ন্যায় শীর্ণশরীরা নীলসলিলা তরঙ্গিণী, সৈকত বেষ্টিত করিয়া চলিয়াছেন ; রাজপথে কেবল আনন্দ—বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা বিমল চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়া, আনন্দ করিতেছে। আমিই কেবল নিরানন্দ—তাই ঐ সঙ্গীতে আমার হৃদয়-যন্ত্র বাজিয়া উঠিল।

আমি একা—তাই এই সঙ্গীতে আমার শরীর কণ্টকিত হইল। এই বহুজনাকীর্ণ নগরীমধ্যে, এই আনন্দময় অনন্ত

জনস্রোতোমধ্যে, আমি একা। আমিও কেন ঐ অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে মিশিয়া, এই বিশাল আনন্দতরঙ্গ-তাড়িত জলবুদবুদসমূহের মধ্যে আর একটি বুদ্‌বুদ্‌ না হই? বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র, আমি বারিবিন্দু, এ সমুদ্রে মিশাই না কেন?

তাহা জানি না—কেবল ইহাই জানি যে আমি একা। কেহ একা থাকিও না। যদি অন্য কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল তবে তোমার মনুষ্যজন্ম বৃথা। পুষ্প সুগন্ধি, কিন্তু যদি ঘ্রাণ-গ্রহণ-কর্ত্তা না থাকিত, তবে পুষ্প সুগন্ধি হইত না—ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট না থাকিলে গন্ধ নাই। পুষ্প আপনার জন্যও ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।

কিন্তু বারেকমাত্র শ্রুত ঐ সঙ্গীত আমার কেন এত মধুর লাগিল, তাহা বলি নাই। অনেক দিন আনন্দোত্থিত সঙ্গীত শুনি নাই—অনেক দিন আনন্দানুভব করি নাই। যৌবনে যখন পৃথিবী সুন্দরী ছিল, যখন প্রতি পুষ্পে সুগন্ধ পাইতাম, প্রতি পত্রমর্ম্মরে মধুর শব্দ শুনিতাম, প্রতি নক্ষত্রে চিত্রারোহিণীর শোভা দেখিতাম, প্রতি মনুষ্যমুখে সরলতা দেখিতাম, তখন আনন্দ ছিল। পৃথিবী এখনও তাই আছে, সংসার এখনও তাই আছে, মনুষ্যচরিত্র এখনও তাই আছে, কিন্তু এ হৃদয় আর তাই নাই। তখন সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দ হইত, আজি এই সঙ্গীত শুনিয়া সেই আনন্দ মনে পড়িল। যে অবস্থায়, যে সুখে, সেই আনন্দ অনুভব করিতাম, সেই অবস্থা, সেই সুখ মনে পড়িল। মুহূর্ত্ত-জন্য আবার যৌবন ফিরিয়া পাইলাম। আবার তেমনি করিয়া, মনে মনে সমবেত বন্ধুমণ্ডলীমধ্যে বসিলাম; আবার সেই অকারণ-সঞ্জাত উচ্চ হাসি হাসিলাম, যে কথা নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া এখন

বলি না, নিষ্প্রয়োজনেও চিত্তের চাঞ্চল্য-হেতু তখন বলিতাম, আবার সেই সকল বলিতে লাগিলাম; আবার অকৃত্রিম হৃদয়ে পরের প্রণয় অকৃত্রিম বলিয়া মনে মনে গ্রহণ করিলাম। ক্ষণিক ভ্রান্তি জন্মিল—তাই এ সঙ্গীত এত মধুর লাগিল। শুধু তাই নয়। তখন সঙ্গীত ভাল লাগিত—এখন লাগে না—চিত্তের যে প্রফুল্লতার জন্য ভাল লাগিত, সে প্রফুল্লতা নাই বলিয়া ভাল লাগে না। আমি মনের ভিতর মন লুকাইয়া সেই গত যৌবন-সুখ চিন্তা করিতেছিলাম—সেই সময়ে এই পূর্ব্বস্মৃতিসূচক সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ করিল, তাই এত মধুর বোধ হইল।

সে প্রফুল্লতা, সে সুখ আর নাই কেন? সুখের সামগ্রী কি কমিয়াছে? অর্জ্জন এবং ক্ষতি উভয়ই সংসারের নিয়ম। কিন্তু ক্ষতি অপেক্ষা অর্জ্জন অধিক, ইহাও নিয়ম। তুমি জীবনের পথ যতই অতিবাহিত করিবে, ততই সুখদ সামগ্রী সঞ্চয় করিবে। তবে বয়সে স্ফূর্ত্তি কমে কেন? পৃথিবী আর তেমন সুন্দরী দেখা যায় না কেন? আকাশের তারা আর তেমন জ্বলে না কেন? আকাশের নীলিমায় আর সে উজ্জ্বলতা থাকে না কেন? যাহা তৃণপল্লবময়, কুসুমসুবাসিত, স্বচ্ছ-কল্লোলিনী-শীকর-সিক্ত, বসন্ত-পবনবিধূত বলিয়া বোধ হইত, এখন তাহা বালুকাময়ী মরুভূমি বলিয়া বোধ হয় কেন? কেবল রঙ্গিল কাচ নাই বলিয়া। আশা সেই রঙ্গিল কাচ। যৌবনে অর্জ্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপরিমিতা। এখন অর্জ্জিত সুখ অধিক, কিন্তু সেই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী আশা কোথায়? তখন জানিতাম না, কিসে কি হয়, অনেক আশা করিতাম। এখন জানিয়াছি, এই সংসার-চক্রে আরোহণ করিয়া, যেখানকার আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিতে

হইবে; যখন মনে ভাবিতেছি, এই অগ্রসর হইলাম, তখন কেবল আবর্ত্তন করিতেছি মাত্র। এখন বুঝিয়াছি যে, সংসার-সমুদ্রে সন্তরণ আরম্ভ করিলে, তরঙ্গ তরঙ্গে আমাকে প্রহত করিয়া আবার আমাকে কূলে ফেলিয়া যাইবে। এখন জানিয়াছি যে, এ অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই। এখন জানিয়াছি যে, কুসুমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নির্ম্মলা নদীতে আবর্ত্ত আছে, ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প আছে, মনুষ্যহৃদয়ে কেবল আত্মাদর আছে। এখন জানিয়াছি যে, বৃক্ষে বৃক্ষে ফল ধরে না, ফুলে ফুলে গন্ধ নাই, মেঘে মেঘে বৃষ্টি নাই, বনে বনে চন্দন নাই, গজে গজে মৌক্তিক নাই। এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, কাচও হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল, পিত্তলও সুবর্ণের ন্যায় ভাস্বর, পঙ্কও চন্দনের ন্যায় স্নিগ্ধ, কাংস্যও রজতের ন্যায় মধুরনাদী।—কিন্তু কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গেলাম। সেই গীতধ্বনি! উহা ভাল লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু আর দ্বিতীয়বার শুনিতে চাহি না। উহা যেমন মনুষ্যকণ্ঠজাত সঙ্গীত, তেমনি সংসারের এক সঙ্গীত আছে, সংসাররসে রসিকেরাই তাহা শুনিতে পায়। সেই সঙ্গীত শুনিবার জন্য আমার চিত্ত বড়ই আকুল। সে সঙ্গীত আর কি শুনিব না? শুনিব, কিন্তু নানাবাদ্যধ্বনি-সম্মিলিত, বহুকণ্ঠপ্রসূত সেই পূর্ব্বশ্রুত সংসারগীত আর শুনিব না। সে গায়কেরা আর নাই—সে বয়স নাই, সে আশা নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যাহা শুনিতেছি, তাহা অধিকতর প্রীতিকর। অনন্তসহায় একমাত্র-গীতি-ধ্বনিতে কর্ণবিবর পরিপূরিত হইতেছে। প্রীতি সংসারে

সর্ব্বব্যাপিনী—প্রীতিই ঈশ্বর। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসারসঙ্গীত। অনন্তকাল সেই মহাসঙ্গীত-সহিত মনুষ্য-হৃদয়তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মনুষ্যত্ব কি ?

মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া কি করিতে হইবে, আজও মনুষ্য তাহা বুঝিতে পারে নাই। অনেক লোক আছেন, তাঁহারা জগতে ধর্ম্মাত্মা বলিয়া আত্মপরিচয় দেন, তাঁহারা মুখে বলিয়া থাকেন যে, পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয়ই ইহজন্মে মনুষ্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু অধিকাংশ লোকই, বাক্যে না হউক, কার্য্যে একথা মানে না, অনেক লোক পরকালের অস্তিত্বই স্বীকার করে না। পরকাল সর্ব্ববাদিসম্মত এবং পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয় ইহলোকের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া সর্ব্বজনস্বীকৃত হইলেও, পুণ্য কি, সে বিষয়ে বিশেষ মতভেদ। এই বঙ্গদেশেই এক সম্প্রদায়ের মত মদ্যপান পরকালের ঘোর বিপদের কারণ, আর এক সম্প্রদায়ের মত মদ্যপান পরকালের জন্য পরম কার্য্য। অথচ উভয় সম্প্রদায়ই বাঙ্গালী এবং উভয় সম্প্রদায়ই হিন্দু। যদি সত্য সত্যই পরকালের জন্য পুণ্য-সঞ্চয় মনুষ্যজন্মের প্রধান কার্য্য হয়, তবে সে পুণ্যই বা কি, কি প্রকারে তাহা অর্জ্জিত হইতে পারে, তাহার স্থিরতা কিছুই এ পর্য্যন্ত হয় নাই।

মনে কর, তাহা স্থির হইয়াছে; মনে কর, ব্রাহ্মণে ভক্তি, গঙ্গাস্নান, তুলসীর মালা-ধারণ এবং হরিনামসঙ্কীর্ত্তন ইত্যাদি পুণ্যকর্ম্ম। ইহাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য; অথবা মনে কর, রবিবারে কার্য্যত্যাগ, গির্জ্জায় বসিয়া নয়ননিমীলন এবং খৃষ্টধর্ম্ম ভিন্ন ধর্ম্মান্তরে বিদ্বেষ, ইহাই পুণ্যকর্ম্ম। যাহা হউক, একটা কিছু, আর কিছু হউক না হউক, দান, দয়া, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া

সর্ব্বজনস্বীকৃত। কিন্তু তাই বলিয়া, ইহা দেখা যায় না যে, দান, দয়া, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতিকে অধিক লোক জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া অভ্যস্ত এবং সাধিত করে। অতএব পুণ্য যে জীবনের উদ্দেশ্য, তাহা সর্ব্ববাদিস্বীকৃত নহে ; যেখানে স্বীকৃত, সেখানে সে বিশ্বাস মৌখিকমাত্র।

বাস্তবিক জীবনের উদ্দেশ্য কি, এ তত্ত্বের প্রকৃত মীমাংসা লইয়া মনুষ্যলোকে আজিও বড় গোল আছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে, অনন্ত সমুদ্রের অতলস্পর্শ জলমধ্যে যে আণুবীক্ষণিক জীব বাস করিত, তাহার দেহতত্ত্ব লইয়া মনুষ্য বিশেষ ব্যস্ত—আপনি এ সংসারে আসিয়া কি করিবে, তাহা সম্যক্ প্রকারে স্থিরীকরণে তাদৃশ চেষ্টিত নহে। যে প্রকারে হউক, আপনার উদরপূর্ত্তি এবং অপরাপর বাহ্যেন্দ্রিয় সকল চরিতার্থ করিয়া আত্মীয়-স্বজনেরও উদরপূর্ত্তি সংসাধিত করিতে পারিলেই অনেকে মনুষ্যজন্ম সফল বলিয়া বোধ করেন। তাহার উপর কোন প্রকারে অন্যের উপর প্রাধান্যলাভ উদ্দেশ্য। উদরপূর্ত্তির পর ধনে হউক বা অন্য প্রকারে হউক লোকমধ্যে যথাসাধ্য প্রাধান্যলাভ করাকে মনুষ্যগণ আপনাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে। এই প্রাধান্যলাভের উপায়, লোকের বিবেচনায় প্রধানতঃ ধন, তৎপরে রাজপদ ও যশ। অতএব ধন, পদ ও যশঃ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া মুখে স্বীকৃত হউক বা না হউক, কার্য্যতঃ মনুষ্যলোকে সর্ব্ববাদিসম্মত। এই তিনটির সমবায় সমাজে সম্পদ্ বলিয়া পরিচিত। তিনটির একত্রীকরণ দুর্ল্লভ, অতএব দুই একটি, বিশেষতঃ ধন থাকিলেই সম্পদ্ বর্ত্তমান বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই সম্পদাকাঙ্ক্ষাই

সমাজমধ্যে লোকজীবনের উদ্দেশ্যস্বরূপ অগ্রবর্ত্তী, এবং ইহাই সমাজের ঘোরতর অনিষ্টের কারণ। সমাজের উন্নতির গতি যে এত মন্দ, তাহার প্রধান কারণ এই যে, বাহ্য সম্পদ্ মনুষ্যের জীবনের উদ্দেশ্যস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেবল সাধারণ মনুষ্যদিগের কাছে নহে, ইউরোপীয় প্রধান পণ্ডিত এবং রাজপুরুষ-গণের কাছেও বটে।

কদাচিৎ কখনও এমন কেহ জন্মগ্রহণ করেন যে, তিনি সম্পদ্‌কে মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্যমধ্যে গণ্য করা দূরে থাকুক, জীবনোদ্দেশ্যের প্রধান বিঘ্ন বলিয়া ভাবিয়া থাকেন। যে রাজ্য-সম্পদ্‌কে অপর লোকে জীবনসফলকর বিবেচনা করে, শাক্যসিংহ তাহা বিঘ্নকর বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে বা ইউরোপে এমন অনেকেই মুনিবৃত্ত মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন যে, তাঁহারা বাহ্য সম্পদ্‌কে ঐরূপ ঘৃণা করিয়াছেন। ইঁহারা প্রকৃত পথ অবলম্বন করিয়াছেন, এমত কথা বলিতে পারিতেছি না। শাক্যসিংহ শিখাইলেন যে, ঐহিক ব্যাপারে চিত্তনিবেশ মাত্র অনিষ্টপ্রদ, মনুষ্য সর্ব্বত্যাগী হইয়া নির্ব্বাণাকাঙ্ক্ষী হউক। ভারতে এই শিক্ষার ফল বিষময় হইয়াছে। এইরূপ, আরও অনেকানেক মুনিবৃত্ত মহাপুরুষ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত হওয়াতে, ঐহিক সম্পদে অনমুরক্ত হইয়াও সমাজের ইষ্টসাধনে বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সামান্যতঃ সন্ন্যাসী প্রভৃতি সর্ব্ব-দেশীয় বৈরাগী সম্প্রদায় সকলকে উদাহরণস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করিলেই এ কথা যথেষ্ট প্রমাণীকৃত হইবে।

স্থূল কথা এই যে, ধনসঞ্চয়াদির ন্যায় সুখশূন্য, শুভফলশূন্য, মহত্ত্বশূন্য ব্যাপার প্রয়োজনীয় হইলেও কখনই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য

বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। এ জীবন ভবিষ্যৎ পারলৌকিক জীবনের জন্য পরীক্ষা মাত্র—পৃথিবী স্বর্গলাভের জন্য কর্ম্মভূমি মাত্র—এ কথা যদি যথার্থ হয়, তবে পরলোকে সুখপ্রদ কার্য্যের অনুষ্ঠানই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বটে। কিন্তু প্রথমতঃ সেই সকল কার্য্য কি, তদ্বিষয়ে মতভেদ, নিশ্চয়তার একেবারে উপায়াভাব; দ্বিতীয়তঃ পরলোকের অস্তিত্বেরই প্রমাণাভাব।

তৃতীয়তঃ পরলোক থাকিলে, এবং ইহলোক পরীক্ষাভূমি মাত্র হইলেও, ঐহিক এবং পারত্রিক শুভের মধ্যে ভিন্নতা হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। যদি পরলোক থাকে, তবে যে ব্যবহারে পরলোকে শুভ-নিষ্পত্তির সম্ভাবনা, সেই কার্য্যেই ইহলোকেও শুভ-নিষ্পত্তির সম্ভাবনা কেন নহে, তাহার যথার্থ হেতুনির্দ্দেশ এ পর্য্যন্ত কেহ করিতে পারে নাই। ধর্ম্মাচরণ যদি মঙ্গলপ্রদ হয়, তবে যে উহা কেবল পরলোকে মঙ্গলপ্রদ, ইহলোকে মঙ্গলপ্রদ নহে, এ কথা কিসে সপ্রমাণীকৃত হইতেছে? ঈশ্বর স্বর্গে বসিয়া কাজির মত বিচার করিতেছেন, পাপীকে নরককুণ্ডে ফেলিয়া দিতেছেন, পুণ্যাত্মাকে স্বর্গে পাঠাইয়া দিতেছেন, এ সকল প্রাচীন মনোরঞ্জন উপন্যাসকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। যাঁহারা বলেন যে, ইহলোকে অধার্ম্মিকের শুভ এবং ধার্ম্মিকের অশুভ দেখা গিয়া থাকে, তাঁহাদিগের চক্ষে কেবল ধনসম্পদাদিই শুভ। তাঁহাদিগের বিচার এই মূলভ্রান্তিতে দূষিত। যদি পুণ্যকর্ম্ম পরকালে শুভপ্রদ হয়, তবে ইহলোকেও পুণ্যকর্ম্ম শুভপ্রদ। কিন্তু বাস্তবিক কেবল পুণ্যকর্ম্ম কি পরলোকে কি ইহলোকে শুভপ্রদ হইতে পারে না। যে প্রকার মনোবৃত্তির ফল পুণ্যকর্ম্ম, তাহাই উভয় লোকে শুভপ্রদ হওয়াই সম্ভব। কেহ যদি

কেবল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাড়নায় বশীভূত হইয়া, অথবা যশের লালসায় অপ্রসন্নচিত্তে দুর্ভিক্ষনিবারণের জন্য লক্ষমুদ্রা দান করে, তবে তাহার পারলৌকিক মঙ্গলসঞ্চয় হইল কি ? দান পুণ্যকর্ম্ম বটে, কিন্তু এরূপ দানে পরলোকের কোন উপকার হইবে, ইহা কেহই বলিবে না। কিন্তু যে অর্থাভাবে দান করিতে পারিল না, কিন্তু দান করিতে পারিল না বলিয়া কাতর, সে ইহলোকে এবং পরলোক থাকিলে, পরলোকে সুখী হওয়া সম্ভব।

অতএব মনোবৃত্তি সকল যে অবস্থায় পরিণত হইলে পুণ্যকর্ম্ম তাহার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ স্বতঃ নিষ্পাদিত হইতে থাকে, পরলোক থাকিলে তাহাই পরলোকে শুভদায়ক বলিলে কথা গ্রাহ্য করা যাইতে পারে। পরলোক থাকুক বা না থাকুক, ইহলোকে তাহাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বটে। কিন্তু কেবল তাহাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যেমন কতকগুলি মানসিক বৃত্তির চেষ্টা কর্ম্ম, এবং যেমন সে সকলগুলি সম্যক্ মার্জ্জিত ও উন্নত হইলে, স্বভাবতঃ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, তেমনি আর কতকগুলি বৃত্তি আছে, তাহাদের উদ্দেশ্য কোন প্রকার কার্য্য নহে—জ্ঞানই তাহাদিগের ক্রিয়া। কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলন যেমন মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলিরও সেইরূপ অনুশীলন জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বস্তুতঃ সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্য মাত্র অবলম্বন করিয়া, সম্পদাদিতে উপযুক্ত ঘৃণা দেখাইয়া, জীবন-নির্ব্বাহ করিয়াছেন, এরূপ মনুষ্য কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, এমত নহে। তাঁহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প হইলেও

তাঁহাদিগের জীবনবৃত্ত মনুষ্যগণের অমূল্য শিক্ষাস্থল। জীবনের উদ্দেশ্যসম্বন্ধে এরূপ শিক্ষা আর কোথাও পাওয়া যায় না। নীতি-শাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি সর্ব্বাপেক্ষা এই প্রধান শিক্ষা। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইঁহাদিগের জীবনের গূঢ় তত্ত্বসকল অপরিজ্ঞেয়। কেবল দুই জন আপন আপন জীবনবৃত্ত লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। একজন গেটে, দ্বিতীয় জন ষ্টুয়াট মিল।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বাঙ্গালীর বীরত্ব

বাঙ্গালার পূর্ব্বে গৌরব অনেক ছিল। বাঙ্গালীর পূর্ব্ব-বীরত্বও অনেক ছিল। আপনাদের পূর্ব্ব-গৌরব-কাহিনী শুনিলে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই, এবং উপকার ভিন্ন অপকার নাই। যাঁহাদের মনোবৃত্তি বিকারগ্রস্ত হইয়াছে, তাঁহারা ইহাতে উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের জন্য আমাদের এই প্রয়াস নয়।

রঘুবংশে মহাকবি কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয়-বর্ণনায় বাঙ্গালীর সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অনুবাদ এই,—

"সেনা-নায়ক সেই রঘু, রণতরী আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ উপস্থিত বঙ্গবাসীদিগকে পরাজয় করিয়া গঙ্গার মধ্যস্থ দ্বীপে জয়স্তম্ভ স্থাপন করিলেন।"

ইহাতে বোধ হইতেছে, কালিদাস যখন রঘুবংশ লিখেন, তখন বাঙ্গালী নৌ-যুদ্ধে পটু ছিল এবং তখন বাঙ্গালা স্বাধীন ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, বালী ও যবদ্বীপেও বাঙ্গালীর জয়পতাকা উড়িয়াছিল। সমুদ্রযাত্রা ও সামুদ্রিক রাজ্য-জয়ে বাঙ্গালী যেমন যোগ্যতা দেখাইয়াছে, এমন ভারতবর্ষের আর কোন জাতি দেখাইতে পারে নাই। পাল ও সেনবংশের বীরত্বের বিবরণ আজও বাঙ্গালা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। মুঙ্গেরে যে একখানি তাম্রশাসন-পত্র পাওয়া যায়, তাহাতে লিখিত আছে, গৌড়ের অধিপতি দেবপাল দেব মুদ্গগিরিতে (মুঙ্গেরে) শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহার যুদ্ধাশ্ব কাম্বোজ দেশে

উপনীত হইয়াছিল। রাজসাহীর অনুশাসন-পত্রেও মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের এইরূপ দিগ্বিজয়-বর্ণনা দেখা যায়। ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন, উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজারা অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন; এই গঙ্গাবংশীয়দিগের আদিপুরুষ বাঙ্গালী। তমোলুক ও মেদিনীপুর প্রদেশে ইহাদের আবাস ছিল। হণ্টর সাহেব লিখিয়াছেন, বিষ্ণুপুরের ভূপতিগণ মুসলমান হইতে আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী পূর্ব্বে নিতান্ত ক্ষুদ্রজাতি ছিল না।

একজন পণ্ডিত লেখক বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে যাইয়া, বাঙ্গালীর সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন,তাহা সকলেরই পড়া উচিত। বাঙ্গালার ইতিহাসে ইঁহার লেখনী হইতে এই বাক্য নির্গত হইয়াছে,—

"পাঠানেরাই এতদ্দেশে মুসলমান-জয়পতাকা উড্ডীন করেন। ৩৭২ বৎসর পরে তাঁহাদিগের রাজত্বের শেষ সময়ে, এদেশের কত দূর তাঁহাদিগের অধিকৃত ছিল, এক বার বিবেচনা করিয়া দেখা মন্দ নহে। পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটে তাঁহাদিগের ক্ষমতা প্রবিষ্ট হয় নাই; দক্ষিণে সুন্দরবন-সন্নিহিত প্রদেশে স্বাধীন হিন্দু রাজা ছিলেন; পূর্ব্বে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী এবং ত্রিপুরা, আরাকানরাজ ও ত্রিপুরাধিপতির হস্তে ছিল; এবং উত্তরে কোচবিহার স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছিল। সুতরাং যে সময়ে পাঠানেরা উড়িষ্যা জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যে সময়ে তাঁহারা ১,৪০,০০০ পদাতিক, ৪০,০০০ অশ্বারোহী এবং ২০,০০০ কামান দেখাইতে পারিতেন, সে সময়েও এদেশের অনেকাংশ তাঁহাদিগের হস্তগত হয় নাই।"

এগুলি প্রকৃত ইতিহাসের কথা। বাঙ্গালার এই ইতিহাসের সমালোচনা-প্রসঙ্গে উল্লিখিত কথা উদ্ধৃত করিয়া, একজন সুবিজ্ঞ সমালোচক অভিমানের সহিত বলিয়াছেন, "বাঙ্গালার অধঃপতন এক দিনে ঘটে নাই।" স্বদেশবৎসল বাঙ্গালী, স্বদেশের পূর্ব্বতন গৌরবে উন্নত হইয়া যে সরল ভাবে সে সকল বাক্যের উল্লেখ করিয়াছিলেন, আজ আমরাও সেই সরল ভাবে সেই সরল বাক্যের পুনরুল্লেখ করিতেছি,—"বাঙ্গালার অধঃপতন এক দিনে ঘটে নাই।"

পাঠানেরা যে, কেবল সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র লইয়া বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছে, এ কথা মিথ্যা। বাঙ্গালায় পাঠানের উদয়, স্থিতি ও বিলয় হইয়াছে, তথাপি অনেক স্থানে অনেক বাঙ্গালী আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছেন। ইহার পর মোগলের আধিপত্য-সময়েও বাঙ্গালীর বীর্য্য-বহ্নি নিবিয়া যায় নাই। যশোহরের প্রতাপাদিত্যের নাম আমাদের দেশের সকলেই জানেন। প্রতাপাদিত্য কখনও কাপুরুষের ন্যায় আপনার স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দেন নাই, এবং কখনও কাপুরুষের ন্যায় দিল্লীর সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। আমাদের দেশে যে সকল পরাক্রান্ত বারভূঁইয়ার বিবরণ শুনা যায়, প্রতাপাদিত্য তাঁহাদের অন্যতম। প্রতাপাদিত্য ব্যতীত আরও অনেক পরাক্রমশালী ভূঁইয়ার নাম করা যাইতে পারে। ইঁহাদের দুর্গ ছিল, সৈন্য ছিল, যুদ্ধ-পোত ছিল। ইঁহারা যুদ্ধস্থলে বীরত্ব দেখাইতেন, সাহস দেখাইতেন। ইঁহারা সৈন্য দিয়া, অস্ত্র দিয়া, যুদ্ধ-পোত দিয়া বাদসাহের সাহায্য করিতেন। ইঁহারা গৌড়ের অধিপতির অধীনে থাকিয়া, শেষে আপনাদের ক্ষমতাবলে স্বাধীন হন। ইঁহারা কাহাকেও কর দিতেন না, বা কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতেন না। ইঁহারা

আপনা আপনি স্বাধীন রাজা হইয়া, যুদ্ধের জন্য এবং পর্ত্তুগীজ ও মগ-দস্যুদের আক্রমণ নিবারণ-জন্য, সৈন্য ও সামরিক পোত রাখিতেন। বাঙ্গালী পূর্ব্বে বীরত্বশূন্য ছিল না।

আমরা এ স্থলে এই বীর্য্যশালী বাঙ্গালী ভূস্বামীদিগের আরও দুই এক জনের নাম করিব। বর্ত্তমান নারায়ণগঞ্জের প্রায় এক মাইল উত্তরবর্ত্তী খিজিরপুরের ঈশা খাঁর বীরত্বের বিবরণ আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর লিখিত কোন বাঙ্গালার ইতিহাসে উঠে নাই। ঈশা খাঁ এই নাম শুনিয়াই অনেকে মনে করিতে পারেন, এ ব্যক্তি পাঠান ছিল, সুতরাং ইহার কথা তুলিয়া বাঙ্গালীর বীরত্বের গৌরব করা অসঙ্গত। কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে বলিতেছি, ঈশা খাঁর পিতা হিন্দু ছিলেন। তাঁহার নাম কালিদাস। হুসেন শাহের রাজত্বকালে (খ্রীঃ অব্দ ১৪৯২-১৫২০) কালিদাস মুসলমান-ধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন। সুতরাং ঈশা খাঁ পাঠান নহেন, মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুর সন্তান; বিশেষ বাঙ্গালী ভূস্বামী।

ঈশা খাঁ সুবর্ণগ্রামে আধিপত্য করিতেন, সমস্ত পূর্ব্ববাঙ্গালা তাঁহার অধীন ছিল। তিনি আসামের অন্তর্গত রাঙ্গামাটিতে, বর্ত্তমান নারায়ণগঞ্জের অপর পারস্থ ত্রিবেণীতে, এবং যে স্থানে লক্ষা নদী ব্রহ্মপুত্র হইতে বাহির হইয়াছে, সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী এগারসিন্ধুতে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৫৮৩ খ্রীঃ অব্দে রাল্‌ফ্‌ফিচ্ নামে একজন ভ্রমণকারী সুবর্ণগ্রামে উপস্থিত হন। তিনি লিখিয়াছেন, "এই সমস্ত দেশের প্রধান রাজার নাম ঈশা খাঁ। তিনি অন্যান্য অধিপতিদিগের মধ্যে প্রধান, এবং খ্রীষ্টানদিগের পরম বন্ধু।" ১৫৮৫ খ্রীঃ অব্দে দিল্লীশ্বরের সেনানী শাহাবাজ খাঁ অনেক সৈন্যসমান্তের সহিত পূর্ব্ববাঙ্গালায় প্রবেশ করেন, কিন্তু

ঈশা খাঁর পরাক্রমে তাঁহার এই দেশ জয়ের চেষ্টা বিফল হয়। শাহাবাজ খাঁ পরাভূত হইয়া প্রস্থান করেন। ঈশা খাঁর স্বাধীনতা অটল থাকে। এই সময়ে ঈশা খাঁর জয়পতাকা সমুদ্র-তট পর্য্যন্ত উড়িয়াছিল।

১৫৯৫ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট্ আক্‌বরের আদেশে ক্ষত্রিয়-বীর রাজা মানসিংহ আবার বাঙ্গালায় আসিয়া ঈশা খাঁর এগারসিন্ধু দুর্গ অবরোধ করেন। ঈশা খাঁ তখন উপস্থিত ছিলেন না, দুর্গের অবরোধ-সংবাদ শুনিয়া অবিলম্বে সৈন্যগণের সহিত এগারসিন্ধুতে আসিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ কোন কারণবশতঃ অসন্তুষ্ট হইয়া, যুদ্ধ করিতে অসম্মত হইল। ঈশা খাঁ কাপুরুষ ছিলেন না। তিনি রাজা মানসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া কহিলেন, এই যুদ্ধে যে জীবিত থাকিবে, সেই বাঙ্গালা একাকী ভোগ করিবে। মানসিংহ ঈশা খাঁর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু ঈশা খাঁ অশ্বারোহণে যুদ্ধস্থলে উপনীত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী একজন তরুণবয়স্ক যুবক, রাজা মানসিংহ নহেন,—মানসিংহের জামাতা। ইঁহার সহিতই যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মানসিংহের জামাতা নিহত হইলেন। ঈশা খাঁ মানসিংহকে ভীরু বলিয়া ভৎর্সনা করিয়া, শিবিরে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু শিবিরে আসিতে না আসিতেই সংবাদ আসিল, রাজা মানসিংহ যুদ্ধস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সংবাদ পাওয়া মাত্র ঈশা খাঁ অশ্বারোহণে তড়িৎ-গতিতে সমর-ভূমিতে উপস্থিত হইয়া, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, যাবৎ তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে রাজা মানসিংহ বলিয়া ভালরূপে চিনিতে না পারিবেন, তাবৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। শেষে ঈশা খাঁ ভাল করিয়া চিনিলেন যে, উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী

যথার্থই রাজা মানসিংহ। সুতরাং যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথম আক্রমণেই মানসিংহের তরবারি ভগ্ন হইয়া গেল। ঈশা খাঁ আপনার তরবারি রাজাকে দিলেন, কিন্তু রাজা তাহা গ্রহণ না করিয়া অশ্ব হইতে নামিলেন। তাঁহার প্রতিপক্ষ ঈশা খাঁও অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া, নিরস্ত্র রাজার সহিত মল্ল-যুদ্ধে উদ্যত হইলেন। মানসিংহ আর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না। প্রতিদ্বন্দ্বীর উদারতা, সাহস ও বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের অবমাননা করিলেন না, ঈশা খাঁকে আপ্যায়িত করিয়া, উপহার দিয়া বিদায় দিলেন।

ঈশা খাঁ ইহার পর রাজা মানসিংহের সহিত আগরাতে সম্রাট্ আক্‌বরের নিকট উপনীত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে এই স্থানে কারাগারে অবরুদ্ধ করা হইল। শেষে সম্রাট্ যখন এগারসিন্ধুর দ্বন্দ্বযুদ্ধের বিবরণ শুনিলেন, তখন কালবিলম্ব না করিয়া ঈশা খাঁকে কারাগার হইতে মুক্ত করিলেন এবং তাঁহাকে "দেওয়ান" ও "মসনদ্‌ইআলি" উপাধি ও বাঙ্গালার অনেক পরগণা দিলেন। যোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে একজন বাঙ্গালীর এইরূপ বীরত্ব ও সাহসের বিবরণ পাওয়া যায়। এক্ষণে ঈশা খাঁর বংশধরেরা পূর্ব্ববাঙ্গালার সম্ভ্রান্ত জমীদার বলিয়া গণ্য। কিন্তু তাঁহাদের বংশের সে সাহস, সে বীর্য্য এক্ষণে অতীত কালের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

ঈশা খাঁকে ছাড়িয়া দিলেও বলশালী খাঁটি হিন্দু বাঙ্গালীর অভাব হইবে না। স্বাধীন ত্রিপুরার অধিপতিগণ অনেক সময়ে যুদ্ধে অসাধারণ সাহস দেখাইয়া বীরত্ব-কীর্ত্তির সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত ইঁহাদের স্বাধীনতা অক্ষত রহিয়াছে।

বিক্রমপুরের কায়স্থবংশীয় চাঁদ রায় ও কেদার রায় এক সময়ে পরাক্রান্ত ভূস্বামী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। যে ঈশা খাঁর বীরত্বে মোগলসেনানী বিস্মিত হন, সেই ঈশা খাঁর সহিত এই দুই ভ্রাতার সর্ব্বদা যুদ্ধ হইত। ঈশা খাঁর সহিত যুদ্ধে চাঁদ রায় ও কেদার রায় দীর্ঘকাল আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করেন। বাক্লাচন্দ্রদ্বীপের (বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ জেলা) কন্দর্পনারায়ণ রায় ও সুন্দরবনের সন্নিহিত প্রদেশের মুকুন্দ রায় বীরত্বে বিখ্যাত ছিলেন। ১৫৮৬ খ্রীঃ অব্দে রাল্‌ফ্‌ ফিচ্‌ বাক্লাচন্দ্রদ্বীপ দর্শন করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণে স্পষ্ট বোধ হয়, বাক্লাচন্দ্রদ্বীপ বর্ত্তমান স্বাধীন রাজাদিগের শাসিত রাজ্য অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট ছিল না। কন্দর্প-নারায়ণের অনেক সমর-পোত ছিল। অদ্যাপি তাঁহার একটি পিতলের কামান চন্দ্রদ্বীপে আছে। ফরিদপুরের নিকটবর্ত্তী চরমুকুন্দিয়া নামক স্থানে মুকুন্দ রায় দিল্লীশ্বরের একজন সেনানীকে যুদ্ধে নিহত করেন। তাঁহার পুত্র শত্রুজিৎ মোগল সম্রাট্‌ জাহাঁগীরের অধীনতা স্বীকার করেন নাই।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় বাঙ্গালীদিগের এইরূপ প্রতাপ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমরা যশোহরের রাজা সীতারামকে দেখিতে পাই। কেহ কেহ সীতারামকে একজন ডাকাইত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা এই কথার অনুমোদন করি না। সীতারাম একজন পরাক্রান্ত হিন্দু জমীদার। সে সময়ে বাঙ্গালার আর কেহই সাহসে ও বীরত্বে তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। সীতারামের সেনাপতি মেনাহাতীর নামে অদ্যাপি যশোহরের লোকের হৃৎকম্প হইয়া থাকে। সীতারামের পরাক্রম যখন বাড়িয়া উঠে, তখন বাহাদুর শাহ ও ফরুরোখ্‌সয়ের যথাক্রমে

দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ে যশোহর জেলা দ্বাদশ চাক্‌লায় বিভক্ত ছিল। এই সকল চাক্‌লার অধিস্বামিগণ বাদসাহকে কর দিতেন না। বাদসাহ সীতারামের পরাক্রমের কথা শুনিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকেই এই অবাধ্য জমীদারদিগকে বশীভূত করিতে অনুরোধ করেন। সীতারাম বাদসাহের আদেশ-লিপি পাইয়া, অবিলম্বে অবাধ্য জমীদারদিগকে দমন করিয়া দ্বাদশ চাক্‌লার অধিকারী হন এবং বাদসাহ হইতে এই কার্য্যের পুরস্কার-স্বরূপ 'রাজা' উপাধি লাভ করেন।' ইহার পর সীতারাম বাঙ্গালার নবাবের অধীনতা উচ্ছেদ করিলে, নবাব তাঁহার শাসন-জন্য অনেক বার সৈন্য পাঠান, কিন্তু সীতারামের বীরত্বে নবাবের সৈন্য বারবার পরাভূত হয়। নবাব অবশেষে অনেক সৈন্যের সহিত স্বীয় জামাতা আবুতরাবকে পাঠাইয়া দেন। মহাপরাক্রম মেনাহাতী সীতারামের অনুপস্থিতিতেই এই সৈন্যদল পরাজয় করেন, এবং নবাবজামাতা আবুতরাবের ছিন্ন-মস্তক আনিয়া সীতারামকে দেখান। পূর্ব্বে বাঙ্গালী শত্রুর আক্রমণে পলায়ন করিত না।

যে সময়ে আলীবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন, সে সময়ে রাজা কীর্ত্তিচাঁদ ও রাজা রামনারায়ণ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। মস্তাফা খাঁ যখন বিদ্রোহী হইয়া আলীবর্দ্দী খাঁর সৈন্যদল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আজিমাবাদ আক্রমণ করেন, তখন তথাকার দেওয়ান জৈন-উদ্দীন, কীর্ত্তিচাঁদ ও রামনারায়ণের হস্তে সৈন্যাধ্যক্ষতা সমর্পণ করেন। ইঁহারা অন্যান্য মুসলমান সেনাপতির ন্যায় মস্তাফা খাঁর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিকের মতে সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি দেওয়ান মাণিকচাঁদ ও মোহনলাল বাঙ্গালী। সিরাজউদ্দৌলা যখন কলিকাতায় ইংরেজদের দুর্গ আক্রমণ করেন, তখন মাণিকচাঁদ আক্রমণকারী সৈন্যদলের অধ্যক্ষ ছিলেন। পলাসীর যুদ্ধক্ষেত্রে মোহনলালের কিরূপ বীরত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা বাঙ্গালার ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মীরজাফর বিশ্বাসঘাতক হইয়া সিরাজউদ্দৌলাকে কুপরামর্শ না দিলে, পলাসীর যুদ্ধে জয়ী হওয়া ক্লাইবের পক্ষে দুর্ঘট হইত। বাঙ্গালী এক সময়ে ব্রিটিশ তেজের নিকটেও অবনত হয় নাই।

অধিক উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। যাহা কিছু বলা হইল, তাহাতে বাঙ্গালী ব্রিটিশ অধিকারের পূর্ব্বে কিরূপ ক্ষমতাপন্ন ছিল বুঝা যাইবে। আমরা এক্ষণে বাঙ্গালীর সাহসের একটি উদাহরণ দিব। ইতিহাস নির্দ্দেশ করে, শূরবংশীয় ফরিদ স্বহস্তে একটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র হত্যা করিয়া 'শের সাহ' নাম ধারণ করেন। অস্তাজিলো এক সময়ে এইরূপ পরাক্রম দেখাইয়া 'শের আফগান' নাম পরিগ্রহপূর্ব্বক অতুল লাবণ্যবতী নুরজাহানের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। একাকী একটা বাঘকে মারিয়া ফেলিতে ইতিহাসে এই দুই বীরের সাহসের বড় প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। ফরিদ ও অস্তাজিলো যে সাহস দেখাইয়া ইতিহাসে নাম রাখিয়াছেন, হতভাগ্য বাঙ্গালার একজন হিন্দু যুবকও এক সময়ে এই সাহস দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাসের পত্রে আজ পর্য্যন্তও তাঁহার নাম পাওয়া যায় না। এই বাঙ্গালী যুবকের নাম উদয়নারায়ণ, মজুমদার-উপাধিক মিত্র-বংশীয়। বাক্লাচন্দ্রদ্বীপের

কন্দর্পনারায়ণের বংশের সহিত ইঁহার নিকট-সম্পর্ক ছিল। কালক্রমে কন্দর্পনারায়ণের বংশ লোপ হইলে, তাঁহাদের সমস্ত ভূসম্পত্তি উদয়নারায়ণের হস্তগত হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে মুর্শিদাবাদের নববাবংশের এক ব্যক্তি উদয়নারায়ণকে এই অধিকার হইতে বিচ্যুত করেন। উদয়নারায়ণ মুর্শিদাবাদে যাইয়া নবাবকে ইহা জানাইলে, নবাব কহেন, যদি উদয়নারায়ণ স্বহস্তে একটি ব্যাঘ্র বধ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সমস্ত সম্পত্তি দেওয়া যাইবে। উদয়নারায়ণ বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ও সাহসী ছিলেন, নবাবের প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন না। তিনি অবিলম্বে একটি ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, এবং অস্ত্র-সঞ্চালন-কৌশলে তাহাকে হত্যা করিয়া, আপন সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। বাঙ্গালী পূর্ব্বে কেবল বলশালী ছিল না, সাহসী বলিয়াও বিখ্যাত ছিল।

রজনীকান্ত গুপ্ত।

হেমচন্দ্র ও মধুসূদন

শিক্ষিত বাঙ্গালির প্রধান কবি পাঁচ জন,—মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্র। শেষের তিনজন, বাঙ্গালির সৌভাগ্য থাকিলে, আরও কত দিন কত নব নব রসে আমাদিগকে অভিষিক্ত করিবেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমরা কত হাসিব কাঁদিব; কত শত বিচিত্র সংসারের লীলাখেলা, তাঁহারা আমাদিগকে দেখাইবেন—সুতরাং তাঁহাদের কবিত্বের সমালোচনার দিন এখনও আসে নাই। না আসাই প্রার্থনীয়। হেমচন্দ্রের সহিত তাঁহাদের কাহারও এখন তুলনাই হইতে পারে না। তবে মধুসূদনের সহিত হেমচন্দ্রের তুলনা হইতে পারে। হেমচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে তুলনা করাও বোধ করি কর্ত্তব্য।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের 'মেঘনাদ-বধ,' বি.এ.র পাঠ্য বলিয়া স্থির হইল। তৎপূর্ব্বেই হেমচন্দ্র সটীক মেঘনাদ-বধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সুদীর্ঘ ভূমিকায় হেমচন্দ্র বাঙ্গালিকে নব-প্রবর্ত্তিত 'মিতাক্ষর' বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন,—বড় আগ্রহে, বড় উৎসাহে, বড় অনুরাগে, বড় ব্যাকুলতা-সহকারে। তখন হেমচন্দ্র 'চিন্তাতরঙ্গিণী'-প্রণেতা হাইকোর্টের একজন নাম লেখান' উকীল মাত্র। কিন্তু 'মধু'ময় মিতাক্ষর বুঝাইবার সেই আগ্রহ, দুর্ব্বোধ মধু-কূট বুঝাইবার জন্য টীকায় সেই যত্ন—উকীলের ওকালতি বলিয়া বোধ হইল না। বোধ হইল, হেমচন্দ্র মধুসূদনের গোঁড়া, মধুসূদনের ভক্ত, মধুসূদনের শিষ্য।

অনেক দিন পরে, মধুসূদনের 'স্বর্গারোহণে' হেমচন্দ্র যে দুঃখ প্রকাশ করেন, তাহাতেও সেই ভাব প্রকটিত হয়,—

"হবে কি সেদিন, এ গৌড়-মাঝে
পূরিবে তোমার আশা ?
বুঝিবে কি ধন দিয়াছ ভাণ্ডারে,
উজ্জ্বল করিয়া ভাষা।"

কিন্তু হেমচন্দ্র মধুসূদনের এরূপ ভক্ত, এরূপ গোঁড়া, এরূপ শিষ্যানুকল্প হইয়াও 'মিতাক্ষর' গ্রহণ করেন নাই। কেন করেন নাই, তিনি জানেন। ভাল করিয়াছেন, কি মন্দ করিয়াছেন এখন আমি বলিতে পারিব না। তবে একটা কথা প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি, যদি 'মিতাক্ষর' কেবল নিগড়-বন্ধন-মোচনের জন্য প্রকাশিত হইয়া থাকে, তবে সেটা কিছু মহদুদ্দেশ্য-সাধন নহে। চূড়, বলয়, অনন্ত—এগুলি ত নিগড় বটে। বাহুলতা বহিয়া রূপ খসিয়া খসিয়া পড়ে, তাই বলয়-চূড়-অনন্ত-বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে হয়। ভাল জিজ্ঞাসা করি, তাহাতে শোভা বাড়ে, না কমে? তালও ত সুরের নিগড়। ঐ নিগড় ভাঙ্গিলেই কি ভাল? তা নয়। দশরূপ নিগড়েই মনুষ্যত্ব। দশরূপ নিগড়েই কবিত্ব। নিগড়েই সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও বৃদ্ধি। ছন্দে উঠে রবি-শশী। ছন্দ ত নিগড়। নিগড় সৌর জগতে; নিগড় কাব্য জগতে। নিগড়-ছেদনই আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

যে কারণেই হউক হেমচন্দ্র মধুসূদনের মিতাক্ষর গ্রহণ করেন নাই। তবে মধুসূদনের কবিত্ব তিনি বিশেষ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কবি যেমন আর একজন কবিকে আয়ত্ত করেন, আমরা তেমন

কখন পারি না। কবি গেটে শকুন্তলার সৌন্দর্য্য দশ পঙ্‌ক্তিতে প্রকাশ করেন, কিন্তু আর একজন কবি রবীন্দ্রনাথ, সেই কয় পঙ্‌ক্তি বুঝাইয়া দিলে, তবে আমরা সেই সমালোচনা সম্যক্ বুঝিতে পারি। বিক্টর হুগো বুঝাইলে, তবে সেক্সপীয়র বুঝা গেল। রবীন্দ্রনাথ বুঝাইলে, তবে কুমার-শকুন্তলা বুঝিতে পারিলাম। হেমচন্দ্র মধুসূদনের বীরকাব্য মেঘনাদ বুঝাইয়াছিলেন, আমাদিগকে বুঝাইতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তখন তাঁহারই কবিত্ব-গুণে আমরা বুঝিতেছিলাম—জাতিবৈর। সেই জাতি-বৈরে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া, বীরকাব্যের অভিনব প্রতিমা হেমচন্দ্র বঙ্গে অধিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন—বৃত্রসংহার। এই কাব্যের সূক্ষ্ম শিক্ষার কথা পরে বিস্তৃত ভাবে বলিব, এখন মধুসূদনে হেমচন্দ্রে আমরা তুলনা করিতেছি মাত্র। বীরকাব্যে হেমচন্দ্র সকল অনুকারীর ন্যায় ওস্তাদের নিম্নস্তরে। প্রসাদগুণে হেমচন্দ্র পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের নিম্নে; সমকালবর্ত্তী 'শিক্ষিত' মধুসূদনেরও নিম্নে।

বৃত্রসংহারে শচী-চপলার কথোপকথন,—

"কেমনে ভুলিব বল্ মেঘে যবে আখণ্ডল
বসিত কার্ম্মুক ধরি করে;
তুই সে মেঘের অঙ্গে খেলাতিস্ কত রঙ্গে,
ঘটা করি লহরে লহরে!
কি শোভা হইত তবে, বসিতাম কি গৌরবে
পার্শ্বে তাঁর নীরদ-আসনে!
হইত কি ঘন ঘন, মৃদু মন্দ গরজন,
মেঘ যবে ছুলাত পবনে!

ইন্দ্রের সে মুখকান্তি ঘুচায়ে নয়ন-ভ্রান্তি,
কত দিন সখি রে না হেরি!
কত দিন বৈসে নাই, ঘুচায়ে চক্ষু-বালাই,
সুরবৃন্দ বাসবেরে ঘেরি!
সুমেরু-শিখরে যবে, সুখে খেলিতাম সবে,
অমর সঙ্গিনীগণ সহ,
উপরে অনন্ত শূন্য, অনন্ত নক্ষত্রপূর্ণ,
সদা স্নিগ্ধ সদা গন্ধবহ।
ভ্রমিত নির্ম্মল বায়, ফুটিয়া ফুটিয়া তায়,
কত পুষ্প সুমেরু শোভিত,
নির্ম্মল কিরণ-শোভা, সখি রে কি মনোলোভা,
মেরু-অঙ্গে নিত্য বরষিত!
সখি সেই মন্দাকিনী, চিরানন্দ প্রদায়িনী,
দেবের পরশ সুখকর।
চলেছে নয়নতলে, উছলি মধুর জলে,
ভাবিতে রে হৃদয় কাতর!
কার ভোগ্যা এবে তাহা, কার ভোগ্য এবে আহা,
আমার সে নন্দন-বিপিন!
কে ভ্রমিছে এবে তায়, কেবা সে আঘ্রাণ পায়,
পারিজাত কে করে মলিন!"

ইত্যাদি বর্ণনার সহিত মেঘনাদ-বধের সীতা-সরমার কথাবার্ত্তা তুলনা করুন,—

"পঞ্চবটী বনে মোরা, গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব

সে কান্তার কান্তি আমি? সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে ;
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুরবালা-কেলি
পদ্মবনে ; কভু সাধ্বী ঋষি-বংশ-বধূ
সুহাসিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে ।
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙ্গে !)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে
সখী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায় ; কভু বা
কুরঙ্গিণী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত, শুনি কোকিলের ধ্বনি !
নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরু-সহ ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে
দম্পতি, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে ! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী-জামাই বলি বলিতাম তারে !
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে, দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি ! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণতলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে ; কত যে আদরে

তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে? কব বা কেমনে?
শুনেছি কৈলাশ-পুরে কৈলাস-নিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র-কথা
পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
নানা কথা! এখনও, এ বিজন বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী!
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত?"

রুদ্রপীড়-পতনের পর, হঠাৎ ইন্দুবালার অনুমরণ-সংবাদে বৃত্রাসুরের মুখে,—

"শুকায়েছে হায়,
সে চারু কোমল লতা ইন্দুবালা মম!
হের, মন্ত্রি, বিধাতার বিধি অদ্ভুত,
দৈত্যকুল-রবি সনে সে কুল-পঙ্কজ
ডুবিল হে এককালে! ছাড়িলা যখন
রুদ্রপীড় বৃত্রাসুরে, থাকে কি সে আর
দৈত্যকুল-লক্ষ্মী তার ঘরে? জানিলাম
এত দিনে অসুর-কুলের অবসান!
হা মাতঃ সুশীলে! তব অন্তিম কালেতে
চক্ষে না দেখিনু তোমা! সেবিলে, মা, কত

তনয়ার স্নেহে বৃত্রে—বৃত্র জীবমানে
মরিলে শক্রর কোলে! মৃত্যুর সময়
না পাইলে স্ববান্ধবে স্বজনে দেখিতে।
হা বিধাতঃ, লীলা তব কে বুঝিতে পারে?"

—ইত্যাদি করুণ কাহিনীর সহিত প্রমীলার সহমরণ-স্থলে শ্মশান-শায়িত পুত্রের শব লক্ষ্য করিয়া রাবণের সে বীর-কাতরোক্তি,—

"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে,—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা! কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা?—ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে!
ছিল আশা, রক্ষঃকুলরাজসিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ! বৃথা আশা! পূর্ব্বজন্ম-ফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে!
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চির রাহুগ্রাসে!
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব,—
হায় রে কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর? কি সান্ত্বনাছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে?

'কোথা পুত্র-পুত্রবধূ আমার?' সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী,—'কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি?'—
কি ক'য়ে বুঝাব তারে? হায় রে, কি ক'য়ে?
হা পুত্র! হা বীরশ্রেষ্ঠ! চিরজয়ী রণে!
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?"—

তুলনা করুন; নিশ্চয়ই দেখিবেন, ওস্তাদ মাইকেল ওস্তাদী বজায় রাখিয়াছেন।

তাহার পর দেব-চরিত্র-চিত্রণ। ইচ্ছাপূর্ব্বক মধুসূদন রাক্ষস-পক্ষের শৌর্য্য-বীর্য্য মহিমময় করিয়াছেন। কিন্তু রাম-লক্ষ্মণ নিষ্প্রভ হইলেও মাইকেলের মহেশ-মহেশ্বরী-চিত্র হেমচন্দ্রের ঐ সকল চিত্র অপেক্ষা অধিকতর দেবতার মত।

বৃত্রসংহারে ছন্দোবৈচিত্র্য থাকাতে লাভ হয় নাই। ওজোগুণে ব্যাঘাত হইয়াছে; মাইকেলের কবিতা মিতাক্ষর পয়ারের পটতালে গরীয়সী হইয়াছে। তবে যুদ্ধ-বর্ণনা,—ওটি আমি ভাল বুঝি না। বঙ্কিমবাবু মাথার দিব্য দিয়া বৃত্রসংহারের যুদ্ধ-বর্ণনার প্রশংসা করিলেও, কাশীদাসের এবং মাইকেলের এই ভাগে আমাকে যত মোহিত করে, তত বৃত্রসংহারে করে না।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া

শ্যামাপূজার পর ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। মা জাগিলে ছেলে জাগিবে। ছেলেদের পূর্ণ জাগরণ ঘটিলে তাহাদের স্মৃতি, ধৃতি, লজ্জা, স্তুতি সবই জাগিয়া উঠিবে। দেবী বুদ্ধিরূপিণী হইয়া তখন তাহাদের বুঝাইবেন যে, তোমরা এক মায়ের ছেলে—সহোদর ভাই। এই বোধটুকু হইলে সকল ভাই মায়ের অঞ্চল ধরিয়া, মাতৃস্নেহের ছায়ায় হাস্যমুখে দাঁড়াইতে পারিবে। তখন সহজা ধৃতিরূপিণী ভগিনী ভাইয়ের কপালে তিলক দিয়া ভ্রাতৃগণকে অক্ষয়, অজর, অমর, অচ্যুত করিয়া তুলিতে পারিবেন।

"ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা।
যমের দুয়ারে প'ড়্‌ল কাঁটা॥"

—এই ত সোজা কথা। ইহার প্রভাবে যমের দুয়ারে কেমন করিয়া কাঁটা পড়ে? সেই কথাটাই একটু খুলিয়া বলিবার চেষ্টা করিব।

মনুষ্যদেহ অজর-অমর হইতেই পারে না। এ সোজা কথাটা জগতের মানুষ মাত্রেই বুঝে এবং জানে। তথাপি মানুষ কিন্তু অমর হইতে চাহে। এইটুকুই মনুষ্যত্বের বিশিষ্টতা। যখন দেহকে অমর করিতে পারি না, তখন দেহজ বিশিষ্ট শক্তিকে অমর ও অক্ষয় করিতে চাহি। তাই বংশের ধারা, জাতির ধারা রক্ষা করিবার জন্য শাস্ত্র নানা স্থানে, নানা ভাবে উপদেশ দিয়াছেন। এই বংশের ধারা এবং জাতির ধারা অব্যাহতভাবে সুরক্ষিত হইলে জাতি এবং বংশ অমরত্ব লাভ করিতে পারে। কে জানে কত

'কোথা পুত্র-পুত্রবধূ আমার?' সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী,—'কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি?'—
কি ক'য়ে বুঝাব তারে? হায় রে, কি ক'য়ে?
হা পুত্র! হা বীরশ্রেষ্ঠ! চিরজয়ী রণে!
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?"—

তুলনা করুন; নিশ্চয়ই দেখিবেন, ওস্তাদ মাইকেল ওস্তাদী বজায় রাখিয়াছেন।

তাহার পর দেব-চরিত্র-চিত্রণ। ইচ্ছাপূর্ব্বক মধুসূদন রাক্ষস-পক্ষের শৌর্য্য-বীর্য্য মহিমময় করিয়াছেন। কিন্তু রাম-লক্ষ্মণ নিষ্প্রভ হইলেও মাইকেলের মহেশ-মহেশ্বরী-চিত্র হেমচন্দ্রের ঐ সকল চিত্র অপেক্ষা অধিকতর দেবতার মত।

বৃত্রসংহারে ছন্দোবৈচিত্র্য থাকাতে লাভ হয় নাই। ওজোগুণে ব্যাঘাত হইয়াছে; মাইকেলের কবিতা মিতাক্ষর পয়ারের পটতালে গরীয়সী হইয়াছে। তবে যুদ্ধ-বর্ণনা,—ওটি আমি ভাল বুঝি না। বঙ্কিমবাবু মাথার দিব্য দিয়া বৃত্রসংহারের যুদ্ধ-বর্ণনার প্রশংসা করিলেও, কাশীদাসের এবং মাইকেলের এই ভাগে আমাকে যত মাহিত করে, তত বৃত্রসংহারে করে না।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া

শ্যামাপূজার পর ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। মা জাগিলে ছেলে জাগিবে। ছেলেদের পূর্ণ জাগরণ ঘটিলে তাহাদের স্মৃতি, ধৃতি, লজ্জা, স্তুতি সবই জাগিয়া উঠিবে। দেবী বুদ্ধিরূপিণী হইয়া তখন তাহাদের বুঝাইবেন যে, তোমরা এক মায়ের ছেলে—সহোদর ভাই। এই বোধটুকু হইলে সকল ভাই মায়ের অঞ্চল ধরিয়া, মাতৃস্নেহের ছায়ায় হাস্যমুখে দাঁড়াইতে পারিবে। তখন সহজা ধৃতিরূপিণী ভগিনী ভাইয়ের কপালে তিলক দিয়া ভ্রাতৃগণকে অক্ষয়, অজর, অমর, অচ্যুত করিয়া তুলিতে পারিবেন।

"ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা।
যমের দুয়ারে প'ড়্‌ল কাঁটা॥"

—এই ত সোজা কথা। ইহার প্রভাবে যমের দুয়ারে কেমন করিয়া কাঁটা পড়ে? সেই কথাটাই একটু খুলিয়া বলিবার চেষ্টা করিব।

মনুষ্যদেহ অজর-অমর হইতেই পারে না। এ সোজা কথাটা জগতের মানুষ মাত্রেই বুঝে এবং জানে। তথাপি মানুষ কিন্তু অমর হইতে চাহে। এইটুকুই মনুষ্যত্বের বিশিষ্টতা। যখন দেহকে অমর করিতে পারি না, তখন দেহজ বিশিষ্ট শক্তিকে অমর ও অক্ষয় করিতে চাহি। তাই বংশের ধারা, জাতির ধারা রক্ষা করিবার জন্য শাস্ত্র নানা স্থানে, নানা ভাবে উপদেশ দিয়াছেন। এই বংশের ধারা এবং জাতির ধারা অব্যাহতভাবে সুরক্ষিত হইলে জাতি এবং বংশ অমরত্ব লাভ করিতে পারে। কে জানে কত

কাল পূর্ব্বে তাঁহারা জন্মিয়াছিলেন, ইংরেজ বলেন চারি পাঁচ হাজার বর্ষের পূর্ব্বে—কোন অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত অতীতে ব্যাস, বশিষ্ঠ শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতি মহর্ষিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন! আমরা কিন্তু এখনও তাঁহাদের পরিচয়ে পরিচিত হইতেছি। আমরা যদি মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিতাম, বা অধুনা খৃষ্টান হইতাম, তাহা হইলে আমাদের এ পরিচয় এতদিনে লোপ পাইত। সঙ্গে সঙ্গে জাতির ও বংশের ধারা ব্যাহত এবং বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। তাঁহারা যেমন মানুষ ছিলেন, আমরা তেমন মানুষ নহি বটে; পরন্তু তাঁহাদের সহিত আমাদের যে একটা সম্বন্ধ আছে, একটা বিশিষ্টতার ধারা তাঁহাদের ভিতর হইতে বাহির হইয়া এই অজ্ঞেয় অজ্ঞাত কাল ভেদ করিয়া বর্ত্তমান কালেও দেদীপ্যমান আছে এবং আমাদিগকেও নিজের বলিয়া দাবী করিতেছে,—ইহা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই! এই পরিচয়, এই ধারাই জাতি এবং বংশের অমরত্বের বেদী। আমি কে, আমরা কে?—এই প্রশ্নের উত্তর করিতে হইলে এখন হইতে বৈদিক যুগ পর্য্যন্ত টানিয়া পিছু হটিয়া যাইতে হয়। এই পরিচয়, সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, ইহাই আমার মনুষ্যত্বের ধারা, আমার বিশিষ্টতার দ্যোতক। বাঙ্গালার মুসলমান যাহাই হউন না কেন, যেখানকার হউন না কেন, জাতির এবং বংশের পরিচয় দিতে হইলে তাঁহাকে প্রায় দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের আরবদেশের কোরেশ-দিগের পরিচয় টানিয়া বাহির করিতে হয়। কেন না, তাহাই তাঁহার মনুষ্যত্বের শ্লাঘা। খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সকল জাতির সকল ধর্ম্মাবলম্বীরই এমনই একটা অতীতের পরিচয় আছে। এই জাতিগত, বংশগত এবং ধর্ম্মগত ধারার বা প্রবাহের পরিচয়

যে জাতির নাই, সে জাতি সভ্যই নহে, সে জাতির মধ্যে সংহতি-শক্তির বিকাশ নাই, সে জাতির পিতৃপরিচয় নাই।

এই ধারার খবর, এই বৈশিষ্ট্যের উপাদান-পরম্পরা পাই কেমন করিয়া এবং কোথা হইতে? আমি কাহার এবং আমরা কাহারা?—এই দুই প্রশ্নের ঠিকমত উত্তর দিতে পারিলেই বৈশিষ্ট্যের খবরটা আপনা হইতে খুলিয়া যায়। আজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় সেই খবরটা পাইবার একটা শুভক্ষণ। কাল-সহোদরা কালিন্দী যমুনা আজ সমষ্টীকৃত সমবেত ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়া বলিতেছেন,—

"ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা।
যমের দুয়ারে প'ড়্‌ল কাঁটা॥"

আমি ফোঁটা দিলেই ভাইয়ের যমের দুয়ারে, নাশের—লোপের পথে কাঁটা পড়িবেই। কেন না আমি যে যমুনা, যম-সহোদরা। আমি যে অনন্তকাল-প্রবাহিনী কালিন্দী! কালস্রোতের অজ্ঞেয় নীল জলরাশি বহন করিয়া আমিই অনন্ত কাল, কুল-কুল—কল-কলরবে বহিয়া যাইতেছি। আমার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ব্যাঘাত নাই, স্তম্ভন নাই; আমি কেবলই চলিতেছি এবং দেখিতেছি। জগতের কত অসংখ্য অর্ব্বুদ পরিবর্ত্তন দেখিলাম; আরও কত দেখিব। আমারই দুই তটে অখণ্ড দণ্ডায়মান হইয়া বিরাজ করিতেছেন—আমার সহোদর মহাকাল। আমি গতি-রূপিণী চপলা, চঞ্চলা বালিকা; ভাই আমার স্থিতিরূপ, ধীর, স্থির, সনাতন, কাল-পুরুষ। আমি গতি, সে স্থিতি; আমি শক্তি—সচল, সবেগ শক্তি, সে শান্ত, দান্ত, সমাহিত সনাতন পুরুষ। সে এমন

কেন হইল—জান? ভগিনী সহোদরা আমি, আমারই অতি সোহাগের টীকা পাইয়া সে এমন চিরঞ্জীবী হইয়াছে। তোমরা আমার মতন এমনই সোহাগ ও স্নেহভরে টীকা দিতে পারিলেই তোমাদের ভাইদের, আমার ভাইয়ের মত মৃত্যুঞ্জয় সনাতন পুরুষ করিয়া তুলিতে পারিবে।

মা-বাপের ঠিক খবর জানিতে না পারিলে ভাই-ভগিনীর সম্বন্ধটা ঠিকমত জানিতে পারা যায় না। তাই বলিতে হইয়াছে—জাগিয়ে দে চৈতন্যময়ি, এবার, আমরা সবাই জাগিয়া দাঁড়াই। জাগিয়া উঠিলেই, চোখ রগ্‌ড়াইয়া চারিদিক্ চাহিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব—আমরা কে, আমরা কাহাদের। সেটুকু বুঝিতে ভুলিয়াছি বলিয়াই ত ভাই-ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইয়াছি,—সহোদরকে সহোদর ঈর্ষা-বিদ্বেষ দেখাইতেছে, আঁচড়াইতেছে—কামড়াইতেছে! পরিচয়বিভ্রাট ঘটিয়াছে বলিয়াই আজ দলে দলে আমরা বিভক্ত, আজ আমরা প্রত্যেকে ওস্তাদ এবং গুরুপদপ্রার্থী ; পরিচয়বিভ্রাট ঘটিয়াছে বলিয়াই আজ এক দল অপর দলের নিন্দা করিতেছে, সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে। পরিচয়বিভ্রাট বিষম ও বেজায় ভাবে ঘটিয়াছে বলিয়াই আমরা পরাজিত, পরাধীন, পরমুখাপেক্ষী, পরপদলিপ্সু, পরের ধারায় নিজের নিজের পিতৃ-পরিচয়ের ধারা ডুবাইতে—মিশাইতে প্রয়াসী। জননীর হাত ধরিয়া মানুষ পিতাকে চিনিয়া থাকে, পিতৃপরিচয় লাভ করিয়া থাকে। মায়ের কোলে বসিতে পারিলেই বালক বাপের বেটা হইতে পারে। তাই শ্যামাপূজার দিনে কাতরস্বরে বলিয়াছিলাম—

জাগিয়ে দে চৈতন্যময়ি
এবার আমি জেগে যাই।

মহামায়ার মোহপাশে
আর যেন ঘুমাতে না চাই ॥

শ্যামা জন্মদে, তোমারই ক্ষীরনীর-ধারা পান করিয়া আমাদের মনুষ্যদেহ পুষ্ট হইয়াছে; তুমিই আমাদের জননী-ধাত্রী। জাগিয়ে দে মা। সম্মুখে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, ভগিনী যমুনাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তাহার চঞ্চল চম্পক-অঙ্গুলি হইতে বিজয়-টীকা গ্রহণ করিতে হইবে। সে টীকা পাইলে আমি—আমরা অমর হইব, অবিনাশী সনাতন পুরুষ হইব। তুমি জাগিলে আমি জাগিব; আমরা মায়ে-পোয়ে জাগিয়া বসিলে আমাদের ভাই-ভগিনীদের বাছিয়া লইতে কষ্ট হইবে না। সে জাগরণ হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার এবং আমাদের বাছাইও ঠিকমত হইয়াছে—আমাদের যম-দ্বিতীয়ার ফোঁটাও আমাদের ভালে বালারুণের মত শোভা পাইবে।

মায়ের কোলে শিশু ঘুমাইয়া আছে,—নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত-মনে সে ঘুমাইতেছে। যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গে, তখন সে নয়ন মেলিয়াই মায়ের মুখখানি দেখিতে পায়। সে অপরূপ রূপমাধুরী দেখিয়া শত নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র-নিঙড়ান সুধামাখান পূর্ণাবয়ব পূর্ণশ্রী মাতৃমুখ দেখিয়া শিশু সোহাগের হাসি হাসে। সে ভাবে আমার মায়ের মতন আর কাহারও এমন মা আছে কি?—এমন সুন্দর, এমন মনোহর, এমন অনুপম, এমন অতুল্য ও অদ্বিতীয় মা আর আছে কি? শিশু মায়ের মুখে কোন দোষ, কোন চ্যুতি দেখিতে পায় না; জাগিয়া উঠিয়া, মায়ের কোলে শুইয়া দেখিলে অমনিই দেখায়। জাগিয়াছ যদি, তাহা হইলে শিশুর মতন নয়নময় হইয়া মাতৃমুখ দেখ দেখি! তেমন নিষ্কলঙ্ক এবং নির্ম্মলভাবে মায়ের

শ্রীমুখ দেখিতে পারিলে, আদরিণী, সোহাগিনী ভগিনী যমুনা, এক পিঠ চুল এলাইয়া, বিলোল-কটাক্ষে তোমার উপর স্নেহ-সোহাগ ঢালিয়া দিয়া তোমার কপালে যমভয়-নিবারক, মরণভয়-প্রতিষেধক এমন বিজয়-টীকা পরাইয়া দিবে, যে টীকার—যে ফোঁটার জ্যোতিতে তুমি জগজ্জয়ী হইবে। আদ্যাশক্তি জগজ্জননী যাহাদের জননী, তাহাদের ভগিনী কালিন্দী-যমুনা ত বটেনই। যিনি কালের সহোদরা কালিন্দী, তিনি কালকলয়িনী মহাকালীর কন্যা—জঠরজাতা গতি-শীলা। আমিও চিরকাল আছি, তিনিও চির-কাল আছেন। আমি সনাতন, তিনি সনাতনী, কেন না আমরা উভয়ে আদ্যাশক্তি সনাতনীর পুত্রকন্যা—সন্তানসন্ততি।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আর একটু মজার কথা লুকান আছে। কেবল তুমি জাগিলেই হইবে না, ভগিনী কালিন্দীকেও জাগাইয়া তুলিতে হইবে। ভাই-ভগিনী একসঙ্গে না দাঁড়াইলে মায়ের আদর করিবে কে? ভাই রে, আমরা সব কালের পরিবার—শ্যামার সন্ততি। মা আমাদের কালী—শ্যামা—বারিদবরণা; ভগিনী আমাদের শ্যাম-সোহাগিনী, শ্যামাঙ্গী, কালিন্দী-যমুনা—আমরা সবাই কাল। এখন জাগিয়াছ যদি, তবে এই কালরূপের, শ্যাম-বিতানের আদর কর না, ইহার বড়াই, ইহার শ্লাঘা, ইহার দর্প-দম্ভ প্রকাশ কর না, ছার তোমাদের শ্বেতাঙ্গ—শ্বেতাব্জ-শ্বেতকায়! ছার তোমাদের অরুণরাগসমুদ্ভাসিত, রক্তিম-গোলাপবিস্তার! দেখ দেখি আমার কালো বরণ কেমন,—

"নব সজল জলদ কায়
হেরিলে আঁখি জুড়ায়।"

নব সজলজলদ বর্ণ, স্নিগ্ধ শান্ত শ্যামশোভা, শ্যাম-শ্যামার অপরূপ সম্মেলন,—বিভা কত মধুর, কত সুন্দর, কেমন মনোহর! নীল আকাশ সেই শ্যামের প্রতিচ্ছায়া, পয়োনিধির নীলাম্বুরাশি সে বিভার অনুকারী, নবদূর্ব্বাদলশ্যাম সে রূপের নমুনা মাত্র—পত্র-পল্লব, ব্রততী-বল্লরী, সে শ্যামরূপ লইয়া লোফালুফি করিতেছে। ধূম্রগিরিরাজ-মেখলা সে শ্যামরূপের স্থির ধীর বিকাশ। এমন কালোরূপের আদর কর না? জাগিয়াছ যখন, তখন নীল নয়নে এমন নিত্য নীলবরণকে 'নয়ন ভরিয়া দেখ না কেন, জাগিয়াছ যখন, তখন এমন শ্যামরূপের সাকারী ও সাবয়ব বিকাশ শ্যামাঙ্গী যমুনা ভগিনীকে সম্মুখে বসাইয়া তাহারই হাতে সোহাগের বিজয়-টীকা গ্রহণ কর না, তোমাদের কাননকুন্তল দেশের, তোমার গগনপবনের, তোমার নদনদীর, তোমার আকাশ ও সাগরের চিরস্থায়ী শ্যাম শোভাকে নিঙড়াইয়া, তাহাকে ভগিনীরূপে সম্মুখে বসাইয়া, তাহার ফুল্লারবিন্দ হাসিমুখের ফোঁটাটি গ্রহণ কর না, এতকাল পরঘরী, পরদ্বারী ছিলে—এতকাল মোহনিদ্রায় অভিভূত থাকিয়া স্বপ্নঘোরে কেবল শ্বেত ও লোহিতের বাহার দেখিতেছিলে, নিজের শ্যামচর্ম্ম ছিঁড়িয়া তুলিয়া শাদার দলে মিশিতে চাহিতেছিলে; তোমার শ্যামা-মায়ের কোলে যখন জাগিয়াছ, মায়ের শ্যাম-শোভা যখন প্রাণ ভরিয়া দেখিয়াছ, তখন শ্যামাঙ্গ ভাইদের হাত ধরিয়া শ্যামা-মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শ্যামাঙ্গীর এবং শ্যামলীলাবিলাসিনী ভগিনী কালিন্দীর হাতের ফোঁটাটা আজ হেঁটমুণ্ডে গ্রহণ কর না, যে মরণভয়ে আজ আকুল হইয়া উঠিয়াছ, সে মরণভয় তোমার আর থাকিবে না। যে যম—মৃত্যু-বিস্মৃতির ভীষণ বদন ব্যাদান করিয়া একে একে তোমার অতীতের কত গৌরবের, কত স্পর্দ্ধার

বৈশিষ্ট্য—তোমার বংশের ধারা, জাতির ধারা, ধর্ম্মের ধারা, সভ্যতার ধারা, বিশিষ্টতার ধারা—গ্রাস করিতেছিল, সে ভগিনীর স্নেহের টীকা দেখিয়া আর তোমাকে গ্রাস করিবে না, বরং যে সকল গ্রাস করিয়াছে, তাহা উগারিয়া দিবে। জাগিয়াছ যদি, তবে গ্রহণ কর—ভাই ভাই এক ঠাঁই হইয়া, হাত ধরাধরি করিয়া শ্যামশোভায়—শ্যামসোহাগে প্রমত্ত হইয়া শ্যামা ভগিনী—কালিন্দী সহোদরার বামাঙ্গুলির স্নেহের ফোঁটা আদরে গ্রহণ কর। তোমার কল্যাণ হইবে—তুমি আবার পূর্ব্বজদিগের মত অমর অজর অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

মধুসূদনের কাব্যানুরক্তি

মধুসূদন বহু ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সমস্ত শিক্ষার ও অধ্যয়নের নিষ্কর্ষ, তাঁহার কাব্যানুরক্তি। নানাদেশীয় কাব্য-শাস্ত্রের অনুশীলনে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি, বঙ্গদেশে, বোধ হয়, এ পর্য্যন্ত, অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের অন্যান্য অনেক গুণের ন্যায় এই কাব্যানুরাগও তাঁহার জননীর প্রদত্ত শিক্ষা হইতে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। সে সময় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার বড় প্রচলন ছিল না। কিন্তু জাহ্নবীদাসী, তৎকালেও, লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি রামায়ণ, মহাভারত, এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি বাঙ্গালা কাব্যসমূহ অতি যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। তাঁহার স্মরণশক্তি অতি তীক্ষ্ণ ছিল; পঠিত গ্রন্থের অনেক অংশ তিনি মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। মেধাবী মধুসূদন, আট দশ বৎসর বয়সের সময়ে, মাতাকে ও বাটীর অন্যান্য প্রাচীন মহিলাদিগকে এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতেন এবং মাতার দৃষ্টান্ত-অনুসারে তাহা কণ্ঠস্থ করিতেন। কোন সহৃদয় ব্যক্তি যথার্থই বলিয়াছেন, মনুষ্য মাতৃস্তন্যের সঙ্গে যাহা শিক্ষা করে, জীবনে তাহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারে না। মধুসূদনের সম্বন্ধে একথা অতি সুন্দররূপে প্রমাণিত হইয়াছে। বহু ভাষায় এবং বহু গ্রন্থে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও, মাতৃপ্রদত্ত শিক্ষার ফলে, রামায়ণ ও

রামায়ণ ও মহাভারত পাঠে অনুরাগ।

মহাভারত-সম্বন্ধে মধুসূদনের অনুরাগের কখনও খর্ব্বতা হয় নাই। পূর্ণবয়সে যখন সংস্কৃত, পারসীক, লাটিন, গ্রীক, ইংরাজী, ফরাসী, জর্ম্মান এবং ইতালীয়ান—পৃথিবীর এই আটটী প্রধান ভাষার রত্ন-ভাণ্ডার তাঁহার নিকট উন্মুক্ত হইয়াছিল এবং যখন তিনি বাল্মীকি, হোমর, ভার্জ্জিল, দান্তে এবং মিণ্টন প্রভৃতি মহাকবিদিগকে সুহৃদ্রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখনও তিনি তাঁহার শৈশবের সহচর, দরিদ্র কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাসকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাঁহার মান্দ্রাজ হইতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার কোন আত্মীয়, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখেন, তিনি একখানি কাশীদাসী মহাভারত মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেছেন। মধুসূদন বেশভূষায় এবং আহার-ব্যবহারে সাহেবের ন্যায় থাকিতেন; সুতরাং তাঁহার আত্মীয় ব্যঙ্গ্য করিয়া বলিলেন, "একি! সাহেব লোকের হাতে মহাভারত?"

মধুসূদন হাসিয়া বলিলেন, "সাহেব আছি বলিয়া কি বইও পড়িতে দিবে না? রামায়ণ, মহাভারত আমার কেমন ভাল লাগে, না পড়িয়া থাকিতে পারি না।"

মান্দ্রাজে অবস্থান কালে, যখন চর্চ্চার অভাবে, তিনি বাঙ্গালা-ভাষা বিস্মৃত হইতেছিলেন, তখনও তিনি, কলিকাতা হইতে রামায়ণ ও মহাভারত আনাইয়া, যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। কেবল রামায়ণ, মহাভারত নহে; বাঙ্গালা ভাষার অনেক প্রাচীন কাব্যই তিনি অতি সমাদরের সহিত পাঠ করিতেন, এবং সেই সকল কাব্যের অনেক স্থলই তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। চতুর্দ্দশপদী কবিতা-বলীতে তিনি তাঁহার স্বদেশীয় কবিগণের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন

করিয়া গিয়াছেন তাহা শিষ্টাচারের জন্য নয়; তাহা প্রকৃতই তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধার ও অনুরাগের ফল।

রামায়ণ ও মহাভারত পাঠের সহিত মধুসূদনের ভবিষ্যৎ জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। যে মহাগ্রন্থদ্বয়, শত শত বৎসর অবধি, হিন্দু নরনারীদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছে এবং সহস্র সহস্র ভারতসন্তান যাহা হইতে আপন আপন ভাবী মহত্ত্বের বীজ প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা মধুসূদনেরও প্রকৃতিদত্ত প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। বাল্যে পুনঃ পুনঃ রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিয়া তিনি তাঁহার কবিশক্তি-বিকাশের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় আরও কত ভারতীয় কবি যে এরূপ সহায়তা প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহার সংখ্যা নাই। লোকের বিশ্বাস, কল্পতরুর নিকট প্রার্থনা করিলে অভীষ্ট বর প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামায়ণ ও মহাভারত হিন্দু-সন্তানের পক্ষে সেই কল্পতরু। আমাদিগের জাতীয় জীবন গঠনের পক্ষে এই দুই গ্রন্থ যেরূপ সহায়তা করিয়াছে, ইলিয়দ্ ভিন্ন আর কোন কাব্য সেরূপ করিয়াছে কি না সন্দেহ। কত অনুতপ্ত হৃদয় ইহা হইতে শান্তিলাভ করিতেছে; কত শোকজীর্ণ প্রাণ ইহা হইতে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইতেছে; কত স্বদেশবৎসল ইহা হইতে বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেম শিক্ষা করিতেছেন; এবং কত ভাবুক পুরুষ ইহা হইতে কবিশক্তি পরিপোষণের সহায়তা প্রাপ্ত হইতেছেন। রাজা পরীক্ষিত ইহা হইতে ঘোর অনুতাপ-যন্ত্রণায় মুক্তি পাইয়াছিলেন; শিবাজী ইহা হইতে স্বদেশপ্রেম শিক্ষা করিয়াছিলেন; তুলসীদাস ইহা হইতে ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিয়াছিলেন; এবং সেই

রামায়ণ ও মহাভারত পাঠের ফল।

প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতের সহস্র সহস্র কবি ইহা হইতে আপন আপন কবিশক্তি পরি-পোষণের উপযুক্ত উপাদান প্রাপ্ত হইতেছেন। মধুসূদনের প্রকৃতিদত্ত কবিশক্তি বিকাশের পক্ষে যে সকল সামগ্রী অনুকূলতা করিয়াছিল, রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে উল্লেখের যোগ্য। কিন্তু এই রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ-সম্বন্ধে বাল্মীকির ও বেদব্যাসের অপেক্ষা কৃত্তিবাসের ও কাশীদাসেরই নিকট মধুসূদন সমধিক ঋণী ছিলেন। মহর্ষিদ্বয়ের সৃষ্ট চরিত্র হইতে যদিও তিনি তাঁহার কাব্যসমূহের ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভাষাজ্ঞান, বর্ণনানৈপুণ্য এবং পুরাণান্তর্গত বিষয়-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কৃত্তিবাস ও কাশীদাস হইতেই লব্ধ। মেঘনাদবধের ও বীরাঙ্গনার অনেক স্থলেই, সেই জন্য ইঁহাদিগের প্রভাব লক্ষিত হইবে।

শৈশব-শিক্ষা।

মধুসূদনের কাব্যানুরক্তির অপর কারণ তাঁহার বাল্য-শিক্ষা। শৈশবে গ্রামস্থ পাঠশালায় তিনি যে শিক্ষকের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতেন, তিনি পারসীক ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ছাত্রদিগকে তিনি অনেক পারসীক ভাষার কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন, এবং তাঁহাদিগকে সেই সকল কবিতা কণ্ঠস্থ করিতে বলিতেন। তিনি নিজে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন কি না, তাহা জানিতে পারা যায় না। তবে তিনি যে কবিতানুরাগী ছিলেন, তাহা তাঁহার ছাত্রদিগের হৃদয়ে কাব্যানুরাগ সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা-দ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে। শিক্ষক মহাশয়ের উপদেশ-অনুসারে মধুসূদন, অল্প বয়সে, অনেক পারসী কবিতা কণ্ঠস্থ

করিয়াছিলেন, এবং সমবয়সীদিগকে তাহা আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন। হিন্দু-কলেজে অধ্যয়নের সময়েও তিনি পারসী "গজল" গান করিয়া সঙ্গীদিগকে আমোদিত করিতেন।

মধুস্থদনের কাব্যানুরক্তির অপর একটী কারণ তাঁহার সঙ্গীত-প্রিয়তা। বাল্য হইতে, কবিতার ন্যায়, গীতবাদ্যেরও দিকে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার পিতার ও পিতৃব্যগণের ন্যায় তিনিও আগমনী, বিজয়া-সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে গদ্গদশ্রু হইতেন। অবস্থার কোনও রূপ পরিবর্ত্তনে তাঁহার সঙ্গীতানুরাগের হ্রাস হয় নাই। তাঁহার ব্যারিষ্টার হইয়া, ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর, কোন ব্রাহ্মণ, একবার তাঁহার নিকট একটী মোকদ্দমা-সম্বন্ধে পরামর্শ জানিবার জন্য গিয়াছিলেন। মধুস্থদনের সঙ্গে ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব-পরিচয় ছিল এবং তিনি জানিতেন যে, ব্রাহ্মণ অতি সুন্দর "সখীসংবাদ" গান করিতে পারেন। মধুস্থদন মোকদ্দমার কথা রাখিয়া, সখীসংবাদ শুনিবার জন্য, ব্রাহ্মণকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, এবং তাঁহার নিকট ক্রমান্বয়ে, দশ পনরটী সখীসংবাদ শুনিয়া, বিনা অর্থগ্রহণে, তাঁহার মোকদ্দমা-সম্বন্ধে উপযুক্ত পরামর্শ দান করিলেন।

সঙ্গীত-প্রিয়তা।

মধুস্থদনের সাহিত্যিক জীবন বুঝিতে হইলে তাঁহার শৈশব সম্বন্ধীয় যে সকল বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যক, আমরা, একে একে, তাহার আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার পিতামাতার কাব্যানুরাগ, তাঁহার শিক্ষকের কবিতাপ্রিয়তা এবং সেই সঙ্গে তাঁহার নিজের রামায়ণ ও মহাভারত পাঠে এবং সঙ্গীত-শ্রবণে প্রগাঢ় আসক্তি ইত্যাদি যে সকল উপাদানে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইয়াছিল, আমরা,

জন্মভূমির সৌন্দর্য্য।

ক্রমে ক্রমে, তাহার সকল গুলিরই উল্লেখ করিয়াছি। কেবল তাঁহার কপোতাক্ষী-সলিল-বিধৌতা, গ্রাম্য সৌন্দর্য্যপূর্ণা জন্মভূমির বিষয় উল্লেখ করি নাই। প্রকৃতি আপন নীরব ভাষায় যে শিক্ষা প্রদান করেন, পৃথিবীর কোন কাব্য বা কোন উপদেষ্টার উপদেশ হইতে সে শিক্ষা লাভ করিতে পারা যায় না। প্রকৃতির নিত্য-নবীন মুখশ্রী যে কত অপ্রেমিককে প্রেমিক ও কত অকবিকে কবি করিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। সেইজন্য মধুসূদনের শৈশবের অন্যান্য অনুকূল উপাদানের ন্যায়, তাঁহার জন্মভূমির কথারও উল্লেখ আবশ্যক।

প্রকৃতির অতি সৌন্দর্য্যময় নিকেতনে মধুসূদনের শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল। এক্ষণে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ভ্রষ্টগৌরব হইলেও তাঁহার জন্মভূমি সাগরদাঁড়ী অতি সুকোমল গ্রাম্য-শোভায় পূর্ণ। নদী, প্রান্তর, এবং বৃক্ষলতা প্রভৃতি যে সকল উপাদান লইয়া বঙ্গের পল্লীগ্রামের সৌন্দর্য্য, তাহার কোনটীরই সেখানে অভাব নাই। নির্ম্মলসলিলা কপোতাক্ষী, ইহার তিন দিক্ বেষ্টন করিয়া, ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণী, শাখায় শাখায় সম্বদ্ধ হইয়া, স্থানে স্থানে, তাহার উপর অবনত হইয়া পড়িয়াছে। শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ভূমি, নদীর তট হইতে জলের রেখা পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। নগরের কৃত্রিমতার সঙ্গে সেখানকার কোন সম্বন্ধ নাই। প্রকৃতি অতি সরল, গ্রাম্য-মূর্ত্তিতে সেখানে বিরাজিতা। নদীজলে কুলললনাগণ স্নানাবগাহন করিতেছেন; ক্ষুদ্র, বৃহৎ নানাপ্রকারের তরণী-সমূহ নদীবক্ষে গমনাগমন করিতেছে; কৃষক-বনিতাগণ, কলসীকক্ষে, নদীতটে দণ্ডায়মান হইয়া, একদৃষ্টিতে

তাহাদিগের পানে চাহিয়া রহিয়াছে; রাখালবালকগণ পশুপাল ছাড়িয়া, ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতেছে; দেখিলে নগরের কোলাহল বিস্মৃত হইয়া, সেই সরল, গ্রাম্য-সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়া যাইতে হয়। কপোতাক্ষীর পশ্চিমদিকে দূরপ্রসারিত শ্যামলপ্রান্তর। নদীর উভয় তটে, বৃক্ষলতার অন্তরালে, স্থানে স্থানে, কৃষকদিগের কুটীর; মধ্যে মধ্যে দুই একটী প্রাচীন বট বা অশ্বত্থবৃক্ষ। উদ্যানজ তরুসমূহের ঘনসন্নিবেশে গ্রামটী মধ্যাহ্নকালেও ছায়াপূর্ণ। মধুসূদনের কণ্ঠস্বর নীরব রহিয়াছে; কিন্তু তাঁহার জন্মভূমির বিহগগণের সঙ্গীতের বিরাম হয় নাই। পাপিয়ার গগনপ্লাবী কণ্ঠস্বরে এখনও তাহা, পূর্ব্বের ন্যায়, দিবারাত্র প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কত অযত্ন-সম্ভূত তরুলতা, উদ্যানজ বৃক্ষরাজির সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া, গ্রামটীকে অরণ্যশোভায় অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। মধুসূদনের পৈতৃক বাসভবনের অদূরবর্ত্তী নদীতটে দণ্ডায়মান হইয়া, একবার, জ্যোৎস্নালোকে, পাপিয়ার দিগন্তপ্লাবী সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে নিস্তব্ধ গ্রামটীর এবং ধীরবাহিনী কপোতাক্ষীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, অতি নীরস হৃদয়ও কবিজনোচিত সরসভাবে পূর্ণ হয় এবং গ্রামটীকে স্কটের ভাষায় "কবিপুত্রের উপযুক্ত ধাত্রী" * বলিতে ইচ্ছা করে। নিদাঘের জ্যোৎস্নালোকে যিনি কপোতাক্ষীর সৌন্দর্য্য দর্শন করিবেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, মধুসূদন যে তাহাকে দুগ্ধস্রোতের সহিত তুলনা করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত হয় নাই।

যোগীন্দ্রনাথ বসু।

---

* Meet nurse for a poetic child.

স্বদেশ-মন্ত্র

হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর ; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলিপ্রদত্ত ; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট্ মহামায়ার ছায়ামাত্র ; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই ; বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ; আর বল দিনরাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা, আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

স্বামী বিবেকানন্দ।

বঙ্গসাহিত্যের ভবিষ্যৎ

প্রথম যৌবনে, যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতাম, তারপর যখন ক্রমে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম, আমার সতত ধ্যান ছিল যে, কি উপায়ে আমার জননী বঙ্গভূমির, বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিব। মানুষের কত স্বপ্ন থাকে, আমার ঐ একই স্বপ্ন ছিল। একটা ধারণা আমার দৃঢ় ছিল যে, যে জাতির মাতৃভাষা যত সম্পন্ন, সে জাতি তত উন্নত ও অক্ষয়। আমার মাতৃসমা মাতৃভাষাকে যদি কোনমতে সম্পত্তিশালিনী করিতে পারি, আমার জীবন ধন্য হইবে। কিন্তু অপলাপে লাভ কি? যে সম্পদ্ থাকিলে, যে শক্তি থাকিলে, মাতৃভাষার মুখ উজ্জ্বল করা যায়, দুর্ভাগ্য আমি, আমার সে সম্পদ্ বা শক্তি নাই। আমি মধ্যে মধ্যে ভাবিতাম, কবে এমন দিন আসিবে, যখন, আমার শিক্ষিত দেশবাসিগণ আচারে ব্যবহারে, কথায় বার্ত্তায়, চালচলনে প্রকৃত বাঙ্গালীর মতন হইবে। কবে দেখিব, দেশের যাঁহারা মুখপাত্রস্বরূপ, সমাজের যাঁহারা নেতা, বঙ্গভাষা তাঁহাদের আরাধ্যদেবতা। কবে শুনিব, শিক্ষিত বাঙ্গালী আর এখন বাঙ্গালাভাষায় সর্ব্বসমক্ষে কথা বলিতে বা প্রকাশ্য সভাসমিতিতে বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, বা বঙ্গবাসী নিজেকে বঙ্গভাষার সেবকরূপে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন না। আজ ভাবিতেও শরীর কণ্টকিত হয়, নয়নে আনন্দাশ্রু উদ্ভূত হয় যে, সে সুদিন আসিয়াছে, আমার সেই আবাল্যধ্যেয় সুসময় আজ আমার সম্মুখে বর্ত্তমান। একদিকে, দেশের যাঁহারা

ভবিষ্যৎ আশার স্থল, যাঁহাদের বিবেচনার উপর বঙ্গদেশের অদৃষ্ট নিহিত, সেই শিক্ষার্থী যুবকগণ আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজভাষার সহিত বঙ্গভাষারও আলোচনা করিতেছেন, আর দু'দিন পরে, যাঁহারা ইচ্ছা করিলে, তর্জ্জনীহেলনে দেশের লোক-মত পরিচালন করিতে পারিবেন, সেই যুবকবৃন্দ বঙ্গভাষার চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার আসন পড়িয়াছে; শ্বেত-দ্বীপের মাতৃভাষার পার্শ্বে আমার বঙ্গের শ্বেতশতদল-বাসিনীর সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে; আর ঐ দেখ, অন্যদিকে যাঁহারা লক্ষ্মীর বরপুত্র, সৌভাগ্যদেবতার আদরের সন্তান, তাঁহারাও বঙ্গভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। বঙ্গের তথা বঙ্গভাষার ইহা পরম কল্যাণের কথা। বাঙ্গালীর ইহা পরম মাহেন্দ্রক্ষণ।

দেশের জনসঙ্ঘকে যদি সৎপথে লইয়া যাইতে হয়, মানুষ করিয়া তুলিতে হয়, বাঙ্গালী জাতিকে একটা মহা জাতিতে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে, তাহাদিগের মনের সম্পদ্ যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা করিতেই হইবে। পাশ্চাত্ত্য ভাষায় অনিপুণ থাকিয়াও, যাহাতে বঙ্গের ইতর-সাধারণ, পাশ্চাত্ত্য প্রদেশের যাহা উত্তম, যাহা উদার এবং নির্ম্মল, তাহা শিখিতে পারে, এবং শিখিয়া আত্মজীবনের ও আত্মসমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মধ্যে যাহা নির্দ্দোষ, আমাদের পক্ষে যাহা পরম উপকারক, যে সমুদয় গুণগ্রাম অর্জ্জন করিতে পারিলে, আমাদের সুন্দর সমাজ-দেহ ও দেশাত্ম-বোধ, আরও সুন্দরতর, সুন্দরতম হইবে, সেই সকল বিষয়, আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে বঙ্গের সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করিতে হইবে। ক্রমেই যে ভয়ঙ্কর কাল আসিতেছে, সেই কালের

সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশবাসীদিগকে জয়ী করিতে হইলে, কেবল এদেশীয় নহে, বিদেশীয় আয়ুধেও সন্নদ্ধ হইতে হইবে। সুতরাং জাতীয় সাহিত্যগঠন-সম্বন্ধে অদ্য আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। অদ্য আমার প্রধানতঃ বক্তব্য এই যে, শুধু বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যগঠন করিলেই চলিবে না, বঙ্গের জাতীয় সাহিত্য কি উপায়ে জগতের অপরাপর দেশের বিদ্বদ্বৃন্দেরও আরাধ্য হইতে পারে, তাহার চিন্তা করিতে হইবে; এবং সেই চিন্তা-প্রসূত উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিতে হইবে। তবেই ত বঙ্গভাষা অমরত্ব লাভ করিবে। যদি এমন ভাবে বঙ্গসাহিত্য গঠিত হয়, এমন সম্পদে বঙ্গসাহিত্য সুসম্পন্ন হয় যে, সেই সম্পদের উৎকর্ষে পৃথিবীর অপরাপর মনীষিগণেরও চিত্ত আমার বঙ্গসাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, আজ যেমন আমরা অনেক অনর্ঘ এবং শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত পাশ্চাত্ত্য দেশের অনেক ভাষা শিখিতে প্রয়াস করিয়া থাকি, সেইরূপ বঙ্গভাষায় যদি এমন অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয়, আবিষ্কৃত এবং উপনিবদ্ধ হয়, যাহা কৃতবিদ্য মাত্রেরই সর্ব্বথা অবশ্যশিক্ষণীয়, অথচ পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় ঐ ঐ বিষয়সমূহ, এতাবৎকাল লিখিত হয় নাই, তাহা হইলে, পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের বিদ্বদ্বৃন্দই সাগ্রহে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবেন। সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে হইলেই যাহাতে বঙ্গভাষাও অপরাপর ভাষার ন্যায় শিখিতে হয়, না শিখিলে, অনেক অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় চিরকালের মত অজ্ঞাত থাকিয়া যায়, সুতরাং অন্য শত ভাষার শিক্ষাতেও পুরা মানুষ হওয়া যায় না, যদি এমনই ভাবে বঙ্গভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি করা যায়, তবেই বঙ্গভাষা জগতে চিরস্থায়িনী হইবে, বাঙ্গালার ভাষা জগতের অন্যান্য প্রধানতম ভাষার শ্রেণীতে সমুন্নীত হইবে। অন্যথা

বঙ্গের তথা বঙ্গভাষার গৌরব বাড়িল কৈ? বঙ্গসাহিত্য বলিলেই যাহাতে একটা বিরাট্ সাহিত্য বুঝায়, বিশ্বের অন্যতম প্রধান সাহিত্য বুঝায়, এমন ভাবে বঙ্গসাহিত্যের গঠন করিতে হইবে। কিছুই অসম্ভব নহে। চেষ্টা ও একাগ্রতা থাকিলে এই সংসারে স্বপ্নকেও বাস্তবে পরিণত করা যায়।

এক দেশের ভাষা অন্য দেশের লোকের নিকট আদৃত হইবার কারণ প্রধানতঃ দুইটী,—একটী রাজনৈতিক কারণ, অপরটী ভাষায় শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রাচুর্য্য।

রাজার জাতির ভাষা না শিখিলে, রাজার জাতির ভাষায় বিজ্ঞতালাভ না করিলে, নানারূপ অসুবিধা, সুতরাং বিজিত জাতির বিজেতার ভাষায় অভিজ্ঞ হওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। ধরিয়া লউন, আমাদের ইংরাজরাজ যদি আজ পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট্ হইতেন, তাহা হইলে এই বিশাল পৃথিবীতে ইংরাজী ভাষাই প্রধানতঃ প্রচলিত হইত। সেরূপ কোনও সম্ভাবনা আমাদের বঙ্গভাষার নাই, সুতরাং প্রথমোক্ত কারণে বঙ্গভাষা জগতের ভাষা হইতে পারে না। কিন্তু রাজভাষা না হওয়া সত্ত্বেও এমন অনেক ভাষা দেখিতে পাই, যাহা পৃথিবীর অন্যান্য দেশবাসীর নিকট অনাদৃত নহে, প্রত্যুত যথেষ্ট আদৃতই হইয়া থাকে। যেমন ইংরাজী ভাষা। সমগ্র পৃথিবী ইংরাজের রাজত্ব না হইলেও, অনেক স্বাধীন দেশেও এই ভাষার আদর দেখিতে পাই। এইরূপ রুষদেশীয় ভাষাও এমন অনেক দেশে যথেষ্ট সমাদৃত, যেখানে হয়ত এক লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে একজনও রাষিয়ান দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের গর্ব্বের কারণ, ভারতবর্ষের স্পর্দ্ধার বিজয়বৈজয়ন্তী সংস্কৃতভাষা, অথবা ইউরোপের লাটিন্ এবং গ্রীক্‌ভাষা কোন্ দেশে

অনাদৃত? কোন্ মেধাবী ব্যক্তি এই সকল ভাষা শিখিয়া কৃতার্থ হইতে না চান? ফরাসী ভাষায় যে সকল বিশিষ্ট বিশিষ্ট জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাদি আছে, তাহার অনুবাদমাত্রে পরিতৃপ্ত না হইয়া, কোন্ আজীবনছাত্র মনস্বী উক্ত ভাষা অভ্যাস না করেন? এই সকলের কারণ কি? ঐ ঐ ভাষায় এমন অনেক বস্তু আছে, যাহা না শিখিলে, সেই সেই বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ হইয়াছেন, এ কথা অবিসংবাদে স্বীকার করা যায় না। মনে করুন, গণিত এবং রসায়নশাস্ত্র;— রাষিয়ান ভাষায় গণিত এবং রসায়নশাস্ত্রের এত অধিক পর্য্যালোচনা ও গবেষণা আছে যে, সেই সেই শাস্ত্রব্যবসায়ীদের পক্ষে সেগুলি অবশ্য-দ্রষ্টব্য। যদি কেহ অঙ্ক বা রসায়নশাস্ত্রে প্রকৃত পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিতে চান, ঐ ঐ বিষয়ে নিজের যে জ্ঞান-পিপাসা, তাহা সম্পূর্ণরূপে মিটাইতে চান, তবে তাঁহাকে রুষীয় ভাষা শিক্ষা করিতেই হইবে। অন্যথা সে সম্ভাবনা নাই। ইংলণ্ডের, অথবা কেবল ইংলণ্ড কেন, জগতের গৌরবভাজন মহাকবি সেক্ষপীয়ারের অমৃতময়ী লেখনীর রসাস্বাদ করিবার জন্য কোন্ সুরসিক ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে না চান? রাজনৈতিক কারণ ব্যতিরেকেও রাষিয়ান এবং ইংরাজী ভাষার প্রতি এত যে আদর, জ্ঞানার্থীদের এত যে শ্রদ্ধা, তাহার প্রকৃত কারণ হইল, তৎ তৎ ভাষায় ঐ সমুদয় মহার্ঘ বিষয়ের সন্নিবেশ। যদি অঙ্ক এবং রসায়ন-বিষয়ে রাষিয়ান ভাষা অতটা সম্পন্ন না হইত, বা সেক্ষপীয়ার, মিল্টন, বাইরন প্রভৃতির অপূর্ব্ব কল্পনালোকে, বা নিউটনের অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কারে ইংরাজী ভাষা সমলঙ্কৃত না হইত, তবে রুষিয়া এবং ইংরাজের অনধিকৃত দেশসমূহেও এই এই ভাষার কি এত গৌরব কদাচ বৃদ্ধি পাইত? ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানময় সংস্কৃত ভাষার

ইউরোপেও যে এত আদর, তাহার কারণ কি? পরাধীন ভারতের প্রাচীনতম ভাষার প্রভাব স্বাধীন পাশ্চাত্ত্য জগতে যে ভাবে বিস্তার লাভ করিতেছে, তাহাতে মনে হয়, কালে এমন এক দিন আসিবে, যখন, পশ্চিমের প্রত্যেক বিজ্ঞ অভিজ্ঞ ব্যক্তিই কোন না কোন বিষয়ে সম্পূর্ণতা লাভের জন্য সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করিবেন। কবে, কোন্ দিন, কত শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, তমসার তীরে বসিয়া, ক্রৌঞ্চমিথুনের কবি, তাঁহার তপঃসিদ্ধ বীণায় ঝঙ্কার দিয়া গিয়াছেন, আর আজও ঐ দেখ, সকল দেশের সুপণ্ডিত ব্যক্তিই সেই ঝঙ্কার শুনিবার জন্য কাণ পাতিয়া আছেন। বাল্মীকির রামায়ণ বা ব্যাসের মহাভারত, ভারতের অপৌরুষেয় বেদ-সংহিতা প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় উপনিবদ্ধ বলিয়া সকল দেশের জ্ঞানপিপাসুই এই ভাষায় আস্থাসম্পন্ন। মহাকবি কালিদাস, শিপ্রাতটে বসিয়া যে মোহন বংশীধ্বনিতে ভারতবর্ষ উদ্‌ভ্রান্ত, একেবারে তন্ময় করিয়া গিয়াছেন, আজও সে বাঁশরী-ঝঙ্কারের যেন বিরাম হয় নাই; ঐ দেখুন, ইউরোপের মেধাবী সন্তানগণ, ঐ মনোজ্ঞ সঙ্গীতের রসাস্বাদের আশায়, সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করিতেছেন। এদেশীয় শকুন্তলা-নাটকের বিদেশীয়-কৃত অনুবাদের অনুবাদ পড়িয়াও সুকবি গেটে আত্মহারা হইয়াছিলেন। জগতের অন্যতম প্রধান চিন্তাশীল প্লেটো, ইউক্লিড, পিথাগোরাস, এরিষ্টটল প্রভৃতির মনীষাসাগরোত্থিত রত্নমালা কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক গ্রীক্ ভাষা এই মরধামে অমরতালাভ করিয়াছে। রাজনৈতিক আধিপত্যে উল্লিখিত ভাষাসমূহ অকিঞ্চিৎকর হইলেও জ্ঞানের আধিপত্যে, সম্পদের আধিপত্যে ঐ ঐ ভাষা জগতের শিক্ষিত সমাজের উপর অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবীর

রাজনৈতিক গগনের চন্দ্র সূর্য্য পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানমহার্ণবের বেলাভূমিতে ঐ যে সমুদয় প্রাচীন মনীষিগণের সুচিন্তারত্নবিমণ্ডিত সৌধাবলী শির উত্তোলনপূর্ব্বক, স্মরণাতীত কাল হইতে দাঁড়াইয়া আছে, জগতের ঐহিকবাদিগণের পরস্পর বাদবিসংবাদ দর্শনে যেন নীরবে হাসিতেছে,—ঐ সকল মনীষা-মন্দিরের কোন দিন বিলোপ ঘটিবে না। নানাবিধ বিপ্লবে ভারতবর্ষ ধ্বস্তবিধ্বস্ত হইলেও, সেই প্রাচীন কাল হইতে বেদাদি রত্নহারে সুশোভিত হইয়া সংস্কৃত ভারতী একই ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। যদি সংস্কৃত ভাষায় বেদ, উপনিষদ্, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, সংহিতা প্রভৃতি উপনিবদ্ধ না হইত, যদি কালিদাস, ভবভূতি, ভাস প্রভৃতি অমর কবিকুলের সযত্নগ্রথিত মণিময়হারে সংস্কৃত ভাষা অলঙ্কৃত না হইত, তবে কি আজ এই ঘোর জীবন-সংগ্রামের দিনেও সংস্কৃত ভাষা এমনই অক্ষতদেহে ভারতীয় সভ্যতার কিরীটরূপে শোভা পাইত? ভাষার অমরত্বের এবং সর্ব্বত্র প্রসারের কারণ হইল সম্পদ্। যে ভাষায় যত সম্পদ্, যে ভাষা যত অধিক সুচিন্তা-প্রসূত-বিষয়ে বিমণ্ডিত, সেই ভাষার প্রসার জগতে তত অধিক। সে ভাষা যে দেশেরই হউক না কেন, সকল বিদেশীয়েরাই আন্তরিক যত্নসহকারে সেই ভাষার সেবা করিয়া নিজেকে ধন্য করিবেন। এইরূপ সংস্কারে হৃদয় দৃঢ় করিয়া, বঙ্গভূমির প্রকৃত সুসন্তানের ন্যায়, আমরা যদি বঙ্গভাষার আলোচনা করিতে পারি, কালে বঙ্গভাষা জগতের শিক্ষণীয় ভাষা হইবে। বঙ্গের গৌরব ডাক্তার রবীন্দ্রনাথের ন্যায়, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গের বর্ত্তমান মনস্বিগণও যদি, তাঁহাদের জ্ঞানগরিমার সম্পদ্ বঙ্গভাষাতেই উপনিবদ্ধ করেন, এবং উত্তর-

কালেও যাঁহাদের হস্তে বাঙ্গালার সারস্বত-রাজ্যের ভার অর্পিত হইবে, তাঁহারা যদি বঙ্গভাষাতেই স্ব স্ব জ্ঞানের চরম ফল লিপি-বদ্ধ করিয়া যান,—এবং এই প্রকারে যদি বহুকাল বঙ্গসাহিত্যের সেবা অব্যাহতভাবে প্রচলিত থাকে, তবে এমন এক দিন আসিবেই, যখন বিদেশীয়গণের অনেক কৃতবিদ্যকেই আগ্রহপূর্ব্বক বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। বাঙ্গালার মধ্যে যাঁহারা কোন বিষয়ে প্রাবীণ্য লাভ করেন, কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হন, তাঁহারা যদি তাঁহাদের আবিষ্কার, তাঁহাদের চিন্তালহরী, ভাষান্তরে রূপান্তরিত না করিয়া স্ব স্ব মাতৃভাষাতেই প্রকাশপূর্ব্বক জন্মভূমির তথা জননী বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে জগতের অপরাপর শিক্ষিত সম্প্রদায় বাধ্য হইয়া বঙ্গভাষার আলোচনা করিবেন। অবশ্য তাহাতে বঙ্গভাষা জগতের সর্ব্বত্র একাধিপত্য করিবে না সত্য, কিন্তু রাষিয়ান্ গ্রীক্ লাটিন্ সংস্কৃত ইংরাজী ফরাসী প্রভৃতির ন্যায় বঙ্গভাষাও পৃথিবীর তাবৎ শিক্ষাকেন্দ্রের বিশেষজ্ঞগণের অন্যতম আলোচনীয়রূপে গৃহীত হইবে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান

গত কয় বৎসর বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রায় সমস্ত গুলিই পাঠ্যপুস্তকশ্রেণিভুক্ত। দুই একখানি মাত্র সাধারণ পাঠোপযোগী। ইহা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য হইতে বিজ্ঞান স্থানচ্যুত হইয়াছে। বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিতা হইয়া ইউরোপখণ্ডে ও আসিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তে আশ্রয় লইয়াছেন। বাস্তবিক ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালা সাহিত্যের এ প্রকার দুর্গতি হয় নাই। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকায় তখন বিজ্ঞান স্বীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। অক্ষয়কুমার 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় পদার্থবিদ্যা-বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, রাজেন্দ্রলাল 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' ভূতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের অস্থিমজ্জাগত হইয়া থাকিবে। বাঙ্গালা সাহিত্যে বিজ্ঞানের যাহা কিছু সমাবেশ হইয়াছে তজ্জন্য এই দুই মহাত্মার নিকট আমরা চিরঋণী থাকিব। ইহাদের কিছু পূর্ব্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লর্ড হার্ডিঞ্জের আনুকূল্যে Encyclopædia Bengalensis অথবা 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' আখ্যা দিয়া কয়েকখণ্ড পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। ইহাতে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও দর্শনতত্ত্ব সকল প্রকাশিত হইত। রাজেন্দ্রলাল ও কৃষ্ণমোহন উভয়েই অশেষশাস্ত্রবিৎ ও নানাভাষাভিজ্ঞ ছিলেন।

যদিও তাঁহাদের রচনা অক্ষয়কুমারের রচনার ন্যায় স্থায়ী প্রচলিত সাহিত্যের (classics) মধ্যে গণ্য হইবে না, তথাপি তাঁহারা বঙ্গ-সাহিত্যের অভিনব পথপ্রদর্শক বলিয়া চিরকাল মান্য হইবেন। কিন্তু ইঁহাদের পূর্ব্বেও বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারের জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি হইয়াছিল। শ্রীরামপুরের মিশনারীগণকে বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; তাঁহারাই আবার বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারেরও প্রথম প্রবর্ত্তক। আমাদের জাতীয় অভিমান আঘাতপ্রাপ্ত হয় বলিয়া একথা আমাদের ভুলিয়া যাইলে, 'খৃষ্টানী বাঙ্গালা' বলিয়া তাঁহাদের কৃত কার্য্যকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না, ঐতিহাসিক ন্যায়ের ও সত্যের তুলাদণ্ড হস্তে করিয়া যাহার যে সম্মান প্রাপ্য তাহাকে তাহা প্রদান করিতে হইবে।

১৮২৫ খৃঃ অঃ উইলিয়ম ইয়েট্‌স্ প্রথমে 'সার পদার্থ-বিদ্যা' বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত করেন। ইহাতে পদার্থবিদ্যা ভিন্ন মৎস্য, পতঙ্গ, পক্ষী ও অন্যান্য জীবের বর্ণনা আছে। এতদ্ভিন্ন 'কিমিয়া বিদ্যাসার' নামক রসায়নবিদ্যা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ শ্রীরামপুর হইতে প্রচারিত হয়। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই পুস্তকের সবিস্তার সমালোচনা করিয়াছেন। ১৮১৮ খৃঃ অঃ শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ 'সমাচার-দর্পণ' নামে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন, এবং তাঁহারাই আবার 'দিগ্‌দর্শন' নামক নানাতত্ত্ববিষয়িনী পত্রিকা পরিচালিত করিতেন। এই পত্রিকাতেই বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চ্চার প্রথম সূত্রপাত হয়।

ইহার পর ১৮২৮ খৃঃ অঃ 'বিজ্ঞান অনুবাদ সমিতি' * নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। প্রফেসার উইল্‌সন্‌ এই সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন ও উক্ত সমিতির চেষ্টায় 'বিজ্ঞান-সেবধি' নামক গ্রন্থের ১৫ খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইহার পর ১৮৫১ খৃঃ অঃ 'বাঙ্গালা সাহিত্য-সমিতি' † নামে আর এক সমিতি স্থাপিত হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও যাহাতে বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে জ্ঞানালোক প্রবেশ করিতে পারে তদ্বিষয়ে ইহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। মাহাত্মা বেথুন ও বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই সভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এতদ্ভিন্ন গবর্মেণ্ট মাসিক ১৫০৲ চাঁদা দিয়া ইহার আনুকূল্য করিতেন। এই সভার উদ্যোগেই ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রকাশ করেন। মহামতি হডসন প্র্যাট্‌ এই সমিতির স্থাপয়িতাদিগের মধ্যে অন্যতম উদ্যোগী সভ্য ছিলেন। তিনি উক্ত সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার স্থূল মর্ম্ম এই :—

"বাঙ্গালার অধিবাসীদিগকে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দিয়া পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানাদিতে ব্যুৎপন্ন করার আশা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং জাতীয় ভাষায় ইহাদিগের শিক্ষার পথ প্রসরতর করা কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। * * ইহাদের নিমিত্ত সরল সুখপাঠ্য গ্রন্থ প্রচার করিয়া পাঠ-লিপ্সার সৃষ্টি করিতে হইবে। জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্ত তৃষ্ণা বৃদ্ধি করিতে হইবে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে অল্প মূল্যের গ্রন্থ প্রচার করিতে হইবে।

* Society for translating European Sciences.

† Vernacular Literary Society.

সেই সকল গ্রন্থে বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও মানবশরীরতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় সহজ ও চিত্তাকর্ষী প্রবন্ধ থাকিবে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-সম্বন্ধেও প্রবন্ধাদি লিখিয়া প্রচার করিতে হইবে। * * * * এই সকল প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত সহজ ও সরল সাহিত্য-প্রচার অতি আবশ্যক। এই সমিতিকে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে।" *

বিজ্ঞান প্রচার-সম্বন্ধে এই সমিতির আশা তাদৃশী ফলবতী হয় নাই। সতেরখানি পুস্তক প্রকাশের পর সমিতি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, গল্প ও আমোদজনক পুস্তকই এদেশের পাঠক-সাধারণের অধিকতর প্রিয়। এতদ্‌ব্যতীত অপর শ্রেণীর পুস্তক আদৌ আদরে গৃহীত হয় না।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে, কলিকাতা, হুগলী ও ঢাকা—এই তিন স্থানে তিনটি নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ব্যবহারার্থ পদার্থবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, জ্যামিতি, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক প্রণীত হয়। ইহা ভিন্ন ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষার উপযোগী পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা-বিষয়ক অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। মেডিক্যাল স্কুলসমূহের পাঠ্য অস্থিবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা-ঘটিত অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থও বাঙ্গালা ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ প্রচারেও যে বাঙ্গালা ভাষার অনেকটা উন্নতি হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এখন আলোচনার বিষয় এই যে, অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসকল প্রচারিত হইতেছে,

* বিশ্বকোষ।

কিন্তু ইহাতে বিশেষ কিছু ফললাভ হইয়াছে কি না। বিজ্ঞান-বিষয়ক যে সকল পুস্তকের কিছু কাটতি আছে তাহা 'পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচন কমিটি'র * নির্ব্বাচিত তালিকাভুক্ত, সুতরাং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সোপান-স্বরূপ। একাদশ বা দ্বাদশ বর্ষীয় বালক-দিগের গলাধঃকরণের জন্য যে সকল বিজ্ঞানপাঠ প্রচারিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের ইষ্ট কি অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহা সঠিক বলা যায় না। আসল কথা এই, আমাদের দেশ হইতে প্রকৃত জ্ঞানস্পৃহা চলিয়া গিয়াছে। জ্ঞানের প্রতি একটা আন্তরিক টান না থাকিলে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২।৩টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় বিশেষ ফললাভ হয় না। এই জ্ঞান-স্পৃহার অভাবেই, যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত বিদ্যালয়সমূহে বহুকাল হইতে বিজ্ঞান-অধ্যাপন ব্যবস্থা হইয়াছে, তথাপি বিজ্ঞানের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ-সম্পন্ন ব্যুৎপন্ন ছাত্র আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না; কেননা ঘোড়াকে জলাশয়ের নিকট আনিলে কি হইবে?—উহার যে তৃষ্ণা নাই। পরীক্ষাপাসই যেখানকার ছাত্রজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানকার যুবকগণের দ্বারা অধীত বৈজ্ঞানিক বিদ্যার শাখা-প্রশাখাদির উন্নতি হইবে এরূপ প্রত্যাশা করা নিতান্তই বৃথা। সেই সকল মৃতকল্প, স্বাস্থ্যবিহীন যুবকগণের যত্নে জাতীয় ভাষার উন্নতি-বিধান কিংবা যে কোনও প্রকার দুরূহ ও অধ্যবসায়-মূলক কার্য্যের সাফল্য সম্পাদনের আশা নিতান্তই সুদূরপরাহত। বস্তুতঃ পরীক্ষা পাস করিবার নিমিত্ত এরূপ হাস্যোদ্দীপক উন্মত্ততা পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। পাস করিয়া সরস্বতীর নিকট চিরবিদায়গ্রহণ,—শিক্ষিতের এরূপ জঘন্য প্রবৃত্তি

* Text-Book Committee.

আর কোন দেশেই নাই। আমরা এদেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া জ্ঞানী ও গুণী হইয়াছি বলিয়া আত্মাদরে স্ফীত হই, অপরাপর দেশে সেই সময়েই প্রকৃত জ্ঞানচর্চ্চার কাল আরম্ভ হয়। কারণ, সে সকল দেশের লোকের জ্ঞানের প্রতি যথার্থ অনুরাগ আছে, তাঁহারা একথা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার হইতে বাহির হইয়াই জ্ঞান-সমুদ্র-মন্থনের প্রশস্ত সময়। আমরা দ্বারকেই গৃহ বলিয়া মনে করিয়াছি, সুতরাং জ্ঞানমন্দিরের দ্বারেই অবস্থান করি, অভ্যন্তরস্থ রত্নরাজি দৃষ্টিগোচর না করিয়াই ক্ষুণ্নমনে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পঞ্জিকা পরীক্ষোত্তীর্ণগণের নামে পরিপূর্ণ দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। এক বৎসর হয়ত উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় দশজন প্রথম শ্রেণীতে এম্. এ. পাস হইলেন। কিন্তু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এখানেই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল; সে সমুদয় যুবকগণকে ২।১ বৎসর পর আর বিদ্যামন্দিরের প্রাঙ্গণেও দেখিতে পাওয়া যায় না। পিপাসাশূন্য জ্ঞানালোচনার এইত পরিণাম! জাপানের জ্ঞানতৃষ্ণা আর আমাদের যুবকগণের তৃষ্ণা দুই তুলনা করিলে অবাক্ হইতে হয়। সম্প্রতি সঞ্জীবনীতে কোন বাঙ্গালী যুবক জাপানে পদার্পণ করিয়াই যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল :—

"জাপানীদের জ্ঞানতৃষ্ণা যেরূপ, অন্য কোন জাতির সেরূপ আছে কিনা সন্দেহ। কি ছোট, কি বড়, কি ধনী, কি নির্ধন, কি বিদ্বান্, কি মূর্খ, সকলেই নূতন বিষয় জানিতে এতদূর আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে যে, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। জাহাজ হইতে জাপানে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে যে আভাস পাইয়াছিলাম তাহাতেই মনে করিয়াছিলাম এরূপ জাতির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। * *

চাকরাণীগুলি পর্য্যন্ত বাহিরের বিষয় সম্বন্ধে যতটা খোঁজ রাখে আমাদের দেশের অধিকাংশ ভদ্রমহিলাই তাহা জানেন না।"

এখন একবার ফ্রান্সের দিকে তাকাইয়া দেখা যাউক। ফরাসী বিপ্লবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই জ্ঞানপিপাসা কি প্রকার বলবতী হইয়াছিল তাহা বাকল (Buckle) সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। যখন লাবোয়াসিয়ে, লালাণ্ড, বাঁফো প্রভৃতি মনীষিগণ প্রকৃতির নবতত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিয়া সরল ও সরস ভাষায় জনসাধারণের নিকট প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন ফরাসী সমাজে ধনীর রম্য হর্ম্ম্যে ও দরিদ্রের পর্ণকুটীরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে বিজ্ঞান সমিতিতে যে সকল বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচিত হইত তাহা শুনিবার জন্য দুই চারিজন বিশেষজ্ঞ মাত্র উপস্থিত হইতেন। কিন্তু এই নূতন বারতা শুনিবার জন্য সকল শ্রেণীর লোক ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। যে সকল সম্ভ্রান্ত মহিলা ইতর লোকের সংস্পর্শে আসিলে নিজকে অপবিত্র জ্ঞান করিতেন তাঁহারাই পদমর্য্যাদা ভুলিয়া লেক্চার শুনিবার জন্য নগণ্য লোকের সহিত ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া বসিবার একটু স্থান পাইলেই চরিতার্থ হইতেন।

সম্প্রতি এক ধূয়া উঠিয়াছে যে বহু অর্থব্যয়ে যন্ত্রাগার (Laboratory) প্রস্তুত না হইলে বিজ্ঞান শিক্ষা হয় না। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের গ্রামে ও নগরে, উদ্যানে ও বনে, প্রান্তরে ও ভগ্নস্তূপে, নদী ও সরোবরে, তরুকোটরে ও গিরিগহ্বরে, অনন্ত পরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে জ্ঞানপিপাসুর যে, কত প্রকার অনুসন্ধেয় বিষয় ছড়াইয়া রহিয়াছে তাহা কে নির্ণয় করিবে? বাংলার দয়েল, বাংলার পাপিয়া, বাংলার ছাতারের জীবনের কথা কে লিখিবে? বাংলার মশা, বাংলার সাপ, বাংলার মাছ, বাংলার

কুকুর, ইহাদের সম্বন্ধে কি আমাদের জানিবার কিছুই বাকী নাই? এদেশের সোদাল, বেল, বাব্‌লা ও শেওড়ার কাহিনী শুধু কি ইউরোপীয় লেখকদিগের কেতাব পড়িয়াই আমাদিগকে শিখিতে হইবে? এদেশের ভিন্ন ভিন্ন কৃষিপ্রণালী, প্রাচীন ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়াপদ্ধতি এসবের ভিতরে কি আমাদের জ্ঞাতব্য কিছুই থাকিতে পারে না?

রসায়ন, পদার্থবিদ্যাদি শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন, প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা এবং ভূতত্ত্ববিদ্যার মৌলিক গবেষণা যে বিরাট্ যন্ত্রাগারের অভাবে কতক দূর চলিতে পারে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

ছুরি, কাঁচি, অণুবীক্ষণ ইত্যাদি সরঞ্জাম কিনিতে ১০০৲ টাকার অধিক মূল্য লাগে না; কিন্তু গোড়াতেই গলদ, জ্ঞানের পুণ্য-পিপাসা কোথায়? এদেশের প্রকৃতি-বিদ্যার্থী যুবক দেখিয়াছেন, এখন একবার ইউরোপের প্রকৃতি-বিদ্যার্থী যুবকের কথা শুনুন। বিদ্যাবিষয়ক উপকরণ আহরণের জন্য জ্ঞানপিপাসু ইউরোপীয় যুবক আফ্রিকার নিবিড় শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে প্রাণ হাতে করিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের অনুসন্ধানের নিমিত্ত আহার-নিদ্রা ভুলিয়া কার্য্য করিতে থাকেন। ভোগলালসা তখন তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানপিপাসা তাঁহাদের হৃদয়ের একমাত্র আসক্তি। আপনারা অনেকেই জানেন, উদ্ভিদ্‌নিচয় আহরণের জন্য সার জোসেফ্ হুকার ১৮৪৫ খৃঃ অঃ কত বিপদ্ আলিঙ্গন করিয়া হিমালয় পর্ব্বতের বহু উচ্চদেশ পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে দার্জ্জিলিং-হিমালয় রেলপথ হয় নাই। কাজেই তখন হিমাচলারোহণ এখনকার

মত সুগম ছিল না। তুষারমণ্ডিত মেরুপ্রদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা জানিবার জন্য কত অর্থব্যয়ে কতবার অভিযান প্রেরণ করা হইয়াছে; কত বৈজ্ঞানিক তাহাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য দেশের কি অদম্য উৎসাহ! কি অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসা! যখন ন্যান্‌সেন (Nansen) ফিরিয়া আসিলেন সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকা তাঁহার ভ্রমণকাহিনী শুনিবার জন্য ব্যাকুল।

ফল কথা এই যে, আমরা যত দিন স্বাধীনভাবে নূতন নূতন গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া মাতৃভাষায় সেই সকল তত্ত্ব প্রচার করিতে সক্ষম না হইব ততদিন আমাদের ভাষার এই দারিদ্র ঘুচিবে না। প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতি একপ্রকার মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। যেমন ধনীর সন্তান পৈতৃক বিষয়-বিভব হারাইয়া নিঃস্ব ভাবে কালাতিপাত করেন অথচ পূর্ব্ব-পুরুষগণের ঐশ্বর্য্যের দোহাই দিয়া গর্ব্বে স্ফীত হন, আমাদেরও দশা সেইরূপ। লেকি বলেন যে, খৃঃ অঃ দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ইউরোপখণ্ডে স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রথম প্রবাহিত হয়; প্রায় সেই সময় হইতেই ভারতগগন তিমিরাচ্ছন্ন হইল। অধ্যাপক বেবর (Weber) যথার্থই বলিয়াছেন ভাস্করাচার্য্য ভারত-গগনের শেষ নক্ষত্র। সত্য বটে আমরা নব্য-স্মৃতি ও নব্য-ন্যায়ের দোহাই দিয়া বাঙ্গালী-মস্তিষ্কের প্রখরতার শ্লাঘা করিয়া থাকি; কিন্তু ইহা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে সময়ে রঘুনাথ, গদাধর ও জগদীশ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ বিবিধ জটিল টীকা-টিপ্পনি রচনা করিয়া টোলের ছাত্রদিগের আতঙ্ক উৎপাদন করিতেছিলেন, যে সময়ে এখানকার জ্যোতির্ব্বিদ্‌বৃন্দ প্রাতে দুই দণ্ড দশ পল গতে

নৈর্ঋত কোণে বায়স কা কা রব করিলে সে দিন কি প্রকার যাইবে ইত্যাদি বিষয় নির্ণয় পূর্ব্বক কাকচরিত্র রচনা করিতেছিলেন, যে সময় এদেশের অধ্যাপকবৃন্দ "তাল, পড়িয়া ঢিপ করে, কি ঢিপ করিয়া পড়ে" ইত্যাকার তর্কের মীমাংসায় সভাস্থলে ভীতি উৎপাদন করিয়া সমবেত জনগণের অন্তরে শান্তি-ভঙ্গের আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইউরোপখণ্ডে গ্যালিলিও, কেপ্লার, নিউটন প্রভৃতি মনস্বিগণ উদীয়মান হইয়া প্রকৃতির নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক জ্ঞানজগতে যুগান্তর উপস্থিত করিতেছিলেন ও মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছিলেন। তাই বলি, আজ সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতি নিস্পন্দ ও অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যাহা হউক বিধাতার কৃপায় হাওয়া ফিরিয়াছে; মরা গাঙে সত্য সত্যই বান ডাকিয়াছে; আজ বাঙ্গালী জাতি ও সমগ্র ভারত নূতন উৎসাহে, নূতন উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত। যে দিন রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সম্মিলনই ভবিষ্য ভারতের সমৃদ্ধিসোপান বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, সেই দিনই বুঝি বিধাতা ভারতের প্রতি পুনরায় শুভ দৃষ্টিপাত করিলেন। জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল জাতি পুরাতন আচার, ব্যবহার, জ্ঞান ও শিক্ষা বিষয়ে নিতান্তই গোঁড়া, যাঁহারা প্রাচীন শিক্ষার ও প্রাচীন প্রথার নামে আত্মহারা হন, যাঁহারা বর্ত্তমান জগতের জীবন্তভাব জাতীয় জীবনে সংবেশিত করা হঠকারিতা বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বর্ত্তমান কালের ইতিহাসে নগণ্য ও মৃতপ্রায়; এমন কি এই সমস্ত জাতি নূতনের প্রবল সংঘর্ষণে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এ বিষয়ে

কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই যে, বর্ত্তমান ইউরোপের শিক্ষা অত্যল্পকাল হইল আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু আমরা ইহা যেন না ভুলি যে বর্ত্তমান অবস্থায় ইউরোপ আমাদিগকে যোজনাধিক পশ্চাতে ফেলিয়া বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পূর্ণোন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। আমার স্বতঃই মনে হয় আমাদের এই অধোগতির কারণ পুরাতনের প্রতি এক অস্বাভাবিক ও অনেক সময়ে অহেতুক আসক্তি ও অপরাপর জাতির গুণাবলীর প্রতি বিদ্বেষ ও অগ্রাহ্যের ভাব। এ স্থানে অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের আচার-পদ্ধতি ও শিক্ষা অনেক সময়ে বর্ত্তমান সভ্যজাতিগণের আচার-পদ্ধতি হইতেও শ্রেষ্ঠ ছিল এবং সে সমুদয়ের প্রতি ভক্তিবিহীন হওয়া মূঢ়তার লক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে যেমন বাহ্য জগতে তেমনই মানসিক রাজ্যে অনেক বিষয়ের আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। এ স্থানে প্রশ্নটি একটু বিশদভাবে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আমি শঙ্কিত হইতেছি পাছে কাহারও মনে অপ্রীতি-সঞ্চার করিয়া ফেলি, কিন্তু যদি স্বাধীন চিন্তা মানব মাত্রেরই পৈতৃক সম্পত্তি হয় তাহা হইলে আমাকে বলিতেই হইবে যে পরকীয় শিক্ষা ও জ্ঞানের গ্রহণেচ্ছা আমাদের আদৌ নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে অন্ততঃ বিজ্ঞান বিষয়ে বর্ত্তমান ইউরোপ ও আমেরিকা আমাদের অনুকরণীয় হইত। এই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য শিক্ষার সংমিশ্রণের উপরেই আমার মতে এই ভারতের সমৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে। যে জাপান ত্রিংশ বর্ষ পূর্ব্বে ঘোর তমসাচ্ছন্ন ছিল, জগতে যাহার অস্তিত্ব (ঐতিহাসিক হিসাবে) সন্দেহের বিষয় ছিল, সেই জাপান পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা জাতীয় শিক্ষার সহিত সংযোজন করিয়া আজ

কি এক অভিনব ক্ষমতাশালী জাতি হইয়া আসিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তে বিরাজ করিতেছে।

এখন জ্ঞানজগতে যেমন তুমুল সংগ্রাম পার্থিব জগতেও ততোধিক। নূতনের দ্বারা পুরাতনের সংস্কার করিতেই হইবে; নচেৎ ভয় হয় ভারতভাগ্যরবি প্রভাতাকাশে উঠিয়াই অস্তমিত হইবে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

ক্ষমার আদর্শ

চন্দ্র ধীর গতিতে মেঘের কোলের ভিতর দিয়া বহিয়া যাইতে-ছিল। নীচে নদী কুল কুল শব্দে বায়ুর সঙ্গে সুর মিশাইয়া নাচিতে নাচিতে বহিয়া যাইতেছিল। আধ জোছনা আধ অন্ধকারে মিশিয়া পৃথিবীর সৌন্দর্য্য অপূর্ব্ব: দেখাইতেছিল। চারিদিকে ঋষির আশ্রম। এক একটী আশ্রম নন্দন বনকে ধিক্কার প্রদান করিতেছিল। এক একখানি ঋষির কুটির তরু, পুষ্প ও বৃক্ষলতা শোভিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। একদিন এইরূপ জ্যোৎস্নাপুলকিত রাত্রে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব সহধর্ম্মিণী অরুন্ধতী দেবীকে বলিতেছিলেন, "দেবি, ঋষি বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে একটু লবণ ভিক্ষা করিয়া আন।" এই প্রশ্নে অরুন্ধতী দেবী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, এ কি আজ্ঞা করিতেছেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যে আমায় শত পুত্র হইতে বঞ্চিত করিয়াছে—" এই কথা বলিতে বলিতে দেবীর সুর অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, সমস্ত পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, সে অপূর্ব্ব শান্তির আলয় গভীর হৃদয় ব্যথিত হইল, তিনি বলিতে লাগিলেন— "আমার শত পুত্র এই জোছনা-শোভিত রাত্রে বেদ গান করিয়া বেড়াইত, শত পুত্রই আমার বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, আমার এইরূপ শত পুত্রই সে বিনষ্ট করিয়াছে; তাহার আশ্রম হইতে লবণ ভিক্ষা করিয়া আনিতে বলিতেছেন? আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছি।"

ধীরে ধীরে ঋষির মুখ জ্যোতিপূর্ণ হইয়া উঠিল, ধীরে ধীরে সাগরোপম হৃদয় হইতে এই কয়টী বাক্য নিঃসৃত হইল,—"দেবি, আমি তাহাকে যে ভালবাসি।" অরুন্ধতীর বিস্ময় আরও বর্দ্ধিত হইল, তিনি বলিলেন, "আপনি যদি তাহাকে ভালবাসেন ত তাহাকে 'ব্রহ্মর্ষি' বলিয়া সম্বোধন করিলেই ত জঞ্জাল মিটিয়া যাইত, আমাকেও শত পুত্র হইতে বঞ্চিত হইতে হইত না।" ঋষির মুখ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল, তিনি বলিলেন, "তাহাকে ভালবাসি বলিয়াই ত তাহাকে ব্রহ্মর্ষি বলি নাই, আমি তাহাকে ব্রহ্মর্ষি বলি নাই বলিয়াই তাহার ব্রহ্মর্ষি হইবার আশা আছে।"

আজ বিশ্বামিত্র ক্রোধে জ্ঞানশূন্য। আজ আর তাঁহার তপস্যায় মনোনিবেশ হইতেছে না। তিনি সঙ্কল্প করিয়াছেন আজ যদি বশিষ্ঠ তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষি না বলেন তাহা হইলে তাঁহার প্রাণসংহার করিবেন। সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি তরবারি হস্তে কুটির হইতে বহির্গত হইলেন। ধীরে ধীরে বশিষ্ঠদেবের কুটির-পর্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বশিষ্ঠদেবের সমস্ত কথা শুনিলেন। মুষ্টিবদ্ধ তরবারি হস্তে শিথিল হইয়া পড়িল। ভাবিলেন, "কি করিয়াছি, না জানিয়া কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, না জানিয়া কাহার নির্ব্বিকার চিত্তে ব্যথা দিতে চেষ্টা করিয়াছি।" হৃদয়ে শত বৃশ্চিক-দংশন-যন্ত্রণা অনুভূত হইল। অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। দৌড়িয়া গিয়া বশিষ্ঠের পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। কিছুক্ষণ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, ক্ষণপরে বলিলেন,—"ক্ষমা করুন, কিন্তু আমি ক্ষমাভিক্ষারও অযোগ্য।" গর্ব্বিত হৃদয় অন্য কিছু বলিতে পারিল না। কিন্তু বশিষ্ঠ কি করিলেন? বশিষ্ঠ দুই হাত দিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বলিলেন, "উঠ,

ব্রহ্মর্ষি উঠ।" দ্বিগুণ লজ্জায় বিশ্বামিত্র বলিলেন, "প্রভু, কেন লজ্জা দেন।" বশিষ্ঠদেব উত্তর করিলেন, "আমি কখনও মিথ্যা বলি না—আজ তুমি ব্রহ্মর্ষি হইয়াছ, আজ তুমি অভিমান ত্যাগ করিয়াছ। আজ তুমি ব্রহ্মর্ষি-পদ লাভ করিয়াছ।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "আমাকে আপনি ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিন।" বশিষ্ঠ উত্তর করিলেন, "অনন্তদেবের নিকট যাও, তিনিই তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিবেন।"

অনন্তদেব যেখানে পৃথিবী মস্তকে ধরিয়া আছেন বিশ্বামিত্র সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তদেব বলিলেন, "আমি তোমায় ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিতে পারি যদি তুমি এই পৃথিবী মস্তকে ধারণ করিতে পার।" তপোবলে গর্ব্বিত বিশ্বামিত্র বলিলেন, "আপনি পৃথিবী ত্যাগ করুন আমি মস্তকে ধারণ করিতেছি।" অনন্তদেব বলিলেন, "ধারণ কর, আমি ত্যাগ করিলাম।" শূন্যে পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িতে লাগিল।

বিশ্বামিত্র ডাকিয়া বলিতেছেন, "আমি সমস্ত তপস্যার ফল অর্পণ করিতেছি পৃথিবী ধৃত হউক—।" তথাপি পৃথিবী স্থির হইল না। উচ্চৈঃস্বরে অনন্তদেব বলিলেন, "বিশ্বামিত্র, এত তপস্যা কর নাই যে পৃথিবী ধারণ করিবে, কখনও কি সাধুসঙ্গ করিয়াছ? তাহার ফল অর্পণ কর।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "এক মুহূর্ত্ত বশিষ্ঠের সঙ্গ করিয়াছি।" অনন্তদেব বলিলেন, "তবে সেই ফল অর্পণ কর।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "আমি সেই ফল অর্পণ করিতেছি।" ধীরে ধীরে পৃথিবী স্থির হইল। তখন বিশ্বামিত্র বলিলেন, "এখন আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিন।" অনন্তদেব বলিলেন, "মূর্খ বিশ্বামিত্র, যাঁর এক মুহূর্ত্ত সঙ্গফলে পৃথিবী ধৃত হইল তাঁহাকে

ছাড়িয়া আমার নিকট ব্রহ্মজ্ঞান চাহিতেছ?" বিশ্বামিত্রের ক্রোধ হইল, ভাবিলেন, বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে তবে প্রতারণা করিয়াছেন। দ্রুত তাঁহার নিকট গমন করিয়া বলিলেন, "আপনি আমায় কেন প্রতারণা করিলেন?" বশিষ্ঠদেব অতি ধীর-গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "আমি যদি তখন তোমায় ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিতাম, তোমার তাহাতে বিশ্বাস হইত না, এখন তোমার বিশ্বাস হইবে।" বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা করিলেন। ভারতে এমন ঋষি ছিলেন, এমন সাধু ছিলেন, এমন ক্ষমার আদর্শ ছিল। এমন তপস্থার বল ছিল যাহার দ্বারা পৃথিবী ধারণ করা যায়। ভারতে আবার সেইরূপ ঋষি জন্মগ্রহণ করিতেছেন যাঁহাদের প্রভায় পূর্ব্বতন ঋষিদিগের জ্যোতি হীনপ্রভ হইয়া যাইবে, যাঁহারা আবার ভারতকে পূর্ব্বগৌরব হইতে অধিকতর গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রত্নাকরের রামনাম উচ্চারণে অধিকার ছিল না। অগত্যা মরা মরা বলিয়া তাঁহাকে উদ্ধার লাভ করিতে হইয়াছিল।

এই পুরাতন পৌরাণিক নজীরের দোহাই দিয়া আমাদিগকেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নতুবা ঐ নামগ্রহণ করিতে আমাদের কোনরূপ অধিকার আছে কি না, এ বিষয়ে ঘোর সংশয়, আরম্ভেই উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। বস্তুতই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা যে, তাঁহার নামগ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্দ্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বাঙ্গালী জাতির প্রাচীন ইতিহাস কেমন ছিল, ঠিক স্পষ্ট জানিবার উপায় নাই। লক্ষ্মণসেনঘটিত প্রাচীন কিংবদন্তীটা অনৈতিহাসিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে।, কিন্তু পলাশির লড়াইএর কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর চরিত্র ইতিহাসে যে স্থান লাভ করিয়া আসিয়াছে, বিদ্যাসাগরের চরিত্র তাহা অপেক্ষায় এত উচ্চে অবস্থিত যে, তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতেই অনেক সময়ে কুণ্ঠিত হইতে হয়। বাগ্‌যত কর্ম্মনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও আমাদের মত বাক্‌সর্ব্বস্ব সাধারণ বাঙ্গালী, উভয়ের মধ্যে এত ব্যবধান যে, স্বজাতীয় পরিচয়ে তাঁহার গুণকীর্ত্তন-দ্বারা প্রকারান্তরে আত্মগৌরব খ্যাপন করিতে গেলে, বোধ হয়, আমাদের পাপের মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইতে পারে। আমাদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে

সহৃদয়তার এত অভাব ও মৌখিকতার এত প্রভাব যে, অদ্য যে আমরা তাঁহার স্মৃতির উপাসনার জন্য একত্র হইয়াছি, এই উপাসনা ব্যাপারটাই একটা ভণ্ডামি নহে, তাহা প্রমাণ করা দুষ্কর। আমরা তাঁহার তর্পণোদ্দেশে যে বক্তৃতাময় বারির অঞ্জলি প্রদান করিতে উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহার প্রেতপুরুষ যদি অবজ্ঞার সহিত তাহা গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন, তাহা হইলে আমাদের পক্ষসমর্থনে বলিবার কথা কি আছে, সহজে খুঁজিয়া পাই না।

বিদ্যাসাগরের উপাসনায় এই অধিকার অনধিকারের কথা আসে বলিয়া প্রথমেই আমাকে রত্নাকরের নজীর আশ্রয় করিতে হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের উপাসনায় আমাদের অধিকার না থাকিতে পারে, এবং বিদ্যাসাগরের জীবনের ও বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হওয়াও হয় ত অসম্ভব; তথাপি এই সাংবৎসরিক উপাসনা বর্ষে বর্ষে অনুষ্ঠিত হইয়া আমাদের জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ক ক্রমশঃ ধৌত করিবে, এই আমাদের একমাত্র ভরসা। পূজিতের প্রীতি-উৎপাদন, বোধ হয়, আমাদের শাস্ত্রবিহিত শ্রাদ্ধতর্পনাদি ব্যাপারের উদ্দেশ্য নহে; পূজক আত্মোন্নতি বিধানের জন্য ঐ সকল অনুষ্ঠানসাধনে বাধ্য। বিদ্যাসাগরের প্রেতপুরুষের প্রীতিজনন আমাদের অসাধ্য হইলেও আমরা স্বার্থের অনুরোধে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি।

কিন্তু প্রথমেই বিদ্যাসাগরকে আমাদের বলিয়া পরিচয় দিব কি না, সেই ঘোর সমস্যা আসিয়া দাঁড়ায়। সেই প্রকাণ্ড মানবত্বাকে সঙ্কীর্ণ বাঙ্গালীত্বের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে যাওয়া নিতান্ত ধৃষ্টতা বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশাতে তাঁহার স্বজাতি তাঁহার নিকট আপনার যে মূর্ত্তি

দেখাইয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনকাহিনীপাঠে কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহার আত্মীয়বন্ধুগণের সম্পর্কে আসিয়া তাঁহাকে পদে পদে লজ্জিত ও প্রতারিত হইতে হইয়াছে, ইহার ভূরি উদাহরণ তাঁহার জীবনের আখ্যায়িকামধ্যে সঙ্কলিত আছে। যদি কোন বৈদেশিক আমাদের জাতীয় চরিত্রের ছবি আঁকিতে প্রয়াসী হয়েন, তাঁহাকে মসীবর্ণ সংগ্রহ করিবার জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত-লেখকগণ প্রচুর পরিমাণে ঐ সকল সামগ্রী একাধারে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন।

অণুবীক্ষণ নামে এক রকম যন্ত্র আছে, যাহাতে ছোট জিনিষকে বড় করিয়া দেখায়; বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থবিদ্যাশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, ঐ উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত কোন যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্ম্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতিমাত্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন; এবং এই যে বাঙ্গালীত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি, তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। এই চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্ত্তি ধবল পর্ব্বতের ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে; কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনর্থক আত্মগ্লানির অবতারণা আমার অভিপ্রেত নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে আপনার বলিয়া তাঁহার

সমীপস্থ হইতে তুলনায় আত্মগ্লানি আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। বাস্তবিকই বিদ্যাসাগরের উন্নত সুদৃঢ় চরিত্রে যাহা মেরুদণ্ড, সাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রে তাহার একান্তই অসদ্ভাব। প্রাণিতত্ত্ব-বিদেরা মেরুদণ্ড দেখিয়া সমগ্র প্রাণিসমষ্টিকে উন্নত ও অনুন্নত দুই প্রধান পর্য্যায়ে ভাগ করেন। মেরুদণ্ডের অস্তিত্ব প্রাণীর পক্ষে সামর্থ্যের ও আত্মনির্ভরশক্তির প্রধান পরিচয়। বিদ্যাসাগর যে সামর্থ্য ও আত্মনির্ভরশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সাধারণ বাঙ্গালী-চরিত্রে তাহার তুলনা মিলে না।

একটা কথা আজকাল অহরহঃ শুনিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান রাজকীয় শাসনে চারিদিকে আমাদের জাতীয় অভ্যুদয়ের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে যখন হিন্দু রাজা হিন্দুরাজ্যে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন তখন আমাদের জাতীয় অবস্থা সমধিক উন্নত ছিল, অনেকে এ কথা অস্বীকার করেন না; অন্ততঃ হিন্দুজাতির পুরাবৃত্তের অভাবে এ কথা লইয়া তর্ক-বিতর্ক যতক্ষণ ইচ্ছা চালান যাইতে পারে। কিন্তু গত কয় শত বৎসরে আমাদের দুর্দ্দশার যে একশেষ ঘটিয়াছিল, এবং বর্ত্তমানকালে আমাদের সামাজিক জীবন সঙ্কটাপন্ন মুমূর্ষু অবস্থা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহা একরকম সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য। এই নবজীবনসঞ্চারের কয়েকটা বড় বড় লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। একটা প্রধান লক্ষণ, আমাদের জাতীয় রুচির পরিবর্ত্তন ও জাতীয় সাহিত্যের বিকাশ। বেহুলার নাচ দেখিয়া স্বর্গের দেবগণ যতদূর তৃপ্তিলাভ করিতেন, আমরা মর্ত্তদেহ ধরিয়াও কোনরূপেই ততটা পারি না। এখন বঙ্কিমচন্দ্র অথবা রবীন্দ্রনাথের হাতে মানবজীবনের উৎকট সমস্যাগুলার আলোচনা কবিতাকারে দেখিতে চাই। দ্বিতীয় একটা লক্ষণ,

আমাদের মধ্যে রাষ্ট্রিক আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপন এবং তৎসহকারে স্বায়ত্তশাসন লাভের প্রয়াস।

কিন্তু এই সুস্পষ্ট লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিতেও আমরা উন্নতির সোপানে উঠিতেছি, এই বাক্য নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। এক শত বা দেড় শত বৎসরের মধ্যে কলির প্রকোপ সহসা এতদূর বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে যে, বাঙ্গালীর পরমায়ুঃ একেবারেই পঁচানব্বই হইতে পঁয়ত্রিশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং ধর্ম্মের চারি পায়ের মধ্যে তিনটী একেবারে চিরদিনের মত খঞ্জ হইয়া গিয়াছে, অবশ্য এরূপ বিশ্বাস করিতে আমি বাধ্য নহি। কিন্তু আবার আমাদের সামাজিক গগনের পূর্ব্বাকাশে তরুণ সূর্য্যের উদয় হইয়াছে, এবং অরুণ সারথি হস্তধৃত হরিদশ্বগণের রশ্মিগুচ্ছ আর যে ঘুরাইয়া দিবেন না, ইহার স্বীকারেও আমার সাহস হয় না। বঙ্গ-সাহিত্যের অভ্যুদয়সম্বন্ধে কোন কথা এখানে বলিতে চাহি না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা বঙ্কিমের প্রতিভার উজ্জ্বল আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়াছি; কিন্তু আশা করি, নবীনচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের তুলিকা অক্ষয় হইয়া আমাদের চিত্তবিনোদনে ও সন্তাপহরণে নিযুক্ত থাকিবে। * কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রিক অবস্থাসম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। শ্রোতৃবর্গ অনুগ্রহ করিয়া মার্জ্জনা করিবেন।

বস্তুতই শতাধিক বর্ষব্যাপী সুশাসনে আমরা নিতান্ত আদুরে ছেলে হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের পরিণামও বোধ করি আদুরে ছেলের পরিণামের অপেক্ষা অধিকতর আশাপ্রদ নহে। পালঙ্কের উপর সুখশয্যাশায়ী শিশুকে যখন আরামের সহিত তুলিযোগে চুমুকে চুমুকে দুগ্ধপান করিতে দেখা যায়, তখন বয়স্ক লোকের

* এই প্রবন্ধ যখন পঠিত হয়, তখন নবীনচন্দ্র জীবিত ছিলেন।

মুখ হইতে "আহা মরি শিশুকাল" ইতি কবিতাবাণী সনিঃশ্বাসে নির্গত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে এই শিশুকেই আবার কিছুদিনমধ্যে সেই বয়স্কের স্থান গ্রহণ করিয়া জীবনদ্বন্দ্বে নিযুক্ত হইতে হয়। আমাদের স্নেহময়ী গবর্ণমেণ্টজননীর অনুগ্রহের মাত্রা ও আমাদের আবদারের মাত্রা এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, আর আমরা সেই আরামের পালঙ্ক ও তূলির দুধ সহজে ছাড়িতে চাহিতেছি না এবং আমাদের স্বচ্ছন্দতার অণুমাত্র ত্রুটি ঘটিলেই, শৈশবসুলভ সানুনাসিক কণ্ঠধ্বনি বাহির করিয়া জননীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে প্রয়াসী হইতেছি। বাস্তবিকই আমাদের মত সর্ব্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষী কোন জাতির উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা ইতিহাসে লেখে না।

আমাদের মেরুদণ্ডের সনাতন কোমলতা হইতেই এই অবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে; আবার সেই অবস্থা হইতেই মেরুদণ্ডের কোমলতা বাড়িয়া যাইতেছে। আমরা কথায় কথায় আমাদের চরিত্রসংশোধনের প্রস্তাব করি, এবং এই চরিত্রসংশোধন না হইলে জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা নাই, এই মর্ম্মে মহতী ঘটা করিয়া বক্তৃতা করি। চরিত্রসংশোধন না হইলে যে উন্নতি ঘটিবে না, ইহা সত্য কথা; কিন্তু চরিত্রসংশোধন ব্যাপারটাই কি এত সহজ জিনিষ? যেন ইচ্ছা করিলেই চরিত্রটা আপনা-আপনি শোধিত হইয়া যাইবে। কিঞ্চিলিকা যেন ইচ্ছামাত্রেই আপনাকে কুম্ভীরে পরিণত করিবে! ডারুইন-বাদীরা বলেন, কুম্ভীরেরও পূর্ব্বপুরুষ এককালে কেঁচোর মত ছিল। কিন্তু সেই কুম্ভীরত্বে পরিণতির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাকে কত যুগ-ব্যাপী জীবনদ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছে! ইচ্ছামাত্রেই চরিত্র-শোধন ঘটে না এবং প্রস্তাব-দ্বারাও জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

বিদ্যাসাগরের মহত্ত্বের সম্মুখীন হইলে, আমাদের ক্ষুদ্রত্বের উপলব্ধি জন্মিয়া যে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, এইরূপে সেই আত্ম-গ্লানির কতকটা ওজর মিলিতে পারে।

আমরা যে বিদ্যাসাগরের সম্মুখে দাঁড়াইতে সঙ্কুচিত হই, এইরূপে তাহার কতকটা সান্ত্বনা মিলিতে পারে বটে, কিন্তু এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মত একটা কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। সেই দুর্দ্দম প্রকৃতি, যাহা ভাঙ্গিতে পারিত, কখন নোয়াইতে পারে নাই; সেই উগ্র পুরুষকার, যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত করিয়াছে; সেই উন্নত মস্তক, যাহা কখন ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্য্যের নিকট অবনত হয় নাই; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ব্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল, তাহার বঙ্গদেশে আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই। এই উগ্রতা, এই কঠোরতা, এই দুর্দ্দমতা ও অনম্যতা, এই দুর্দ্ধর্ষ বেগবত্তার উদাহরণ, যাহারা কঠোর জীবনদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিয়া দুই ঘা দিতে জানে ও দুই ঘা খাইতে জানে, তাহাদের মধ্যেই পাওয়া যায়; আমাদের মত যাহারা তুলির দুধ চুমুক দিয়া পান করে ও সেই দুধে মাখন তুলিয়া জল মিশাইয়া লয়, তাহাদের মধ্যে এই উদাহরণ কিরূপে মিলিল, তাহা গভীর আলোচনার বিষয়।

সেই জন্যই বিদ্যাসাগরকে আমাদের বলিয়া পরিচয় দিতে দ্বিধা হয়। অনেকে বিদ্যাসাগরের চরিত্রে পাশ্চাত্ত্য জাতিসুলভ বিবিধ গুণের বিকাশ দেখেন। ইউরোপীয়দের আমরা যতই নিন্দা করি

না, অনেক বিষয়ে তাঁহারা খাঁটি মানুষ; আমাদের মনুষ্যত্ব তাঁহাদের নিকট নিষ্প্রভ ও মলিন। যে পুরুষকারে পুরুষের পৌরুষ, সাধারণ ইউরোপীয়ের চরিত্রে যাহা বর্ত্তমান, সাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রে যাহার অভাব, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তাহা প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবনটা দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। শুধু বাল্যজীবন কেন, তাঁহার সমগ্র জীবনকেই নিজের জন্য না হউক, পরের জন্য সংগ্রাম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই সংগ্রাম তাঁহার চরিত্রগঠনে অনেকটা আনুকূল্য করিয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু পিতৃপিতামহ হইতে তাঁহার ধাতুতে ও মজ্জাতে ও শোণিতে এমন একটা পদার্থ তিনি পাইয়াছিলেন, যাহাতে সমুদয় বিপত্তি ভিন্ন করিয়া তিনি বীরের মত সেই রণক্ষেত্রে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুঃখ অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে; জীবনের বন্ধুর পথ অনেকের পক্ষেই কণ্টকসমাবেশে আরও দুর্গম। কিন্তু এইরূপে সেই কাঁটাগুলিকে ছাঁটিয়া দলিয়া চলিয়া যাইতে অল্প লোককেই দেখা যায়। বাঙ্গালীর মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল।

অথচ আশ্চর্য্য এই, এত প্রভেদ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি খাঁটি বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার বাল্যজীবনে ইউরোপীয় প্রভাব তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই। তিনি যে স্থানে যাঁহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, সে স্থানে তাঁহাদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য ভাবের প্রভাব তখন পর্য্যন্ত একেবারেই প্রবেশলাভ করে নাই। পরজীবনে তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য দীক্ষা অনেকটা পাইয়াছিলেন, অনেক পাশ্চাত্ত্যের স্পর্শে আসিয়াছিলেন, পাশ্চাত্ত্য চরিত্রে অনুকরণের

যোগ্য অনেক পদার্থের সমাবেশ দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে যে তাঁহার চরিত্রকে কোনরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। তাঁহার চরিত্র তাহার পূর্ব্বেই সম্যগ্‌ভাবে সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইয়াছিল; আর নূতন মশলা-সংগ্রহের প্রয়োজন হয় নাই। যে বৃদ্ধ বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সহিত আমরা এত পরিচিত, যে বালক ঈশ্বরচন্দ্র পরের ক্ষেতে যবের শীষ খাইতে গিয়া গলায় কাঁটা ফুটাইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, অথবা আহারকালে পার্শ্ববর্ত্তীদের ঘৃণার উদ্রেকভয়ে নিজের পাকস্থলীতে আরশুলার ন্যায় বিকট জন্তু প্রেরণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই বালক বিদ্যাসাগরেই সেই চরিত্রের প্রায় সম্পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। বিদ্যাসাগর যদি ইংরাজি একেবারে না শিখিতেন, বা ইংরাজের স্পর্শে না আসিতেন, চিরকালই যদি তিনি সেই নিভৃত বীরসিংহ গ্রামের টোলখানিতে ব্যাকরণের তাৎপর্য্য আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, তাহা হইলে ১৩০৩ সালের ১৩ই শ্রাবণ তারিখে কলিকাতা সহরের অবস্থাটা ঠিক এমনি না হইতে পারিত; কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র আপন প্রকাণ্ড পুরুষসিংহত্ব লইয়া আপনার পল্লীগ্রামখানিকে বিক্ষোভিত রাখিতেন সন্দেহ নাই। তিনি ঠিক যেমন বাঙ্গালীটি হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, শেষ দিন পর্য্যন্ত তেমনি বাঙ্গালীটিই ছিলেন। তাঁহার নিজত্ব এত প্রবল ছিল যে, অনুকরণ-দ্বারা পরত্ব গ্রহণের তাঁহার কখন প্রয়োজন হয় নাই; এমন কি, তাঁহার এই নিজত্ব সময়ে সময়ে এমন উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিত যে, তিনি বলপূর্ব্বক এই পরত্বকে সম্মুখ হইতে দূরে ফেলিতেন। পাশ্চাত্ত্য চরিত্রের সহিত তাঁহার চরিত্রের যে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, সে সমস্তই তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি; অথবা তাঁহার পুরুষানুক্রমে

আগত পৈত্রিক সম্পত্তি। ইহার জন্য তাঁহাকে কখন ঋণস্বীকার করিতে হয় নাই।

সম্প্রতি আমাদের পরমশ্রদ্ধাভাজন মাননীয় কোন মহাশয় এইরূপ একটা কথা তুলিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্ত্যগণের সহিত আমাদের সামাজিক কুটুম্বিতাস্থাপন না ঘটিলে, আমাদের জাতীয় চরিত্রের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। কথাটা লইয়া আমাদের সমাজ-মধ্যে অনেকটা আন্দোলন চলিয়াছিল। আমাদের মধ্যে যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য বেশভূষার ও পাশ্চাত্ত্য আচারের পক্ষপাতী, তাঁহারা এই আন্দোলনে কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বৈদেশিকের সহিত কুটুম্বিতাস্থাপন ও বিদেশের আচার-গ্রহণ-সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত গ্রহণ করিতে গেলে কি ফল ঘটিত, বোধ হয়, উল্লেখ অনাবশ্যক। তাঁহার খাঁটি দেশীয় পরিচ্ছদ হইতেই তাহার উত্তর মিলিতে পারে। চটিজুতার প্রতি তাঁহার একটা আত্যন্তিক আসক্তি ছিল বলিয়াই তিনি যে চটিজুতা ভিন্ন অন্য জুতা পায়ে দিতেন না, এমন নহে। আমরা যে স্বদেশের প্রাচীন চটি ত্যাগ করিয়া বুট ধরিয়াছি, ঠিক তাহা দেখিয়াই যেন বিদ্যাসাগরের চটির প্রতি অনুরাগ বাড়িয়া গিয়াছিল। বাস্তবিকই এই চটিজুতাকে উপলক্ষমাত্র করিয়া একটা অভিমান, একটা দর্প তাঁহার অভ্যন্তর হইতে প্রকাশ পাইত। যে অভিমান ও দর্পের অনুরোধে নিতান্ত অনাবশ্যক হইলেও মুটের মাথা হইতে বোঝা কাড়িয়া নিজের মাথায় তুলিয়া পথ চলিতেন, এই দর্প ঠিক সেই দর্প।

আচার-বিষয়ে অন্যের অনুকরণ দূরের কথা, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে এমন দুই একটা পদার্থ ছিল, যাহাতে পাশ্চাত্ত্য মানব

হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছিল; এই প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখিয়াই আমরা বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব অনুভব করি।

পাশ্চাত্ত্য দেশে ফিলান্থ্ পি নামে একটা পদার্থ আছে, তাহার বাঙ্গালা নাম মানবপ্রীতি। এই মানবপ্রীতি কোন সঙ্কীর্ণ সমাজের মধ্যে আবদ্ধ নহে; সমস্ত মানবসমাজ এই হিতৈষণার বিষয়ীভূত এবং ইহাও বলা যাইতে পারে যে, এই হিতৈষণা পলিটিকাল ইকনমি শাস্ত্রেরও সম্পূর্ণ বিরোধী নহে। এই লোকহিতৈষণা ইউরোপ হইতে বাহির হইয়া দিগ্দিগন্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং ইহার প্রভাবে যে কত অলৌকিক ঘটনার কত অসাধারণ স্বার্থত্যাগের উদাহরণ মিলিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এই লোকহিতৈষণার প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, প্রাচ্য দেশে তাহার তুলনা মিলে না। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ভিতর এমন একটা স্ফূর্ত্তি রহিয়াছে, যেন তাহা আপনাকে সাম্লাইতে না পারিয়া আপনা হইতে উছলিয়া বাহির হয় এবং অন্য কোন মূর্ত্তিধারণের সুবিধা না পাইলে এই মানবপ্রীতির ও বিশ্বহিতৈষণার আকৃতি পরিগ্রহ করে। যে স্ফূর্ত্তির বশে ইংরাজের ছেলে সাঁতার দিয়া নায়াগারা পার হইতে গিয়া জীবনকে অবলীলাক্রমে বিসর্জ্জন দেয়, এই হিতৈষণাও যেন সেই অমানুষিক স্ফূর্ত্তি হইতেই উদ্ভূত। এই পরার্থপরতার মূলে যেন ব্যক্তিগত স্ফূর্ত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। আপনার ব্যক্তিত্ব যেন নিজের ভিতর স্থান না পাইয়া অপরের উপর সবেগে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। প্রাণের প্রবাহ যেন আপনার বেগ আপনি সহিতে না পারিয়া পরের দিকে ধাবিত হইতেছে। পরের উপকার যেন ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, আপনার নিজত্বের অভিব্যক্তিই যেন তাহার প্রণোদক।

বিদ্যাসাগরকে এইরূপ ফিলান্থ্‌পিষ্ট বলা চলে না। বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ প্রাচ্য ব্যাপার। ইহা কোনরূপ নীতি-শাস্ত্রের, ধর্ম্মশাস্ত্রের, অর্থশাস্ত্রের বা সমাজশাস্ত্রের অপেক্ষা করিত না। এমন কি, তিনি হিতৈষণাবশে যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাহার অনেকই আধুনিক সমাজতত্ত্ব মঞ্জুর করিবে না। কোন স্থানে দুঃখ দেখিলেই যেমন করিয়াই হউক তাহার প্রতিকার করিতে হইবে, একালের সমাজতত্ত্ব সর্ব্বদা তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু দুঃখের অস্তিত্ব দেখিলেই বিদ্যাসাগর তাহার কারণানুসন্ধানের অবসর পাইতেন না। লোকটা অভাবে পড়িয়াছে জানিবামাত্রই বিদ্যাসাগর সেই অভাব মোচন না করিয়া পারিতেন না। লোকটার কুলশীলের পরিচয় লওয়ার অবসর ঘটিত না। তাহার অভাবের উৎপত্তি কোথায়, তাহার অভাব পূরণ করিলে প্রকৃতপক্ষে তাহার উপকার হইবে, কি অপকার হইবে, ও গৌণ-সম্বন্ধে সমাজের ইষ্ট হইবে, কি অনিষ্ট হইবে, নীতিতত্ত্ব-ঘটিত ও সমাজতত্ত্ব-ঘটিত এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা তিনি করিতেন না। অপিচ, দুঃখের সম্মুখে আসিবামাত্র তাঁহার ব্যক্তিত্ব একেবারে অভিভূত হইয়া যাইত। তিনি আপনাকে ভুলিয়া যাইতেন; পরের মধ্যে তাঁহার নিজত্ব একেবারে মগ্ন ও লীন হইয়া যাইত। এই লক্ষণের দ্বারা তাঁহার মানবপ্রীতি অন্য দেশের মানবপ্রীতি হইতে স্বতন্ত্র ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন্‌ ব্যক্তির কি উপকার করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা তৈয়ার করা এক রকম অসম্ভব। তাঁহার জীবনচরিতলেখকেরা যেগুলা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই পড়িতে

পড়িতে শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সুদীর্ঘ ফর্দ্দের মধ্যে প্রায় শতকরা নব্বইটা কার্য্য অর্থনীতির অনুমোদিত নহে। কিন্তু প্রচলিত অর্থনীতির উপরে আর একটা নীতি আছে, তাহা উচ্চতর মানবনীতির অঙ্গীভূত।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত বর্ত্তমান যুগের বঙ্গসন্তানগণের অধিক সাদৃশ্য না থাকিতে পারে, কিন্তু সেই চরিত্র আমরা যে আদৌ দেখিতে পাই, তাহা সম্ভবে। কঠোরতার সহিত কোমলতার সমাবেশ ব্যতীত মনুষ্যচরিত্র সম্পূর্ণতা পায় না। ভারতবর্ষীয় মহাকবির কল্পনায় পূর্ণ মনুষ্যত্ব বজ্রের ন্যায় কঠোর ও কুসুমের ন্যায় কোমল; যুগপৎ ভীম ও কান্ত, অধৃষ্য এবং অভিগম্য।

রামায়ণ এবং উত্তরচরিত অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর সীতার বনবাস রচনা করিয়াছিলেন। রামায়ণ ও উত্তরচরিতের নায়কের একটা অপবাদ জনসমাজে প্রসিদ্ধ আছে। কোন একটা কিছু ছল পাইলেই রামচন্দ্র কাঁদিয়া পৃথিবী ভাসাইয়া ফেলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত গ্রন্থের প্রায় প্রতি পাতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর কাঁদিতেছেন। বিদ্যাসাগরের এই রোদন-প্রবণতা তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ। কোন দীন দুঃখী আসিয়া দুঃখের কথা আরম্ভ করিতেই বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া আকুল; কোন বালিকা-বিধবার মলিন মুখ দর্শনমাত্রেই বিদ্যাসাগরের বক্ষঃ-স্থলে গঙ্গা প্রবহমানা; ভ্রাতার অথবা মাতার মৃত্যু-সংবাদ পাইবামাত্র বিদ্যাসাগর বালকের মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকেন। বিদ্যাসাগরের বাহিরটাই বজ্রের মত কঠিন, ভিতরটা পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল। রোদন-ব্যাপার বড়ই গর্হিত কর্ম্ম, বিজ্ঞের

নিকট ও বিরাগীর নিকট অতীব নিন্দিত। কিন্তু এইখানেই বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব; এইখানেই তাঁহার প্রাচ্যতা। প্রতীচ্য দেশের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু প্রাচ্য দেশে রোদনপ্রবণতা মনুষ্যচরিত্রের যেন একটা প্রধান অঙ্গ। বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব এই যে, তিনি আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে তৃণের অপেক্ষাও তাচ্ছিল্য করিতেন, কিন্তু পরের জন্য রোদন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। দরিদ্রের দুঃখদর্শনে তাঁহার হৃদয় টলিত, বান্ধবের মরণশোকে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইত। জ্ঞানের উপদেশ ও বৈরাগ্যের উপদেশ তাঁহার নিকট এ সময়ে ঘেষিতে পারিত না। বায়ুপ্রবাহে ক্রমসানুমানের মধ্যে ক্রমেরই চাঞ্চল্য জন্মে, সানুমান্ চঞ্চল হয় না। এ ক্ষেত্রে বোধ করি ক্রমের সহিতই তাঁহার সাদৃশ্য। কিন্তু আবার সানুমানেরই শিলাময় হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া যে বারিপ্রবাহ নিঃসৃত হয়, তাহাই বসুন্ধরাকে উর্ব্বরা করে ও জীবকুলকে রক্ষা করে। সুতরাং সানুমান্ই বিদ্যাসাগরের সহিত প্রকৃতপক্ষে তুলনীয়। ভাগীরথী গঙ্গার পুণ্যধারায় যে ভূমি যুগ ব্যাপিয়া সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা হইয়া রহিয়াছে, রামায়ণী গঙ্গার পুণ্যতর অমৃত প্রবাহ সহস্র বৎসর ধরিয়া যে জাতিকে সংসারতাপ হইতে শীতল রাখিয়াছে, সেই ভূমির মধ্যে ও সেই জাতির মধ্যেই বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

ঈশ্বর এবং পরকাল প্রভৃতি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের কিরূপ বিশ্বাস ছিল, তাঁহার চরিতলেখকেরা সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট কথা বলেন না। তবে সংসার হইতে দুঃখের অস্তিত্ব এক নিঃশ্বাসে উড়াইয়া দিয়া সুখের এবং মঙ্গলের রাজ্য কল্পনার বলে প্রতিষ্ঠা করা বোধ করি দয়ার সাগরের পক্ষে অসাধ্য ছিল। সমুদ্রতলে সার জন

লরেন্স * ডুবাইয়া দিয়া দুনিয়ার মালিক কিরূপ করুণা প্রকাশ ও মঙ্গল সাধন করিলেন, এক নিঃশ্বাসে তিনি তাহা আবিষ্কার করিতে পারিতেন না। বস্তুতই দুঃখদাবানলের কেন্দ্রস্থলে উপবেশন করিয়া জগতের মঙ্গলময়ত্ব-সম্বন্ধে বক্তৃতা করা তাঁহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ ছিল। বোধ করি সেই জন্যই ঈশ্বর ও পরকাল-সম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ করিতে তিনি চাহিতেন না। তাঁহার প্রবৃত্তি তাঁহাকে যে কর্ত্তব্যপথে চালাইত, তিনি সেই পথে চলিতেন। মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্যসম্পাদন করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন; গণ্ডগোলে প্রবৃত্ত হইবার তাঁহার অবসর ছিল না। এমন দিন কবে আসিবে, যে দিন মনুষ্যসমাজ সাম্প্রদায়িক কোলাহলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে; যে দিন আপামর সাধারণ বিতণ্ডা ত্যাগ করিয়া বিদ্যাসাগরের অনুবর্ত্তী হইয়া মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্যনির্ণয়ে মন দিতে অবকাশ লাভ করিবে।

বিদ্যাসাগর একজন সমাজসংস্কারক ছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, বিধবাবিবাহে পথ-প্রদর্শন তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম। বস্তুতই এই বিধবাবিবাহ-ব্যাপারে আমরা ঈশ্বরচন্দ্রের সমগ্র মূর্ত্তিটা দেখিতে পাই। কোমলতা ও কঠোরতা উভয় গুণের আধাররূপে তিনি লোকসমক্ষে প্রতীয়মান হয়েন। প্রকৃতির নিষ্ঠুর হস্তে মানবনির্য্যাতন তাঁহার কোমল প্রাণকে দিবানিশ ব্যথিত রাখিত; দুর্ব্বল মনুষ্যের প্রতি নিষ্করুণ প্রকৃতির অত্যাচার তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে ব্যথা দিত; তাহার উপর মনুষ্যবিহিত সমাজবিহিত অত্যাচার, তাঁহার পক্ষে নিতান্তই অসহ্য হইয়াছিল। বিধাতার

* এই নামে একখানা জাহাজ ৭০০ যাত্রিসহ কলিকাতা হইতে পুরী যাইবার পথে সমুদ্রে পড়িয়া মগ্ন হয়।

কৃপায় মানুষের দুঃখের ত আর অভাব নাই, তবে কেন মানুষ আবার সাধ করিয়া আপন দুঃখের বোঝায় ভার চাপায়। ইহা তিনি বুঝিতেন না এবং ইহা তিনি সহিতেনও না। বালবিধবার দুঃখ দর্শনে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল এবং সেই বিগলিত হৃদয়ের প্রস্রবণ হইতে করুণামন্দাকিনীর ধারা বহিল। সুরনদী যখন ভূমিপৃষ্ঠে অবতরণ করে, তখন কার সাধ্য যে, সে প্রবাহ রোধ করে! বিদ্যাসাগরের করুণার প্রবাহ যখন ছুটিয়াছিল, তখন কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই গতির পথে দাঁড়াইতে পারে। দেশাচারের দারুণ বাঁধ তাহা রোধ করিতে পারে নাই। সমাজের ভ্রূকুটীভঙ্গিতে তাহার স্রোত বিপরীত মুখে ফিরে নাই। এইখানে বিদ্যাসাগরের কঠোরতার পরিচয়। সরল, উন্নত, জীবন্ত মনুষ্যত্ব লইয়া তিনি শেষ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন; কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই মেরুদণ্ড নমিত করে।

কিন্তু এই সমাজসংস্কার-ব্যাপারেও বিদ্যাসাগরের একটু অসাধারণত্ব দেখা যায়। প্রথমতঃ বিধবাবিবাহে হস্তক্ষেপের পূর্ব্বে তিনি পিতামাতার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা-প্রতিপাদনে তিনি প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই দুইটাই আমাদের পক্ষে চিন্তনীয় বিষয়। সম্প্রতি আমরা নীতিশাস্ত্র হইতে 'মরাল কারেজ' নামক একটা সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছি। কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্ররোচনায় স্বার্থবিসর্জ্জন ব্যাপারটা যে, কোন দেশের একচেটিয়া নহে, তাহা সদা সর্ব্বদা আমরা ভুলিয়া যাই। আমাদের প্রাচীন ভারতভূমিতেও এই কর্ত্তব্যের জন্য স্বার্থবিসর্জ্জনের উদাহরণ ভূরি পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে।

তবে দুঃখের বিষয় যে, অন্যত্র যে সব ঘটনায় ঢক্কানিনাদ হইয়া থাকে, এ দেশে তাহার অধিকাংশই নীরবে সম্পাদিত হয়। কিন্তু এই মরাল কারেজটা এ দেশে নূতন আমদানি এক অপূর্ব্ব জিনিষ। আরও দুঃখের বিষয় যে, একালের শিক্ষার সহিত এই মরাল কারেজের কি একটা সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। লোকের বয়োবৃদ্ধি-সহকারে সংসারের হাইড্রলিক প্রেসের চাপ পড়িয়া ইহা অনেকটা সঙ্কুচিত ও শীর্ণ হইয়া পড়ে; কিন্তু শিক্ষানবিশ বালকগণের নৈতিক সাহসের আক্রমণটা নিরীহ পিতামাতার উপর দিয়া, নিরীহতর প্রতিবেশীর উপর দিয়া ও নিরীহতম মাষ্টার মহাশয়ের উপর দিয়াই নিক্ষিপ্ত হয়।

বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর এই মরাল কারেজের প্রতি বিশেষ রাজি ছিলেন না। স্বাধীন আত্মাকেও কোন্ স্থানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরাধীনতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন। নিজের বুদ্ধি এবং নিজের প্রবৃত্তির মুখে বল্গা লাগাইয়া কোথায় তাহাদিগকে নিয়মিত রাখিতে হয়, তাহা তিনি বুঝিতেন। স্বর্গের দেবতায় তাঁহার কিরূপ আস্থা ছিল, জানি না; কিন্তু স্বর্গাদপি গরীয়ান্ জীবন্তদেবের তুষ্টির জন্য সময়বিশেষে আপনার ধর্ম্মবুদ্ধিকে পর্য্যন্ত বলিদান দেওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন; তাঁহার ন্যায় স্বতন্ত্র পুরুষ বঙ্গদেশে তখন ছিল না। কিন্তু মানবজীবনে এমন সময় আসিতে পারে, যখন সেই মুক্তবায়ুমার্গে বিহারপ্রয়াসী স্বাতন্ত্র্যকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়; ইহা তিনি মানিতেন। সেই শৃঙ্খলকে কপটাচারের আয়স নিগড় মনে করিবার প্রয়োজন নাই। উহা প্রেমের শৃঙ্খল ও ভক্তির শৃঙ্খল,—মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের যে প্রেমের বন্ধন

প্রকৃতি আপন হাতে নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে, যে ভক্তির বন্ধন ব্যক্তি-নিহিত ক্ষুদ্র জীবনকে সমাজরূপী বিরাট্‌পুরুষের ঐতিহাসিক জীবনের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রাখিয়ছে। এই প্রেমের শিকল ও ভক্তির শিকল গলায় পরিয়া মনুষ্যজীবন ধন্য ও কৃতার্থ হয়; "মণিমুক্তার মোহন মালা" ইহার নিকট স্থান পায় না।

ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয় লইয়া আমরা সকলেই কিছু ধরাতলে অবতীর্ণ হই নাই। বালবিধবার অশ্রুজল আমাদের পাষাণহৃদয়ে রেখাঙ্কন করে না; তাই আমরা ভণ্ডব্রহ্মচর্য্যার মলিন পাংশুবিক্ষেপে সেই অশ্রুজল মুছিতে যাই। ঈশ্বরচন্দ্রের বীরত্ব বিধবার দুঃখমোচনে সমর্থ হয় নাই। দেশাচারের জয়লাভ ঘটিয়াছে সত্য কথা, কিন্তু ইহাই বিধিলিপি, ইহাই প্রকৃতির নির্ব্বন্ধ। স্বাভাবিক, সরল, ছদ্মবেশহীন মনুষ্যত্ব ইহাতে ম্রিয়মাণ হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখপ্রকাশ নিষ্ফল;—কেন না, ইহা বিধিলিপি।

এই দেশাচারগুলির সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমাদের মধ্যে যাঁহাদের বিশ্বাস যে, প্রাচীনকালে একদিন জন কয়েক ব্রাহ্মণ পরামর্শ করিয়া লাভের প্রত্যাশায় এই জঘন্য দেশাচার সকলের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং জনসমাজ ভয়ে হউক বা নির্বুদ্ধিতায় হউক, সেই সকল ব্যবস্থা নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহাদের সহিত আমি একমত নহি। ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের চেষ্টায় সমাজের ধারাবাহিক জীবন যে এইরূপে বিপর্য্যস্ত হইতে পারে, তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। আজকাল সমাজশরীরের সহিত জীবশরীরের তুলনা করা এবং সমাজের অন্তর্গত দেশাচারকে জীবশরীরোদ্গত ব্যাধিজনক বিস্ফোটকের সহিত তুলনা করা একটা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জীববিদ্যার অন্তর্গত আধুনিক নিদানশাস্ত্রে বিস্ফোটকের উৎপত্তির যে কারণ নির্দ্দেশ করে, তাহাতে এই তুলনা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বাহির হইতে রোগের বীজ শরীর-মধ্যে লব্ধপ্রবেশ হইয়া বিস্ফোটকের সৃষ্টি করে। কিন্তু সমাজশরীরের অন্তর্ভুক্ত পুরুষপরম্পরাগত প্রথাগুলিকে সকল সময়ে বাহির হইতে আগত বলিতে পারা যায় না। সমাজশরীরের বয়ঃক্রমানুসারে তাহারা জৈবিক নিয়ম মতেই আপনা হইতে উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও লয় পায়। সমাজশরীরকেও ঠিক জীবশরীরের মত দুরন্ত প্রকৃতির মধ্যে অবস্থান করিয়া সহস্র প্রতিকূল শক্তি হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে হয়; এবং সেই আত্মরক্ষার প্রয়াসফলে তাহাতে বিবিধ অঙ্গ ও বিবিধ অবয়ব ও বিবিধ যন্ত্রের বিকাশ হয়। জীবশরীরের মধ্যে কতকগুলা অবয়বের চিহ্ন দেখা যায়, শরীরবিজ্ঞানে তাহাদিগকে vestigial organ আখ্যা দেয়। এই ক্ষুদ্র অবয়বগুলার জীবন ধারণে ও জীবন রক্ষণে কোনরূপ উপকার দেখা যায় না; বরং সময়ে সময়ে তাহারা জীবনের সংহারক হইয়া উঠে। সাধারণতঃ তাহারা তাহাদের নিরর্থক, অনাবশ্যক অস্তিত্বরক্ষার জন্য সমগ্র দেহের নিকট হইতে পুষ্টির ভাগ ও শক্তির ভাগ গ্রহণ করিয়া জীবনের প্রতিকূলতাই সাধন করে। ইহারা জীবনযাত্রার প্রতিকূল হইলেও আধুনিক জীববিদ্যার মতে বিস্ফোটকের বা ব্যাধির স্থানীয় নহে। জীবের ইতিহাসে এমন সময় ছিল, তখন তাহারা জীবনের পক্ষে আবশ্যক ছিল, তখন তাহারাও জীবনের আনুকূল্যসাধনে নিযুক্ত রহিত। তদানীন্তন বহিঃপ্রকৃতির সহিত যুদ্ধব্যাপারে জীবদেহকে সমর্থ করিবার জন্য তাহাদের আপনা হইতে বিকাশ হইয়াছিল।

বহিঃপ্রকৃতির পরিবর্ত্তন-সহ তাহাদের আবশ্যকতা অন্তর্হিত হইয়াছে, এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে কাজেই তাহাদের অস্তিত্বও বিলোপের অভিমুখে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। সমাজশরীরে দেশাচারগুলাও কতকটা যেন সেইরূপ। সমাজের অতীত ইতিহাসে বিশেষ প্রয়োজন-সাধনের উদ্দেশ্যে তাহাদের আবির্ভাব হইয়াছিল; এখন সেই প্রয়োজনের অভাব হওয়ায়, তাহারা অনাবশ্যক ও জীবনের যন্ত্রণাদায়ক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বিনা অন্য কোন প্রণালী নাই, যাহাতে তাহাদের উচ্ছেদ-সাধন করিতে পারে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন সময়সাপেক্ষ এবং সেই দিনের প্রতীক্ষা করাই সঙ্গত। সমাজশরীরের চিকিৎসক তুমি বিস্ফোটকভ্রমে যেখানে সেখানে ছুরিকা চালাইলে সর্ব্বত্র সুফল নাও হইতে পারে।

আমাদের দেশে জীবনচরিত লেখা প্রচলিত নাই, এবং কোন ব্যক্তির জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেও তাহার উপকরণ উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত রচনা করিয়া যাঁহারা জাতীয় সাহিত্যের এই কলঙ্ক অপনোদনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় এই অভাবের ও অসুবিধার বিশেষ ভুক্তভোগী। এরূপ স্থলে বিদ্যাসাগরের মত মহাশয়গণের স্পর্শে যিনি কখন আসিবার সুবিধা পাইয়াছেন, যিনি কোন না কোন সূত্রে তাঁহার চরিত্রের কোন একটা দোষ দেখিতে পাইয়াছেন, তৎসমস্ত সাধারণের নিকট ব্যক্ত করা তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমার যাহা কিছু বলিবার আছে, ব্যক্তিগত হইলেও তাহা বলিতে সাহসী হইতেছি। বঙ্গদেশের মধ্যে ছোট বড় এমন ব্যক্তি অল্পই আছেন, যিনি কোন

না কোন প্রকারে বিদ্যাসাগরের নিকট ঋণগ্রস্ত নহেন। দূর মফঃস্বলের পল্লীগ্রামের মধ্যেও তাঁহার প্রভাব কতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা চিন্তার অগোচর। মহতের আসনভূমি তীর্থস্বরূপ। বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা যে সময়ে বিদ্যাসাগরের কর্ম্মবহুল জীবনের অন্যতম ব্যবসায় ছিল, সেই সময়ে আমার পিতামহের ক্ষুদ্র কুটীর একদিন বিদ্যাসাগরের পাদস্পর্শে তীর্থস্থলে পরিণত হইয়াছিল। শৈশবকালে সেই গৌরবান্বিত দিবসের প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যাসাগর-সম্বন্ধে নানাকথা অন্তঃপুরবাসিনীগণের মুখেও শুনিতে পাইতাম। পাঠশালায় প্রবেশলাভের পর বর্ণপরিচয়— প্রথমভাগ, দ্বিতীয়ভাগ, কথামালা, আখ্যানমঞ্জরী প্রভৃতি পুস্তক পরম্পরার শুভ্র মলাটের উপর একই নাম অঙ্কিত দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত পাঠশালা ও লেখাপড়া ও ছাপার বহি ও পণ্ডিত মহাশয়ের বেত্রদণ্ডের কিরূপ একটা অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ কল্পনায় স্থির করিয়া লইয়াছিলাম। বিদ্যাসাগরের আকৃতি ও পরিচ্ছদ ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে যে সকল গল্প শুনিতাম, তৎসমুদয় সেই কল্পনার সহিত বিজড়িত করিয়া অন্তঃকরণ একটা বিদ্যাসাগর-মূর্ত্তি গড়িয়া ফেলিয়াছিল। বটতলার পুস্তকের বোঝা মাথায় করিয়া চটিজুতাধারী রুক্ষবেশ পরুষমূর্ত্তি এক ব্যক্তি আমাদের পল্লী-গ্রামে মাঝে মাঝে দেখা দিত। শ্রোতৃগণ মার্জ্জনা করিবেন, সেই লোকটাই যে নিশ্চিত বিদ্যাসাগর, এই ধারণা হইতে অব্যাহতি পাইতে আমাকে উত্তরকালে অনেক প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। আমার মনস্তত্ত্ববিৎ বন্ধুগণের উপর এই বিষম সমস্যার মীমাংসার ভার থাকিল। ১২৮৮ সালের ২১শে মাঘ তারিখে আমি কলিকাতা সহরে আসি এবং ২৩শে তারিখে তীর্থযাত্রীর আগ্রহের

-সহিত পিতৃব্যদেবের সমভিব্যাহারে চিরাকাঙ্ক্ষিত বিদ্যাসাগর-দর্শন-লালসা তৃপ্ত করিয়া জীবন ধন্য করি। শৈশবকালের কাল্পনিক বিদ্যাসাগরের সহিত প্রকৃত বিদ্যাসাগরের সাদৃশ্য দেখিয়াছিলাম কি না, সে কথা উত্থাপনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু সেই দিবস তাঁহার মুখ হইতে যে কয়েকটি বাক্য শুনিতে পাইয়াছিলাম, আজি পর্য্যন্ত তাহা আমার কর্ণবিবরে ধ্বনিত হইতেছে। আশা করি, সেই উদার প্রশস্ত স্নেহপূর্ণ হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর বঙ্গের যে সকল পুত্রকন্যার শ্রবণপথে প্রবেশলাভ করিয়া হৃদয়ের ভিত্তিমূলে আঘাত দিয়াছে, তাঁহারা চিরদিন সেই কণ্ঠস্বরের স্মৃতিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিবেন। সেই প্রাচ্য মনুষ্যত্বের আদর্শ তাঁহাদের জীবনকে যুগপৎ প্রণোদিত ও সংযমিত রাখিবে। আমাদের এই দুর্দ্দিনেও যদি মনুষ্যত্বের সেই আদর্শের আবির্ভাব সম্ভবপর হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের প্রাচীনা পূজনীয়া জননীর দেহে নবজীবনসঞ্চারের আশা কি কখনই ফলিবে না? কিন্তু ভবিষ্যতের ঘনান্ধকার ভিন্ন করিয়া দীপবর্ত্তিকা আনয়ন করিবে কে? কে বলিবে, আমাদের পরিণতি কোথায়? মহাপুরুষের আবির্ভাব ভারতভূমিতে নূতন ঘটনা নহে। আশা যে, মহাপুরুষের আবির্ভাবই ভারতের উদ্ধার-সাধনে সমর্থ হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতের সেই মহাপুরুষ কোথায়? দগ্ধাস্থিপঞ্জরময় ভারতের এই মহাশ্মশানে এই মৃতজাতির শবদেহে নূতন জীবন সঞ্চার করিবে কে?

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

লক্ষ্মণ

বালকাণ্ডে লিখিত হইয়াছে, লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের "প্রাণ ইবাপরঃ"—অপর প্রাণের ন্যায়। ভরত ছাড়া আমরা রামকে কল্পনা করিতে পারি, এমন কি সীতা ছাড়া রামচরিত্র কল্পনা করিবার সুবিধাও কবিগুরু দিয়াছেন, কিন্তু লক্ষ্মণ ছাড়া রামচরিত্র একান্ত অসম্পূর্ণ।

লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি কতকটা মৌন এবং ছায়ার ন্যায় অনুগামী! লক্ষ্মণ রামের প্রতি ভালবাসা কথায় জানাইবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন না, নিতান্ত কোনরূপ অবস্থার সঙ্কটে না পড়িলে তিনি তাঁহার হৃদয়ের সুগভীর স্নেহের আভাস দিতে ইচ্ছুক হইতেন না; বাধ্য হইয়া দুই এক স্থলে তিনি ইঙ্গিতমাত্রে তাঁহার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অপরিসীম রামপ্রেম মৌনভাবেই আমাদিগের নিকট সর্ব্বত্র ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ভরত, সীতা এবং রামচন্দ্রও মনের আবেগ সংবরণ করিতে জানিতেন না; কিন্তু লক্ষ্মণ স্নেহসম্বন্ধে সংযমী—যে স্নেহ পরিপূর্ণ, অথচ যাহা আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই; এই মৌন স্নেহ-চিত্র আমাদিগকে সর্ব্বত্যাগী কষ্টসহিষ্ণু ভ্রাতৃভক্তির অশেষ কথা জানাইতেছে।

লক্ষ্মণ আজন্ম রামচন্দ্রের ছায়ার ন্যায় অনুগামী।

"ন চ তেন বিনা নিদ্রাং লভতে পুরুষোত্তমঃ।
মৃষ্টমন্নমুপানীতমশ্নাতি ন হি তং বিনা॥"

—রামের কাছে না শুইলে তাঁহার রাত্রে ঘুম হয় না, রামের প্রসাদ ভিন্ন কোন উপাদেয় খাদ্যে তাঁহার তৃপ্তি হয় না।

" যদা হি হয়মারূঢ়ো মৃগয়াং যাতি রাঘবঃ।
অথৈনং পৃষ্ঠতোঽভ্যেতি সধনুঃ পরিপালয়ন্॥ "

—রাম যখন অশ্বারোহণে মৃগয়ায় যাত্রা করেন, অমনি ধনুর্হস্তে তাঁহার শরীর রক্ষা করিয়া বিশ্বস্ত অনুচর তাঁহার অনুগমন করেন। যে দিন বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম রাক্ষসবধকল্পে নিবিড় বনপথে যাইতেছিলেন, সে দিনও কাকপক্ষধর লক্ষ্মণ সঙ্গে সঙ্গে। শৈশবদৃশ্যাবলীর এই সকল চিত্রের মধ্যে আত্মহারা লক্ষণের ভ্রাতৃভক্তির ছবি মৌনভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রামের অভিষেক-সংবাদে সকলেই কত সন্তোষ প্রকাশের জন্য ব্যস্ত হইলেন, কিন্তু লক্ষ্মণের মুখে আহ্লাদসূচক কথা নাই, নীরবে রামের ছায়ার ন্যায় লক্ষ্মণ পশ্চাদ্বর্ত্তী। কিন্তু রাম স্বল্পভাষী ভ্রাতার হৃদয় জানিতেন, অভিষেক-সংবাদে সুখী হইয়া সর্ব্বপ্রথমেই লক্ষ্মণের কণ্ঠলগ্ন হইয়া বলিলেন,—

" জীবিতঞ্চাপি রাজ্যঞ্চ ত্বদর্থমভিকাময়ে। "

—আমি জীবন ও রাজ্য তোমার জন্যই কামনা করি। ভ্রাতার এইরূপ দুই একটী কথাই লক্ষ্মণের অপূর্ব্ব স্নেহের একমাত্র পুরস্কার ও পরম পরিতৃপ্তি। আমরা কল্পনানয়নে দেখিতে পাই, রামের এই স্নিগ্ধ আদরে "সুবর্ণচ্ছবি" লক্ষ্মণের গণ্ডদ্বয় নীরব প্রফুল্লতায় রক্তিমাভ হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এই মৌন স্বল্পভাষী যুবক, রামের প্রতি কেহ অন্যায় করিলে, তাহা ক্ষমা করিতে জানিতেন না। যে দিন কৈকেয়ী অভিষেক-ব্রতোজ্জ্বল প্রফুল্ল রামচন্দ্রকে মৃত্যুতুল্য বনবাসাজ্ঞা

শুনাইলেন, রামের মূর্ত্তি সহসা বৈরাগ্যের শ্রীতে ভূষিত হইয়া উঠিল, তিনি ঋষিবৎ নির্লিপ্তভাবে গুরুতর বনবাসাজ্ঞা মাথায় তুলিয়া লইলেন, অভিষেক-সম্ভারের সমস্ত আয়োজন যেন তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল ; সেই দিন সেই উৎকট মুহূর্ত্তেও তাঁহার আর কোন সঙ্গী ছিল না, তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে চিরসুহৃৎ ভক্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বাল্মীকি দুইটী ছত্রে সেই মৌন চিত্রটী আঁকিয়াছেন—

"তং বাষ্পপরিপূর্ণাক্ষঃ পৃষ্ঠতোঽনুজগাম হ।
লক্ষ্মণঃ পরমক্রুদ্ধঃ সুমিত্রানন্দবর্দ্ধনঃ॥"

—লক্ষ্মণ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বাষ্পপূর্ণচক্ষে ভ্রাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন।

এই অন্যায় আদেশ তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। রামচন্দ্র যাঁহাদিগকে অকুণ্ঠিতচিত্তে ক্ষমা করিয়াছেন, লক্ষ্মণ তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। রামের বনবাস লইয়া তিনি কৌশল্যার সম্মুখে অনেক বাগ্বিতণ্ডা করিয়াছিলেন, ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি সমস্ত অযোধ্যাপুরী নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি রামের কর্ত্তব্য-বুদ্ধির প্রশংসা করেন নাই—এই গর্হিত আদেশপালন ধর্ম্মসঙ্গত নহে, ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই তেজস্বী যুবক যখন দেখিতে পাইলেন, রামচন্দ্র একান্তই বনবাস যাইবেন, তখন কোথা হইতে এক অপূর্ব্ব কোমলতা তাঁহাকে অধিকার করিয়া বসিল, তিনি বালকের ন্যায় রামের পদযুগে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন—

"ঐশ্বর্য্যঞ্চাপি লোকানাং কাময়ে ন ত্বয়া বিনা।"

—অমরত্ব কিংবা ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যও আমি তোমাভিন্ন আকাঙ্ক্ষা

করি না। রামের পাদপীড়নপূর্ব্বক—উহা অশ্রুসিক্ত করিয়া নববধূটীর ন্যায় সেই ক্ষাত্রতেজোদীপিত মূর্ত্তি ফুলসম সুকোমল হইয়া সঙ্গে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। এই ভিক্ষা স্নেহসূচক দীর্ঘ বক্তৃতায় অভিব্যক্ত হয় নাই, অতি অল্প কথায় তিনি রামের সঙ্গী হইবার জন্য অনুমতি চাহিলেন, কিন্তু সেই অল্প কথায় স্নেহ-গভীর আত্মত্যাগী হৃদয়ের ছায়া পড়িয়াছে। রাম হাতে ধরিয়া তাঁহাকে তুলিয়া লইলেন, "প্রাণসম প্রিয়," "বন্ধু," "সখা" প্রভৃতি স্নেহমধুর সম্ভাষণে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া বনযাত্রা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ দুই একটী দৃঢ় কথায় তাঁহার অটল সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলেন, "আপনি শৈশব হইতে আমার নিকট প্রতিশ্রুত, আমি আপনার আজন্ম সহচর, আজ তাহার ব্যতিক্রম করিতে চাহিতেছেন কেন?"

লক্ষ্মণ সঙ্গে চলিলেন। এই আত্মত্যাগী দেবতার জন্য কেহ বিলাপ করিল না। যে দিন বিশ্বামিত্র রামকে লইয়া যাইবার জন্য দশরথের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সে দিন—

"ঊনষোড়শবর্ষো মে রামো রাজীবলোচনঃ।"

বলিয়া বৃদ্ধ রাজা ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তৎকনিষ্ঠ আর একটী রাজীবলোচন যে দুরন্তরাক্ষসবধকল্পে ভ্রাতার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলেন, তজ্জন্য কেহ আক্ষেপ করেন নাই। আজ রাম, লক্ষ্মণ, সীতা বনে চলিয়াছেন, আযোধ্যার যত নয়নাশ্রু, তাহা রহিয়া রহিয়া রামসীতার জন্য বর্ষিত হইতেছে। কিন্তু লক্ষ্মণের জন্য কেহ আক্ষেপ করেন নাই, এমন কি, সুমিত্রাও বিদায়কালে পুত্রের কণ্ঠলগ্ন হইয়া ক্রন্দন করেন নাই, তিনি দৃঢ় অথচ স্নেহার্দ্রকণ্ঠে

লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন—

"রামং দশরথং বিদ্ধি, মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি, গচ্ছ তাত যথাসুখম্॥"

—যাও বৎস, স্বচ্ছন্দমনে বনে যাও—রামকে দশরথের ন্যায় দেখিও, সীতাকে আমার ন্যায় মনে করিও এবং বনকে অযোধ্যা বলিয়া গণ্য করিও। মাতার চক্ষুর অশ্রুবিন্দু লক্ষ্মণ পাইলেন না, বরং সুমিত্রা তাঁহাকে যেন কর্ত্তব্যপালনের জন্য আগ্রহসহকারে ত্বরান্বিত করিয়া দিলেন—

"সুমিত্রা গচ্ছ গচ্ছেতি পুনঃ পুনরুবাচ তম্।"

—সুমিত্রা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ "যাও যাও" এই কথা বলিতে লাগিলেন।

মৌন সন্ন্যাসী আত্মীয় সুহৃদ্‌বর্গের উপেক্ষা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তিনি মনেও করেন নাই, রামচন্দ্রের জন্য যে শোকোচ্ছ্বাস, তাহার মধ্যেই তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি কাহারও নিকটে বিলাপ প্রত্যাশা করেন নাই, রামপ্রেমে তাঁহার নিজের সত্তা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

আরণ্যজীবনের যাহা কিছু কঠোরতা, তাহার সমধিক ভাগ লক্ষ্মণের উপর পড়িয়াছিল,—কিংবা তাহা তিনি আহ্লাদ-সহকারে মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন। গিরি-সানুদেশের পুষ্পিত বন্যতরুরাজী হইতে কুসুমচয়ন করিয়া রামচন্দ্র সীতার চূর্ণকুন্তলে পরাইয়া দিতেন; গৈরিকরেণু-দ্বারা সীতার সুন্দর ললাটে তিলক রচনা করিয়া দিতেন; পদ্ম তুলিয়া সীতার সহিত মন্দাকিনী-তীরে অবগাহন করিতেন, কিংবা গোদাবরীতীরস্থ বেতসকুঞ্জে সীতার

উৎসঙ্গে মস্তক রক্ষা করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেন; আর এদিকে মৌন সন্ন্যাসী খনিত্র-দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিতেন, কখনও পরশুহস্তে শালশাখা কর্ত্তন করিতেন, কখনও অস্ত্রশস্ত্র এবং সীতার পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদিতে পূর্ণ বিপুল বংশপেটিকা হস্তে লইয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাত্রা করিতেন, কখনও বা মহিষ ও বৃষের করীষ সংগ্রহ করিয়া অগ্নি জ্বালিবার ব্যবস্থা করিতেন। একদিন দেখিতে পাই, শীতকালের তুষারমলিন জ্যোৎস্নায় শেষরাত্রিতে যবগোধূমাচ্ছন্ন বনপন্থায় নালশেষ নলিনী-শোভিত সরসীতে কলস লইয়া তিনি জল তুলিতেছেন। অন্য একদিন দেখিতে পাই, চিত্রকূটপর্ব্বতের পর্ণশালা হইতে সরসীতটে যাইবার পথটী চিহ্নিত করিবার জন্য তিনি পথে পথে উচ্চ তরুশাখায় চীরখণ্ড বদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। কখনও বা তিনি কোমলদর্ভাঙ্কুর ও বৃক্ষপর্ণ-দ্বারা রামের শয্যা প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, কখনও বা দেখিতে পাই তিনি কালিন্দী উত্তীর্ণ হইবার জন্য বৃহৎ কাষ্ঠগুলি শুষ্ক ও বন্য বেতসলতা-দ্বারা সুসংবদ্ধ করিয়া মধ্যভাগে জম্বুশাখা-দ্বারা সীতার উপবেশন-জন্য সুখাসন রচনা করিতেছেন। এই সংযমী স্নেহবীর ভ্রাতৃসেবায় তাঁহার নিজ সত্তা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। রামচন্দ্র পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন—"এই সুন্দর তরুরাজীপূর্ণ প্রদেশে পর্ণশালা রচনার জন্য একটী স্থান খুঁজিয়া বাহির করিয়া লও।" লক্ষ্মণ বলিলেন, "আপনি যে স্থানটী ভালবাসেন, তাহাই দেখাইয়া দিন, সেবকের উপর নির্ব্বাচনের ভার দিবেন না।" প্রভুসেবায় এরূপ আত্মহারা ভৃত্য,—এমন আর কোথায় দেখিয়াছেন? রামচন্দ্র স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলে

লক্ষ্মণ ভূমির সমতা সম্পাদন করিয়া খনিত্রহস্তে মৃত্তিকাখননে প্রবৃত্ত হইলেন।

আর এক দিনের দৃশ্য মনে পড়ে,—গভীর অরণ্যে চারিদিকে কৃষ্ণসর্প বিচরণ করিতেছে, পথহারা বিপন্ন পথিকত্রয় রাত্রিবাসের জন্য জঙ্গলের নিভৃতে বৃক্ষনিম্নে শুইয়া আছেন, সীতার সুন্দর মুখখানি অনশন ও পর্য্যটনে একটু হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে। রামচন্দ্রের এই দুঃখময়ী রজনীর কষ্ট অসহ্য হইল,—তিনি লক্ষ্মণকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার জন্য বার বার পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, "এ কষ্ট আমার এবং সীতারই হউক, তুমি ফিরিয়া যাও, শোকের অবস্থায় সান্ত্বনাদান করিয়া আমার মাতাদিগকে পালন করিও।" লক্ষ্মণ স্বীয় স্নেহ-সম্বন্ধে বেশী কথা কহিতে জানিতেন না, রামের এবংবিধ কাতরোক্তিতে দুঃখিত হইয়া বলিলেন—

"ন হি তাতং ন শত্রুঘ্নং ন সুমিত্রাং পরন্তপ।
দ্রষ্টুমিচ্ছয়মদ্যাহং স্বর্গঞ্চাপি ত্বয়া বিনা॥"

—আমি পিতা, সুমিত্রা, শত্রুঘ্ন, এমন কি স্বর্গও তোমাকে ছাড়িয়া দেখিতে ইচ্ছা করি না।

কবন্ধ মরিল, জটায়ু মরিলেন; আমরা দেখিতে পাই, লক্ষ্মণ নিঃশব্দে সমাধিস্থল খনন করিয়া কাষ্ঠ আহরণপূর্ব্বক কবন্ধ ও জটায়ুর সৎকার করিতেছেন। দিবারাত্র তাঁহার বিশ্রাম ছিল না—এই ভ্রাতৃসেবাই তাঁহার জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল। বনে আসিবার সময় তাহাই তিনি বলিয়া অসিয়াছিলেন—

"ভবাংস্তু সহ বৈদেহ্যা গিরিসানুষু রংস্যসে।
অহং সর্ব্বং করিষ্যামি জাগ্রতঃ স্বপতশ্চ তে।
ধনুরাদায় সগুণং খনিত্রপিটকাধরঃ॥"

—দেবী জানকীর সঙ্গে আপনি গিরি-সানুদেশে বিহার করিবেন, জাগরিত বা নিদ্রিতই থাকুন, আপনার সকল কর্ম্ম আমিই করিয়া দিব। খনিত্র, পিটক এবং ধনু হস্তে আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব।

বনবাসের শেষ বৎসর বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হইল; রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। সীতার শোকে রাম ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পড়িলেন, ভ্রাতার এই দারুণ কষ্ট দেখিয়া লক্ষ্মণও পাগলের মত সীতাকে ইতস্ততঃ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রামের অনুজ্ঞায় তিনি বার বার গোদাবরীর তীরভূমি খুঁজিয়া আসিলেন। এইমাত্র গোদাবরীতীর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন, রাম তখনই আবার বলিলেন—

"শীঘ্রং লক্ষ্মণ জানীহি গত্বা গোদাবরীং নদীম্।
অপি গোদাবরীং সীতা পদ্মান্যানয়িতুং গতা॥"

পুনরায় গোদাবরীর তটদেশে যাইয়া লক্ষ্মণ সীতাকে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্ধান না পাইয়া ভয়ে ভয়ে রামের নিকট উপস্থিত হইয়া আর্ত্তস্বরে বলিলেন—

"কং নু সা দেশমাপন্না বৈদেহী ক্লেশনাশিনী।"

—কোন্ দেশে ক্লেশনাশিনী বৈদেহী গিয়াছেন—তাহা বুঝিতে পারিলাম না।—

"নৈতাং পশ্যামি তীর্থেষু, ক্রোশতো ন শৃণোতি মে।"

—গোদাবরীর অবতরণ-স্থানসমূহের কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না—ডাকিলাম, কোন উত্তর পাইলাম না।

"লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা দীনঃ সন্তাপমোহিতঃ।
রামঃ সমভিচক্রাম স্বয়ং গোদাবরীং নদীম্॥"

—লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া ম্রিয়মাণচিত্তে রাম স্বয়ং সেই গোদাবরীর অভিমুখে ছুটিয়া গেলেন।

ভ্রাতার এই উদ্দাম শোক দেখিয়া লক্ষ্মণ যেরূপ কষ্ট পাইতে-ছিলেন, তাহা অননুভবনীয়। কত করিয়া তিনি রামকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছেন, রাম কিছুতেই শান্ত হইতেছেন না; লক্ষ্মণের কণ্ঠলগ্ন হইয়া রাম বার বার বলিতেছেন—

"হা লক্ষ্মণ মহাবাহো পশ্যসি ত্বং প্রিয়াং ক্বচিৎ।"

—লক্ষ্মণ, তুমি কি সীতাকে কোথাও দেখিতে পাইতেছ? এই শোকাকুল কণ্ঠের আর্ত্তিতে লক্ষ্মণের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিত, তাঁহার মুখ শুকাইয়া যাইত।

দনু নামক শাপগ্রস্ত যক্ষের নির্দ্দেশানুসারে রাম লক্ষ্মণের সহিত পম্পাতীরে সুগ্রীবের সন্ধানে গেলেন। রাম কখনও বেগে পথ পর্য্যটন করেন, কখনও মূর্চ্ছিত হইয়া বসিয়া পড়েন, কখনও "সীতা সীতা" বলিয়া আকুলকণ্ঠে ডাকিতে থাকেন, কখনও "হা দেবি, একবার এস, তোমার শূন্য পর্ণশালার অবস্থা দেখিয়া যাও"—এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিলুপ্তসংজ্ঞ হইয়া পড়েন, কখনও পম্পানীরবর্ত্তি-পদ্মকোষ-নিষ্ক্রান্ত-পবনস্পর্শে উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠেন,—

"নিঃশ্বাস ইব সীতায়া বাতি বায়ুর্মনোহরঃ।"

সজলনেত্রে চিরসুহৃৎ চিরসেবক লক্ষ্মণ রামকে এই অবস্থায় যখন পম্পাতীরে লইয়া আসিলেন, তখন হনুমান্ সুগ্রীবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হনুমান্ সম্ভ্রম ও আদরের সহিত বলিলেন, "আপনারা

পৃথিবীজয়ের শক্তিসম্পন্ন, আপনারা চীর ও বল্কল ধারণ করিয়াছেন কেন? আপনাদের বৃত্তায়িত মহাবাহু সর্ব্বভূষণে ভূষিত হইবার যোগ্য, সে বাহু ভূষণহীন কেন?" এই আদরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া লক্ষ্মণের চিররুদ্ধ দুঃখ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। যিনি চিরদিন মৌনভাবে স্নেহার্দ্র হৃদয় বহন করিয়া আসিয়াছেন, আজ তিনি স্নেহের ছন্দ ও ভাষা রোধ করিতে পারিলেন না। পরিচয় প্রদানের পর তিনি বলিলেন—"দনুর নির্দ্দেশে আজ আমরা সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছি। যে রাম শরণাগতদিগকে অগণিত বিত্ত অকুণ্ঠিতচিত্তে দান করিয়াছেন, সেই জগৎপূজ্য রাম আজ বানরাধিপতির শরণ পাইবার জন্য এখানে উপস্থিত। ত্রিলোকবিশ্রুতকীর্ত্তি দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার গুরু রামচন্দ্র স্বয়ং বানরাধিপতির শরণ লইবার জন্য এখানে আসিয়াছেন। সর্ব্বলোক যাঁহার আশ্রয়লাভে কৃতার্থ হইত, যিনি প্রজাপুঞ্জের রক্ষক ও পালক ছিলেন, আজ তিনি আশ্রয়ভিক্ষা করিয়া সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত। তিনি শোকাভিভূত ও আর্ত্ত, সুগ্রীব অবশ্যই প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে শরণ দান করিবেন।"—বলিতে বলিতে লক্ষ্মণের চিরনিরুদ্ধ অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তিনি কাঁদিয়া মৌনী হইলেন। রামের দুরবস্থাদর্শনে লক্ষ্মণ একান্তরূপে অভিভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার দৃঢ়চরিত্র আর্দ্র ও করুণ হইয়া পড়িয়াছিল।

এই নিত্য-দুঃখসহায় ভৃত্য, সখা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামের প্রাণপ্রিয় ছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। অশোকবনে হনুমানের নিকট সীতা বলিয়াছিলেন, "ভ্রাতা লক্ষ্মণ আমা অপেক্ষা রামের নিয়ত প্রিয়তর।" রাবণের শেলে বিদ্ধ লক্ষ্মণ যে দিন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিলেন, সে দিন আমরা দেখিতে পাই, আহত

শাবককে ব্যাঘ্রী যেরূপ রক্ষা করে, রাম কনিষ্ঠকে সেইরূপ আগুলিয়া বসিয়া আছেন;—রাবণের অসংখ্য শর রামের পৃষ্ঠদেশ ছিন্ন ভিন্ন করিতেছিল, সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া রাম লক্ষ্মণের প্রতি সজল চক্ষু ন্যস্ত করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতেছিলেন। বানরসৈন্য লক্ষ্মণের রক্ষাভার গ্রহণ করিলে তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং রাবণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া চলিয়া গেলে মৃতকল্প ভ্রাতাকে অতি সুকোমল-ভাবে আলিঙ্গন করিয়া রাম বলিলেন—"তুমি যেরূপ আমাকে বনে অনুগমন করিয়াছিলে, আজ আমিও তেমনি তোমাকে যমালয়ে অনুগমন করিব, তোমাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিতে পারিব না। সীতার মত স্ত্রী খুঁজিলে অনেক পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তোমার মত ভাই, মন্ত্রী ও সহায় পাওয়া যাইবে না। দেশে দেশে স্ত্রী ও বন্ধু পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এমন দেশ দেখিতে পাই না, যেখানে তোমার মত ভাই জুটিবে। এখন উঠ, নয়ন উন্মীলন করিয়া আমায় একবার দেখ; আমি পর্ব্বতে বা বন-মধ্যে শোকার্ত্ত, প্রমত্ত বা বিষণ্ণ হইলে, তুমিই প্রবোধবাক্যে আমায় সান্ত্বনা দিতে, এখন কেন এইরূপ নীরব হইয়া আছ?"

রামের আজ্ঞাপালনে লক্ষ্মণ কোন কালে দ্বিরুক্তি করেন নাই, ন্যায়সঙ্গত হউক বা না হউক, লক্ষ্মণ সর্ব্বদা মৌনভাবে তাহা পালন করিয়াছেন। রাম সীতাকে বিপুল সৈন্যসঙ্ঘের মধ্য দিয়া শিবিকা ত্যাগ করিয়া পদব্রজে আসিতে আজ্ঞা করিলেন। শত শত দৃষ্টির গোচরীভূত হইয়া সীতা লজ্জায় যেন মরিয়া যাইতেছিলেন, ব্রীড়া-ময়ীর সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছিল। লক্ষ্মণ এই দৃশ্য দেখিয়া ব্যথিত হইলেন, কিন্তু রামের কার্য্যের প্রতিবাদ করিলেন না। যখন সীতা অগ্নিতে প্রাণবিসর্জ্জন দিতে কৃতসঙ্কল্পা হইয়া লক্ষ্মণকে চিতা

প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন,—তখন লক্ষ্মণ রামের অভিপ্রায় বুঝিয়া সজলচক্ষে চিতা প্রস্তুত করিলেন, কিন্তু কোন প্রতিবাদ করিলেন না। ভ্রাতৃস্নেহে তিনি স্বীয় অস্তিত্বশূন্য হইয়া গিয়াছিলেন। ভরতের, এমন কি সীতারও, মৃদু অথচ তেজোব্যঞ্জক ব্যক্তিত্ব তাঁহাদের সুগভীর ভালবাসার মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, কিন্তু রামের প্রতি লক্ষ্মণের স্নেহ সম্পূর্ণরূপে আত্মহারা। ভরত রামচন্দ্রের জন্য যে সকল কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রাণে আঘাত দেয়—তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে ঐরূপ আত্মত্যাগ আমাদের নিকট অপূর্ব্ব পদার্থ বলিয়া বোধ হয়; ভরত স্বর্গের দেবতার ন্যায়, তাঁহার ক্রিয়াকলাপ ঠিক যেন পৃথিবীবাসীর নহে, উহা সর্ব্বদাই ভাবের এক উচ্চগ্রামে আমাদের মনোযোগ সবলে আকর্ষণ করিয়া রাখে। কিন্তু লক্ষ্মণের আত্মত্যাগ এত সহজভাবে হইয়া আসিয়াছে, উহা বায়ু ও জলের মত এত সহজপ্রাপ্য যে, অনেক সময়ে ভরতের আত্মত্যাগের পার্শ্বে লক্ষ্মণের খনিত্রদ্বারা মৃত্তিকাখনন প্রভৃতি সেবাবৃত্তির মধ্যে আমরা তাঁহার সুগভীর প্রেমের গুরুত্ব অনুভব করিতে ভুলিয়া যাই। অত্যন্ত সহজে প্রাপ্ত বলিয়া যেন উহা উপেক্ষা পাইয়া থাকে। তথাপি ইহা স্থির যে, লক্ষ্মণ ভিন্ন রামকে আমরা একেবারেই কল্পনা করিতে পারি না। তিনি রামের প্রাণ ও দেহের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছিলেন। দীর্ঘ রজনীর পরে অকস্মাৎ তরুণ অরুণালোকে যেরূপ জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে,—ধরাবাসিগণ সেই স্বর্গভ্রষ্ট আলোকচ্ছটায় পুলকে উন্মত্ত হইয়া উঠে, ভরতের ভ্রাতৃপ্রীতি কতকটা সেইরূপ,—কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্র ও রামবনবাসাদির পরে ভরতের অচিন্তিতপূর্ব্ব প্রীতি বিচ্ছুরিত হইয়া আমাদিগকে সহসা সেইরূপ চমৎকৃত করিয়া

তুলে, আমরা ঠিক যেন ততটা প্রত্যাশা করি না! কিন্তু লক্ষ্মণের প্রেম আমাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় বায়ুপ্রবাহ, এই বিশাল অপরিসীম স্নেহতরঙ্গ আমাদিগকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, অথচ প্রতিক্ষণে আমরা ইহা ভুলিয়া যাইতেছি। লক্ষ্মণ রামকে বলিয়াছিলেন—"জল হইতে উদ্ধৃত মীনের ন্যায় আপনাকে ছাড়িয়া আমি এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারিব না।" এই অসীম স্নেহের তিনি কোন মূল্য চান নাই, ইহা আপনিই আপনার পরম পরিতোষ, ইহা আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ, ইহা প্রত্যাশী নহে, ইহা দাতা। কখন বহুকৃচ্ছ্র সাধনে অবসন্ন লক্ষ্মণকে রাম একটী স্নেহের কথা বলিয়াছেন, কিংবা একবার আলিঙ্গন দিয়াছেন, লক্ষ্মণের নেত্রপ্রান্তে একটী পুলকাশ্রু ফুটিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু তিনি রামের কাছে তাহা প্রত্যাশা করিয়া অপেক্ষা করেন নাই।

লক্ষ্মণের চরিত্রের এক দিক্ মাত্র প্রদর্শিত হইল, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের আর একটা দিক্ আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, লক্ষ্মণ বিশেষ তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন ছিলেন না। তিনি অনুগত ভ্রাতা ছিলেন সত্য, কিন্তু হয়ত রাম ভিন্ন তাঁহার পক্ষে নিজেকে হারাইয়া ফেলিবার আশঙ্কা ছিল। চিরদিন রামের বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিয়াছেন, সহসা একাকী সংসারের পথ পর্য্যটন করা তাঁহার পক্ষে দুরূহ হইত, এইজন্যই তিনি রামগতপ্রাণ হইয়া বনগমন করিয়াছিলেন। এ কথা ত মানিবই না, বরং ভাল করিয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, লক্ষ্মণই রামায়ণে পুরুষকারের একমাত্র জীবন্ত চিত্র। তাঁহার বুদ্ধির সঙ্গে রামের বুদ্ধির যে সর্ব্বদাই ঐক্য হইয়াছে, তাহা নহে, পরন্তু যে স্থানে ঐক্য না হইত, সে স্থানে

তিনি স্বীয় বুদ্ধিকে রামের প্রতিভার নিকট হতবল হইতে দেন নাই।

বনবাসাজ্ঞা তাঁহার নিকট অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া বোধ হইয়াছিল এবং রামের পিতৃ-আদেশ-পালন তিনি ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। রাম লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন, "তুমি কি এই কার্য্য দৈবশক্তির ফল বলিয়া স্বীকার করিবে না? আরব্ধ কার্য্য নষ্ট করিয়া যদি কোন অসঙ্কল্পিত পথে কার্য্যপ্রবাহ প্রবর্ত্তিত হয়, তবে তাহা দৈবের কর্ম্ম বলিয়া মনে করিবে। দেখ, কৈকেয়ী চিরদিনই আমাকে ভরতের ন্যায় ভালবাসিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় গুণশালিনী মহৎকুলজাতা রাজপুত্রী আমাকে পীড়াদান করিবার জন্য ইতর ব্যক্তির ন্যায় এইরূপ প্রতিশ্রুতিতে রাজাকে কেনই বা আবদ্ধ করিবেন? ইহা স্পষ্ট দৈবের কর্ম্ম, ইহাতে মানুষের কোন হাত নাই।" লক্ষ্মণ উত্তরে বলিলেন, "অতি দীন ও অশক্ত ব্যক্তিরাই দৈবের দোহাই দিয়া থাকে, পুরুষকার-দ্বারা যাঁহারা দৈবের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন, তাঁহারা আপনার ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়েন না। মৃদু ব্যক্তিরাই সর্ব্বদা নির্য্যাতন প্রাপ্ত হন—'মৃদুর্হি পরিভূয়তে।' ধর্ম্ম ও সত্যের ভান করিয়া পিতা যে ঘোরতর অন্যায় করিতেছেন, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না? আপনি দেবতুল্য, ঋজু ও দান্ত এবং রিপুরাও আপনার প্রশংসা করিয়া থাকে। এমন পুত্রকে তিনি কি অপরাধে বনে তাড়াইয়া দিতেছেন? আপনি যে ধর্ম্ম পালন করিতে ব্যাকুল, ঐ ধর্ম্ম আমার নিকট নিতান্ত অধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়। স্ত্রীর বশীভূত হইয়া নিরপরাধ পুত্রকে বনবাস দেওয়া—ইহাই কি সত্য, ইহাই কি ধর্ম্ম? আমি আজই বাহুবলে আপনার অভিষেক সম্পাদন

করিব। দেখি, কাহার সাধ্য আমার শক্তি প্রতিরোধ করে? আজ পুরুষকারের অঙ্কুশ দিয়া উদ্দাম দৈবহস্তীকে আমি স্ববশে আনিব। যাহা আপনি দৈবসংজ্ঞায় অভিহিত করিতেছেন, তাহা আপনি অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তবে কি নিমিত্ত তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর দৈবের প্রশংসা করিতেছেন?" সাশ্রুনেত্র লক্ষ্মণ এই সকল উক্তির পর—

"হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয়্যাসক্তমানসম্।"

বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। রাম তখন হস্তধারণ করিয়া তাঁহার ক্রোধপ্রশমনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এই গর্হিত আদেশ-পালন যে ধর্ম্মসঙ্গত, ইহা তিনি কোন ক্রমেই লক্ষ্মণকে বুঝাইতে পারেন নাই। লঙ্কাকাণ্ডে মায়াসীতার মস্তক দর্শনে শোকাকুল রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণ বলিয়াছিলেন—"হর্ষ, কাম, দর্প, ক্রোধ, শান্তি ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ,—এই সমস্তই অর্থের আয়ত্ত। আমার এই মত, ইহাই ধর্ম্ম; কিন্তু আপনি সেই অর্থমূলক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সমূলে ধর্ম্মলোপ করিয়াছেন। আপনি পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বনবাসী হওয়াতেই আপনার প্রাণাধিকা পত্নীকে রাক্ষসেরা অপহরণ করিয়াছে।" এই প্রখর ব্যক্তিত্বশালী যুবক শুধু স্নেহগুণেই একান্ত-রূপে ব্যক্তিত্বহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন!

ভরতের চরিত্র রমণীজনোচিত কোমল মধুরতায় ভূষিত, উহা সাত্ত্বিক বৃত্তির উপর অধিষ্ঠিত। রামের মত বলশালী চরিত্র রামায়ণে আর নাই, কিন্তু সময়-বিশেষে রাম দুর্ব্বল ও মৃদুভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। রামচরিত্র বড় জটিল। কিন্তু লক্ষ্মণের চরিত্রে আগুন্ত পুরুষকারের মহিমা দৃষ্ট হয়। উহাতে ভরতের মত করুণ রসের স্নিগ্ধতা ও স্ত্রীলোকসুলভ খেদমুখর কোমলতা নাই। উহা

সতত দৃঢ়, পুরুষোচিত ও বিপদে নির্ভীক। লক্ষ্মণ অবস্থার কোন বিপর্য্যয়েই নমিত হইয়া পড়েন নাই। বিরাট্‌ রাক্ষসের হস্তে সীতাকে নিঃসহায়ভাবে পতিত দেখিয়া রামচন্দ্র "হায়, আজ মাতা কৈকেয়ীর আশা পূর্ণ হইল" বলিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণ ভ্রাতাকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় নিঃশ্বাসত্যাগ করিয়া বলিলেন, "ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রান্ত হইয়া আপনি কেন অনাথের ন্যায় পরিতাপ করিতেছেন? আসুন, আমরা রাক্ষসকে বধ করি।"

শেলবিদ্ধ লক্ষ্মণ পুনর্জীবন লাভ করিয়া যখন দেখিতে পাইলেন, রাম তাঁহার শোকে অধীর হইয়া সজলচক্ষে স্ত্রীলোকের মত বিলাপ করিতেছেন, তখন তিনি সেই কাতর অবস্থাতেই রামকে এইরূপ পৌরুষহীন মোহপ্রাপ্তির জন্য তিরস্কার করিয়াছিলেন। বিরহের অবস্থায় রামের একান্ত বিহ্বলতা দেখিয়া তিনি ব্যথিতচিত্তে রামকে কত উপদেশ দিয়াছেন—তাহা একদিকে যেমন সুগভীর ভালবাসা-ব্যঞ্জক,—অপরদিকে সেইরূপ তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তাসূচক। "আপনি উৎসাহশূন্য হইবেন না," "আপনার এরূপ দৌর্ব্বল্য-প্রদর্শন উচিত নহে," "পুরুষকার অবলম্বন করুন" ইত্যাদিরূপ নানাবিধ স্নেহের গঞ্জনা করিয়া তিনি একদিন বলিয়াছিলেন,—"দেবগণের অমৃতলাভের ন্যায় বহু তপস্যা ও কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া মহারাজ দশরথ আপনাকে লাভ করিয়াছিলেন, সে সকল কথা আমি ভরতের মুখে শুনিয়াছি—আপনি তপস্যার ফলস্বরূপ। যদি বিপদে পড়িয়া আপনার ন্যায় ধর্ম্মাত্মা সহ্য করিতে না পারেন, তবে অল্পসত্ত্ব ইতর ব্যক্তিরা কিরূপে করিবে?"

রামের প্রতি জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক, যে কেহ অন্যায় করিয়াছে, লক্ষ্মণ তাহা ক্ষমা করেন নাই, এ কথা পূর্ব্বেই

বলিয়াছি। দশরথের গুণরাশি তাঁহার সমস্তই বিদিত ছিল, ক্রোধের উত্তেজনায় তিনি যাহাই বলুন না কেন, দশরথ যে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন, এ কথাও তিনি পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি দশরথকে মনে মনে ক্ষমা করেন নাই। সুমন্ত্র বিদায়কালে যখন লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমার, পিতৃসকাশে আপনার কিছু বক্তব্য আছে কি?" তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, "রাজাকে বলিও, রামকে তিনি কেন বনে পাঠাইলেন, নিরপরাধ জ্যেষ্ঠপুত্রকে কেন পরিত্যাগ করিলেন, তাহা আমি বহু চিন্তা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই। আমি মহারাজের চরিত্রে পিতৃত্বের কোন নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি না। আমার ভ্রাতা, বন্ধু, ভর্ত্তা ও পিতা সকলই রামচন্দ্র।"—

"অহং তাবন্মহারাজে পিতৃত্বং নোপলক্ষয়ে।
ভ্রাতা ভর্ত্তা চ বন্ধুশ্চ পিতা চ মম রাঘবঃ॥"

ভরতের প্রতি তাঁহার গভীর সন্দেহ ছিল। কৈকেয়ীর পুত্র ভরত যে মাতার ভাবে অনুপ্রাণিত হইবেন, এ সম্বন্ধে তাঁহার অটল ধারণা ছিল, কেবল রামের ভর্ৎসনার ভয়ে তিনি ভরতের প্রতি কঠোরবাক্যপ্রয়োগে নিবৃত্ত থাকিতেন। কিন্তু যখন জটাবদ্ধকেশ-কলাপ অনশনক্লশ ভরত রামের চরণপ্রান্তে পড়িয়া ধূলিলুণ্ঠিত হইলেন, তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সলজ্জ স্নেহ-পরিতাপে ম্রিয়মাণ হইলেন। একদিন শীতকালের রাত্রে বড় তুষার পড়িতেছিল, শীতাধিক্যে পক্ষিগণ কুলায়ে গুণ্ঠিত হইয়াছিল, ভরতের জন্য সেই সময় লক্ষ্মণের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তিনি রামকে বলিলেন—"এই তীব্র শীত সহ্য করিয়া ধর্ম্মাত্মা ভরত আপনার ভক্তির তপস্যা পালন করিতেছেন। রাজ্য, ভোগ, মান, বিলাস

সমস্ত ত্যাগ করিয়া নিয়তাহারী ভরত এই বিষম শীতকালের রাত্রিতে মৃত্তিকায় শয়ন করিতেছেন। পারিব্রজ্যের নিয়ম পালন করিয়া প্রত্যহ শেষরাত্রিতে ভরত সরযূতে অবগাহন করিয়া থাকেন। চিরসুখোচিত রাজকুমার শেষরাত্রের তীব্র শীতে কিরূপে সরযূতে স্নান করেন!" এই লক্ষ্মণই পূর্ব্বে—

"ভরতস্য বধে দোষং নাহং পশ্যামি কঞ্চন"

বলিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে দিন বুঝিতে পারিলেন, তিনি বনে বনে ঘুরিয়া রামের যেরূপ সেবায় নিরত, অযোধ্যার মহাসমৃদ্ধির মধ্যে বাস করিয়াও ভরত রামভক্তিতে সেইরূপ কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছেন, সেই দিন হইতে তাঁহার স্বর এইরূপ স্নেহার্দ্র ও বিনম্র হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তিনি কৈকেয়ীকে কখনই ক্ষমা করেন নাই; রামের নিকট একদিন বলিয়াছিলেন—"দশরথ যাঁহার স্বামী, সাধু ভরত যাঁহার পুত্র, সেই কৈকেয়ী এরূপ নিষ্ঠুর হইলেন কেন?"

রামায়ণে লক্ষ্মণের মত পুরুষকারের উজ্জ্বল চিত্র আর দ্বিতীয় নাই। ইনি সতত নির্ভীক, বিপদে অকুণ্ঠিত, স্বীয় ক্ষুরধার তীক্ষ্ণবুদ্ধি সত্ত্বেও ভ্রাতৃস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিতান্ত বিপদেও তাঁহার কণ্ঠস্বর স্ত্রীলোকের ন্যায় কোমল হইয়া পড়ে নাই। যখন তিনি কবন্ধের বিশালহস্তের সম্পূর্ণরূপ আয়ত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন রামের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এইমাত্র তিনি বলিয়াছিলেন—"দেখুন, আমি রাক্ষসের অধীন হইয়া পড়িতেছি, আপনি আমাকে বলিস্বরূপ রাক্ষসের হস্তে প্রদান করিয়া পলায়ন করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি সীতাকে শীঘ্র ফিরিয়া পাইবেন। তাঁহাকে লাভ করিয়া পৈতৃক

রাজ্যে পুনরধিষ্ঠিত হইয়া আমাকে স্মরণ রাখিবেন।” এই কথায় বিলাপের ছন্দ নাই। ইহাতে রামের প্রতি অসীম প্রীতি ও স্বীয় আত্মোৎসর্গের অতুল্য ধৈর্য্য সূচিত হইয়াছে।

ক্ষাত্রতেজের এই জলন্ত মূর্ত্তি, এই মৌন ভ্রাতৃভক্তির আদর্শ ভারতে চিরদিন পূজা পাইয়া আসিয়াছেন। “রাম-সীতা” এই কথা অপেক্ষাও বোধ হয় “রাম-লক্ষ্মণ” এই কথা এতদ্দেশে বেশী পরিচিত। সৌভ্রাত্রের কথা মনে হইলে “লক্ষ্মণ” অপেক্ষা প্রশংসার্হ উপমা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। ভরত ভ্রাতৃভক্তির পলান্ন,—সুকোমল ভাবের সমৃদ্ধ উদাহরণ। কিন্তু লক্ষ্মণ ভ্রাতৃভক্তির অন্নব্যঞ্জন,—জীবিকার সংস্থান। আজ আমরা স্বেচ্ছায় আমাদের গৃহগুলিকে লক্ষ্মণ-শূন্য করিতেছি। আজ বহুস্থানে সহধর্ম্মিণীর স্থলে স্বার্থরূপিণী, অলঙ্কারপেটিকার যক্ষীগণ আমাদিগকে ঘিরিয়া গৃহে একাধিপত্য স্থাপন করিতেছে; যাঁহারা এক উদরে স্থান পাইয়াছিলেন, তাঁহারা আজ এক গৃহে স্থান পাইতেছেন না! হায়, কি দৈববিড়ম্বনা, যাঁহাদিগকে বিশ্বনিয়ন্তা মাতৃগর্ভ হইতে পরম সুহৃদ্‌রূপে গড়িয়া দিয়া আমাদিগকে প্রকৃত সৌহার্দ্দ শিখাইবেন, তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া পঞ্জাব ও পুণা হইতে আমরা সুহৃৎ সংগ্রহ করিব, এ কথা কি বিশ্বাস্য? আজ আমাদের রাম বনবাসী, লক্ষ্মণ প্রাসাদশীর্ষ হইতে সেই দৃশ্য উপভোগ করেন; আজ লক্ষ্মণের অন্ন জুটিতেছে না, রাম স্বর্ণ-থালে উপাদেয় আহার করিতেছেন। আজ আমাদের কষ্ট, দৈন্য, বনবাসের দুঃখ সমস্তই দ্বিগুণতর পীড়াদায়ক,—লক্ষ্মণগণকে আমাদের দুঃখের সহায় ও চিরসঙ্গী মনে ভাবিতে ভুলিয়া যাইতেছি। হে ভ্রাতৃবৎসল, মহর্ষি বাল্মীকি তোমাকে আঁকিয়া গিয়াছেন—চিত্র হিসাবে নহে; হিন্দুর

গৃহ-দেবতাস্বরূপ তুমি এ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলে। আবার তুমি হিন্দুর ঘরে ফিরিয়া এস,—সেই প্রিয়-প্রসঙ্গ-মুখরিত এক গৃহে একত্র বসিয়া আহার করি, স্বর্গ হইতে আমাদের মাতারা সেই দৃশ্য দেখিয়া আশিস্ বর্ষণ করিবেন। আমাদের দক্ষিণবাহু অভিনব-বলদৃপ্ত হইয়া উঠিবে—আমরা এ দুর্দ্দিনের অন্ত দেখিতে পাইব।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

শ্রীকান্তের নিশীথ অভিযান

কয়েক মুহূর্ত্তেই ঘনান্ধকারে সম্মুখ এবং পশ্চাৎ লেপিয়া একাকার হইয়া গেল। রহিল শুধু দক্ষিণ ও বামে সীমান্তরাল-প্রসারিত বিপুল উদ্দাম জলস্রোত এবং তাহারই উপর তীব্র-গতিশীলা এই ক্ষুদ্র তরণীটী এবং কিশোরবয়স্ক দু'টী বালক। প্রকৃতিদেবীর সেই অপরিমেয় গম্ভীর রূপ উপলব্ধি করিবার বয়স তাহা নহে, কিন্তু সে কথা আমি আজও ভুলিতে পারি নাই। বায়ুলেশহীন, নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ নিশীথিনীর সে যেন এক বিরাট্ কালীমূর্ত্তি। নিবিড় কালো চুলে দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছন্ন হইয়া গেছে, এবং সেই সূচিভেদ্য অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া করাল দংষ্ট্রারেখার ন্যায় দিগন্তবিস্তৃত এই তীব্র জলধারা হইতে কি এক প্রকারের অপরূপ স্তিমিত দ্যুতি নিষ্ঠুর চাপা হাসির মত বিচ্ছুরিত হইতেছে। আশে পাশে সম্মুখে কোথায় বা উন্মত্ত জলস্রোত গভীর তলদেশে ঘা খাইয়া উপরে উঠিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে, কোথায় বা প্রতিকূল গতি পরস্পরের সংঘাতে আবর্ত্ত রচিয়া পাক খাইতেছে, কোথাও বা অপ্রতিহত জলপ্রবাহ পাগল হইয়া ধাইয়া চলিয়াছে।

আমাদের নৌকা কোণাকুণি পাড়ি দিতেছে, এইমাত্র বুঝিয়াছি। কিন্তু পরপারের ঐ দুর্ভেদ্য অন্ধকারের কোন্‌খানে যে লক্ষ্য স্থির করিয়া ইন্দ্র হাল ধরিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছে, তাহার কিছুই জানি না। এই বয়সেই সে যে কত বড় পাকা

মাঝি, তখন তাহা বুঝি নাই। হঠাৎ সে কথা কহিল—"কিরে, শ্রীকান্ত, ভয় করে?"

আমি বলিলাম, "নাঃ—"

ইন্দ্র খুসি হইয়া কহিল, "এই ত চাই—সাঁতার জান্‌লে আবার ভয় কিসের!" প্রত্যুত্তরে আমি শুধু একটী ছোট্ট নিঃশ্বাস চাপিয়া ফেলিলাম—পাছে সে শুনিতে পায়। কিন্তু এই গাঢ় অন্ধকার রাত্রিতে, এই জলরাশি এবং এই দুর্জ্জয় স্রোতের সঙ্গে সাঁতার জানা এবং না-জানার পার্থক্য যে কি, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। সেও আর কোন কথা কহিল না। বহুক্ষণ এইভাবে চলার পরে কি একটা যেন শোনা গেল—অস্ফুট এবং ক্ষীণ; কিন্তু নৌকা যত অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই সে শব্দ স্পষ্ট এবং প্রবল হইতে লাগিল। যেন বহুদূরাগত কাহাদের ক্রুদ্ধ আহ্বান। যেন কত বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়া ডিঙাইয়া সে আহ্বান আমাদের কানে আসিয়া পৌছিয়াছে—এম্‌নি শ্রান্ত, অথচ বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই—ক্রোধ যেন তাহাদের কমেও না, বাড়েও না—থামিতেও চাহে না। মাঝে-মাঝে এক একবার ঝুপ্-ঝাপ শব্দ। জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইন্দ্র, ও কিসের আওয়াজ শোনা যায়?" সে নৌকার মুখটা আর একটু সোজা করিয়া দিয়া কহিল, "জলের স্রোতে ও-পারের বালির পাড় ভাঙার শব্দ।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কত বড় পাড়? কেমন স্রোত?"

"সে ভয়ানক স্রোত। ওঃ, তাইত কালো জল হয়ে গেছে, আজ ত তার তলা দিয়ে যাওয়া যাবে না। একটা পাড় ভেঙ্গে পড়্‌লে ডিঙি শুদ্ধ আমরা সব গুঁড়িয়ে যাব। তুই দাঁড় টান্‌তে পারিস্?"

"পারি।"

"তবে টান্।"

আমি টানিতে সুরু করিলাম। ইন্দ্র কহিল, "উই—উই যে কালো মত বাঁ-দিকে দেখা যায়, ওটা চড়া। ওরি মধ্যে দিয়ে একটা খালের মত আছে, তারি ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে—কিন্তু খুব আস্তে—জেলেরা টের পেলে আর ফিরে আস্‌তে হবে না। লগির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে পাঁকে পুতে দেবে।"

এ আবার কি কথা!. সভয়ে বলিলাম, "তবে, ওর ভেতর দিয়ে নাই গেলে!" ইন্দ্র বোধ করি একটু হাসিয়া কহিল, "আর ত পথ নেই। এর মধ্যে দিয়ে যেতেই হবে। বড় চড়ার বাঁ-দিকের রেত ঠেলে জাহাজ যেতে পারে না—আমরা যাব কি ক'রে? ফিরে আস্‌তে পারা যাবে, কিন্তু যাওয়া যাবে না।"

"তবে মাছ চুরি ক'রে কাজ নেই ভাই" বলিয়াই আমি দাঁড় তুলিয়া ফেলিলাম। চক্ষের পলকে নৌকা পাক খাইয়া পিছাইয়া গেল। ইন্দ্র বিরক্ত হইয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া তর্জ্জন করিয়া উঠিল, "তবে এলি কেন? চল্—তোকে ফিরে রেখে আসি—কাপুরুষ!" তখন চৌদ্দ পার হইয়া পনরয় পড়িয়াছি—আমাকে কাপুরুষ? ঝপাৎ করিয়া দাঁড় জলে ফেলিয়া প্রাণপণে টান দিলাম। ইন্দ্র খুসি হইয়া বলিল, "এই ত চাই। কিন্তু আস্তে ভাই—ব্যাটারা ভারি পাজী। আমি ঝাউবনের পাশ দিয়ে মকাক্ষেতের ভেতর দিয়ে এম্‌নি বার ক'রে নিয়ে যাব যে, শালারা টেরও পাবে না।" একটু হাসিয়া কহিল, "আর টের পেলেই বা কি? ধরা কি মুখের কথা! ত্যাখ্ শ্রীকান্ত, কিচ্ছু ভয় নেই—ব্যাটাদের চার-খানা ডিঙি আছে বটে—কিন্তু, যদি দেখিস্ ঘিরে ফেল্‌লে ব'লে—আর

পালাবার জো নেই, তখন ঝুপ ক'রে লাফিয়ে প'ড়ে একডুবে যতদূর পারিস্ গিয়ে ভেসে উঠ্‌লেই হ'ল। এ অন্ধকারে আর দেখ্‌বার জোটী নেই—তারপর মজা ক'রে সতুয়ার চড়ায় উঠে ভোরবেলায় সাঁত্‌রে এ-পারে এসে গঙ্গার ধারে ধারে বাড়ী ফিরে গেলেই বাস্! কি কর্‌বে ব্যাটারা?"

চড়াটার নাম শুনিয়াছিলাম; কহিলাম, "সতুয়ার চড়া ত ঘোর নালার সম্মুখে, সে ত অনেক দূর!" ইন্দ্র তাচ্ছল্যভরে কহিল, "কোথায় অনেক দূর? ৬।৭ কোশও হবে না বোধ হয়। হাত ভেরে গেলে চিত হয়ে থাক্‌লেই হ'ল—তা ছাড়া, মড়া-পোড়ানো বড়-বড় গুঁড়ি কত ভেসে যাবে দেখ্‌তে পাবি।"

আত্মরক্ষার যে সোজা রাস্তা সে দেখাইয়া দিল, তাহাতে প্রতিবাদের আর কিছু রহিল না। এই দিক্-চিহ্নহীন অন্ধকার নিশীথে আবর্ত্তসঙ্কুল গভীর তীব্র জলপ্রবাহে সাত ক্রোশ ভাসিয়া গিয়া ভোরের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকা। ইহার মধ্যে আর এদিকের তীরে উঠিবার জো নাই। দশ পনর হাত খাড়া উচু বালির পাড় মাথায় ভাঙিয়া পড়িবে—এই দিকেই গঙ্গার ভীষণ ভাঙন ধরিয়া জলস্রোত অর্দ্ধবৃত্তাকারে ছুটিয়া চলিয়াছে!

বস্তুটা অস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াই আমার বীর-হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া বিন্দুবৎ হইয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ দাঁড় টানিয়া বলিলাম, "কিন্তু আমাদের ডিঙির কি হবে?"

ইন্দ্র কহিল, "সে দিন ত আমি ঠিক এমনি ক'রেই পালিয়েছিলাম। তার পর দিন এসে ডিঙি কেড়ে নিয়ে গেলাম—বল্‌লাম, নৌকা ঘাট থেকে চুরি ক'রে আর কেউ এনেছিল—আমি নয়।"

তবে, এ সকল এর কল্পনা নয়—একেবারে হাতে-নাতে প্রত্যক্ষ করা সত্য! ক্রমশঃ ডিঙি খাঁড়ির সম্মুখীন হইলে দেখা গেল, জেলেদের নৌকাগুলা সারি দিয়া খাঁড়ির মুখে বাঁধা আছে—মিট্-মিট্ করিয়া আলো জ্বলিতেছে। দুইটা চড়ার মধ্যবর্ত্তী এই জলপ্রবাহটা খালের মত হইয়া প্রবাহিত হইতেছিল। ঘুরিয়া তাহার অপর পারে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

সে স্থানটায় জলের বেগে অনেকগুলা মোহনার মত হইয়াছে এবং সব কয়টাকেই বুনো ঝাঁউ গাছে একটা হইতে আর একটাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। একটার ভিতর দিয়া খানিকটা বাহিয়া গিয়াই আমরা খালের মধ্যে পড়িলাম। জেলেদের নৌকাগুলা তখন অনেকটা দূরে কালো-কালো ঝোপের মত দেখাইতেছে। আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছান গেল।

ধীবর-প্রভুরা খালের সিংহদ্বার আগুলিয়া আছে মনে করিয়া এ স্থানটায় পাহারা রাখে নাই। ইহাকে মায়াজাল বলে। খালে যখন জল থাকে না, তখন এ-ধার হইতে ও-ধার পর্য্যন্ত উচু উচু কাঠি শক্ত করিয়া পুতিয়া দিয়া তাহারই বহির্দ্দিকে জাল টাঙাইয়া রাখে। পরে বর্ষার জলস্রোতে বড়-বড় রুই-কাত্‌লা ভাসিয়া আসিয়া এই কাঠিতে বাধা পাইয়া লাফাইয়া এদিকে পড়িতে চায় এবং দড়ির জালে আবদ্ধ হইয়া থাকে।

দশ, পনর, বিশ সের রুই-কাত্‌লা গোটা পাঁচ ছয় ইন্দ্র চক্ষের নিমিষে নৌকায় তুলিয়া ফেলিল। সেই বিরাট্‌কায় মৎস্যরাজেরা তখন পুচ্ছতাড়নায় ক্ষুদ্র ডিঙিখানা যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবার উপক্রম করিতে লাগিল; এবং তাহার শব্দও বড় কম হইল না।

"এত মাছ কি হবে ভাই ?"

"কাজ আছে। আর না, পালাই চল্।" বলিয়া সে জাল ছাড়িয়া দিল। আর দাঁড় টানিবার প্রয়োজন নাই। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তখন, তেম্‌নি গোপনে আবার সেই পথেই বাহির হইতে হইবে। অনুকূল স্রোতে মিনিট দুই তিন খরবেগে ভাঁটাইয়া আসিয়া হঠাৎ এক স্থানে একটা দমক্ মারিয়া যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র ডিঙিটী পাশের ভুট্টা-ক্ষেতের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। তাহার এই আকস্মিক গতি-পরিবর্ত্তনে আমি চকিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "কি ? কি হ'ল ?" ইন্দ্র আর একটা ঠেলা দিয়া নৌকাখানা আরও খানিকটা ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া কহিল, "চুপ্। শালারা টের পেয়েছে—চারখান ডিঙি খুলে দিয়েই এদিকে আস্‌ছে—ঐ ত্যাখ্।" তাই ত বটে। প্রবল জলতাড়নার ছপাছপ্ শব্দ করিয়া তিনখানা নৌকা আমাদের গিলিয়া ফেলিবার জন্য যেন কৃষ্ণকায় দৈত্যের মত ছুটিয়া আসিতেছে। ওদিকে জাল দিয়া বন্ধ, সুমুখে ইহারা—পলাইয়া নিষ্কৃতি পাইবার এতটুকু স্থান নাই। এই ভুট্টা-ক্ষেতের মধ্যেই যে আত্ম-গোপন করা চলিবে, তাহাও সম্ভব মনে হইল না।

"কি হবে ভাই ?" বলিতে বলিতেই অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাসে আমার কণ্ঠনালী রুদ্ধ হইয়া গেল। এই অন্ধকারে এই ফাঁদের মধ্যে খুন করিয়া এই ক্ষেতের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিলেই বা কে নিবারণ করিবে ?

ইতিপূর্ব্বে পাঁচ ছয় দিন ইন্দ্র 'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা' সপ্রমাণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান করিয়াছে, এত দিন ধরা পড়িয়াও পড়ে নাই, কিন্তু আজ ?

সে মুখে একবার বলিল, "ভয় নাই।" কিন্তু গলাটা তাহার যেন কাঁপিয়া গেল। কিন্তু সে থামিল না। প্রাণপণে লগি ঠেলিয়া ক্রমাগত ভিতরে লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সমস্ত চড়াটা জলে জলময়। তাহারই উপর ৮।১০ হাত দীর্ঘ ভুট্টা এবং জনারের গাছ। ভিতরে এই দু'টী চোর। কোথাও জল একবুক, কোথাও এককোমর, কোথাও হাঁটুর অধিক নয়। উপরে নিবিড় অন্ধকার, সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। পাঁকে লগি পুতিয়া যাইতে লাগিল, নৌকা আর এক হাতও অগ্রসর হয় না। পিছন হইতে জেলেদের অস্পষ্ট কথাবার্ত্তা কানে আসিতে লাগিল। কিছু একটা সন্দেহ করিয়াই যে তাহারা আসিয়াছে এবং তখনও খুঁজিয়া ফিরিতেছে, তাহাতে লেশমাত্র সংশয় নাই।

সহসা নৌকাটা একটু কাত হইয়াই সোজা হইল। চাহিয়া দেখি, আমি একাকী বসিয়া আছি, দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। সভয়ে ডাকিলাম, "ইন্দ্র!" হাত পাঁচ ছয় দূরে বনের মধ্য হইতে সাড়া আসিল, "আমি নীচে।"

"নীচে কেন?"

"ডিঙি টেনে বার করতে হবে। আমার কোমরে দড়ি বাঁধা আছে।"

"টেনে কোথায় বার করবে?"

"ও গঙ্গায়। খানিকটা যেতে পারলেই বড় গাঙে প'ড়্ব।"

শুনিয়া চুপ করিয়া গেলাম। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অকস্মাৎ কিছুদূরে বনের মধ্যে ক্যানেস্তা পিটানো ও চেরা-বাঁশের কটাকট্ শব্দে চম্‌কাইয়া উঠিলাম। সভয়ে জিজ্ঞাসা

করিলাম, "ওকি ভাই ?" সে উত্তর দিল, "চাষীরা মাচার উপর ব'সে বুনো শূয়ার তাড়াচ্ছে।"

"বুনো শূয়ার! কোথায় সে ?" ইন্দ্র নৌকা টানিতে টানিতে তাচ্ছল্যভরে কহিল, "আমি কি দেখতে পাচ্ছি, যে ব'ল্‌ব! আছেই কোথাও এই খানে।" জবাব শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। ভাবিলাম কার মুখ দেখিয়া আজ প্রভাত হইয়াছিল! তথাপি আমি ত নৌকায় বসিয়া; কিন্তু, ঐ লোকটী একবুক কাদা ও জলের মধ্যে এই বনের ভিতরে। এক পা নড়িবার চড়িবার উপায় পর্য্যন্ত তাহার নাই। মিনিট পনর এইভাবে কাটিল। আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করিতেছিলাম। প্রায়ই দেখিতেছি, কাছাকাছি এক-একটা জনার বা ভুট্টা গাছের ডগা ভয়ানক আন্দোলিত হইয়া 'ছপাৎ' করিয়া শব্দ হইতেছে। একটা প্রায় আমার হাতের কাছেই। শঙ্কিত হইয়া সে দিকে ইন্দ্রের মনোযোগ আকৃষ্ট করিলাম।—ধাড়ী শূয়ার না হইলেও বাচ্চা-টাচ্চা নয় ত ?

ইন্দ্র অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, "ও কিছু না—সাপ জড়িয়ে আছে; তাড়া পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়্‌ছে।"

কিছু না—সাপ! শিহরিয়া নৌকার মাঝখানে জড়সড় হইয়া বসিলাম। অস্ফুটে কহিলাম, "কি সাপ, ভাই ?"

ইন্দ্র কহিল, "সব রকম আছে। ঢোঁড়া, বোড়া, গোখ্‌রো, করেত্—জলে ভেসে এসে গাছে জড়িয়ে আছে—কোথাও ডাঙা নেই, দেখ্‌ছিস্ নে ?"

সে ত দেখ্‌ছি। কিন্তু ভয়ে যে পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত আমার কাঁটা দিয়া রহিল। সে লোকটী কিন্তু ভ্রূক্ষেপমাত্র করিল না, নিজের কাজ করিতে করিতে বলিতে লাগিল—"কিন্তু,

কামড়ায় না। ওরা নিজেরাই ভয়ে মর্‌চে—দুটো-তিন্‌টে ত আমার গা-ঘেঁসে পালালো। এক-একটা মস্ত বড়—সেগুলো বোড়া-টোড়া হবে বোধ হয়। আর কাম্‌ড়ালেই বা কি কর্‌ব! মর্‌তে এক দিন ত হবেই ভাই!”—এম্‌নি আরও কত কি সে মৃদু স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিতে বলিতে চলিল, আমার কানে কতক পৌঁছিল, কতক পৌঁছিল না। আমি নির্ব্বাক্‌ নিস্পন্দ কাঠের মত আড়ষ্ট হইয়া একস্থানে একভাবে বসিয়া রহিলাম। নিঃশ্বাস ফেলিতেও যেন ভয় করিতে লাগিল—ছপাৎ করিয়া একটা যদি নৌকার উপরেই পড়ে!

কিন্তু সে যাই হোক্‌, ওই লোকটা কি! মানুষ? দেবতা? পিশাচ? কে ও? কার সঙ্গে এই বনের মধ্যে ঘুরিতেছি! যদি মানুষই হয়, তবে ভয় বলিয়া কোন বস্তু যে বিশ্বসংসারে আছে, সে কথা কি ও জানেও না! বুকখানা কি পাথর দিয়া তৈরি? সেটা কি আমাদের মত সঙ্কুচিত-বিস্ফারিত হয় না? তবে যে সেদিন মাঠের মধ্যে সকলে পলাইয়া গেলে সে নিতান্ত অপরিচিত আমাকে একাকী নির্ব্বিঘ্নে বাহির করিবার জন্য শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সে দয়া-মায়াও কি ওই পাথরের মধ্যেই নিহিত ছিল! আর আজ? সমস্ত বিপদের বার্ত্তা তন্ন-তন্ন করিয়া জানিয়া শুনিয়া নিঃশব্দে অকুণ্ঠিতচিত্তে এই ভয়াবহ, অতি ভীষণ মৃত্যুর মুখে নামিয়া দাঁড়াইল; একবার একটা মুখের অনুরোধও করিল না—“শ্রীকান্ত, তুই একবার নেবে যা।” সে ত জোর করিয়াই আমাকে নামাইয়া দিয়া নৌকা টানিতে পারিত! এ ত শুধু খেলা নয়! জীবন্মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া এই স্বার্থত্যাগ এই বয়সে কয়টা লোক করিয়াছে? ঐ যে

বিনা আড়ম্বরে সামান্যভাবে বলিয়াছিল, 'মর্‌তে এক দিন ত হবেই,' এমন সত্য কথা বলিতে কয়টা মানুষকে দেখা যায়? সে-ই আমাকে এই বিপদের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে সত্য, কিন্তু, সে যাই হোক্‌, তাহার এতবড় স্বার্থত্যাগ আমি মানুষের দেহ ধরিয়া ভুলিয়া যাই কেমন করিয়া? কেমন করিয়া ভুলি, যাহার হৃদয়ের ভিতর হইতে এত বড় অযাচিত দান এতই সহজে বাহির হইয়া আসিল—সে হৃদয় কি দিয়া কে গড়িয়া দিয়াছিল! তার পরে কত কাল কত সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া আজ এই বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছি। কত দেশ, কত প্রান্তর, কত নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বত, বন-জঙ্গল ঘাঁটিয়া ফিরিয়াছি, কত প্রকারের মানুষই না এই দুটো চোখে পড়িয়াছে—কিন্তু, এত বড় মহাপ্রাণ ত আর কখনও দেখিতে পাই নাই! কিন্তু সে আর নাই। অকস্মাৎ এক দিন যেন বুদ্‌বুদের মত শূন্যে মিলাইয়া গেল। আজ মনে পড়িয়া এই দুটো শুষ্ক চোখ জলে ভাসিয়া যাইতেছে—কেবল একটা নিষ্ফল অভিমান হৃদয়ের তলদেশ আলোড়িত করিয়া উপরের দিকে ফেনাইয়া উঠিতেছে।' সৃষ্টিকর্ত্তা! এই অদ্ভুত অপার্থিব বস্তু কেনই বা সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়াছিলে, এবং কেনই বা তাহা এমন ব্যর্থ করিয়া প্রত্যাহার করিলে! বড় ব্যথায় আমার এই অসহিষ্ণু মন আজ বারংবার এই প্রশ্নই করিতেছে—ভগবান্! টাকা-কড়ি, ধন-দৌলত, বিদ্যা-বুদ্ধি ঢের ত তোমার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে দিতেছ দেখিতেছি; কিন্তু এত বড় একটা মহাপ্রাণ আজ পর্য্যন্ত তুমিই বা কয়টা দিতে পারিলে? যাক্‌ সে কথা। ক্রমশঃ, ঘোর কল-কল্লোল নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিতেছিলাম; অতএব আর প্রশ্ন না করিয়াই বুঝিলাম, এই

বনাস্তরালেই সেই ভীষণ প্রবাহ—যাহাকে অতিক্রম করিয়া ষ্টীমার যাইতে পারে না—তাহাই প্রধাবিত হইতেছে। বেশ অনুভব করিতেছিলাম, জলের বেগ বর্দ্ধিত হইতেছে এবং ধূসর ফেনপুঞ্জ বিস্তৃত বালুকারাশির ভ্রমোৎপাদন করিতেছে। ইন্দ্র আসিয়া নৌকায় উঠিল এবং বোটে হাতে করিয়া সম্মুখবর্ত্তী উদ্দাম স্রোতের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিল। কহিল, "আর ভয় নেই; বড় গাঙে এসে পড়েছি।" মনে মনে কহিলাম, ভয় না থাকে ভালই। কিন্তু, কিসে যে তোমার ভয় আছে, তা'ও ত বুঝিলাম না। পরক্ষণেই সমস্ত নৌকাটা আপাদমস্তক একবার যেন শিহরিয়া উঠিল, এবং চক্ষের পলক না ফেলিতেই দেখিলাম, তাহা বড় গাঙের স্রোত ধরিয়া উল্কাবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

তখন ছিন্ন-ভিন্ন মেঘের আড়ালে বোধ করি যেন চাঁদ উঠিতেছিল। কারণ, যে অন্ধকারের মধ্যে যাত্রা করিয়াছিলাম, সে অন্ধকার আর ছিল না। এখন অনেক দূর পর্য্যন্ত অস্পষ্ট হইলেও দেখা যাইতেছিল। দেখিলাম, বনঝাউ এবং ভুট্টা-জনারের চড়া ডান দিকে রাখিয়া নৌকা আমাদের সোজা চলিতেই লাগিল।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অশ্রুজল

জীবনের সুখ-দুঃখের স্মৃতিতে মুখ লুকাইয়া একবারও কাঁদে নাই, সংসারে এরূপ লোক দেখা যায় না। সকল মনুষ্যেরই হৃদয়তন্ত্রীতে এক একটী সুর কেমন লাগিয়া থাকে, সেই সুরে যেদিন আঘাত পড়ে সেইদিন সহসা যেন তাহার জীবনে কি পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহার হৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে কি যেন তড়িৎ-স্রোত ছুটিয়া বেড়ায়; আপনাকে কোথায় যেন ধরিতে পাইয়া সে একবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখে, তাহার নয়ন বাহিয়া অশ্রুজল ঝরিতে থাকে। কিন্তু কোন্‌খানে কবে কি আঘাত লাগিয়া তাহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠে, সে কি তাহা বুঝিতে পারে? সে আপনার মনে কাঁদিয়া যায়—না কাঁদিয়া সে থাকিতে পারে না—কিন্তু তাহার সেই হৃদয়মথিত অশ্রুবিন্দুতে কত দিনের হয়ত গভীর সুখ-দুঃখের স্মৃতি আছে, সে তাহা জানেও না। প্রথম উচ্ছ্বাস যখন সংযত হইয়া আসে, তখন যদি সে ভাবিয়া দেখে, তবে হয়ত দেখিতে পায়, বিন্দুর মধ্যে হারাইয়া যাওয়া যায় এমন কিছু আছে—সেখানে সকলই শূন্য নহে।

অশ্রুজল ত আর কিছু নহে, হৃদয়ের নীরব ভাষা। হৃদয় উথলিয়া উঠিয়া আপনাতে আর থাকিতে পারে না, বাহির হইয়া পড়ে। সুতরাং অশ্রুবিন্দুর মধ্যে হৃদয় কতখানি লুকাইয়া আছে বলিতে হইবে না। কিন্তু হৃদয়ের এই অশ্রুভাষায় কি ভাব ব্যক্ত হয়? হৃদয়ের ভাষা ত আরও আছে। নৈরাশ্যের বিজন কাননে

যখন আত্মহারা দীর্ঘনিশ্বাস শিহরিয়া উঠিয়া মিলাইয়া যায়, তখন সেও ত সেই হৃদয়ের ভাষা; আসন্ন নির্ব্বাণের বিবর্ণ-অধরে যখন ক্ষীণ দীপশিখার মত একটি ম্লান অস্ফুট রজত-সৌন্দর্য্য বিকশিয়া উঠে, তখন সেও ত সেই অবসন্ন হৃদয়ের নীরব ভাষা। তাই বলিয়া এসব ভাষাই ত আর সম্পূর্ণ এক নহে—ভাবের সাদৃশ্য থাকিতে পারে মাত্র, কিন্তু একভাব হওয়ার সম্ভাবনা বিরল। অশ্রুজলের মর্ম্মের ভাব দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত এক নয়—বেশ একটু তফাৎ আছে।

নয়নে অশ্রু বহে কখন? অভিমান, অনুতাপ, হৃদয়ের সুগভীর বেদনাতেই ত অশ্রুজলের উচ্ছ্বাস। আনন্দেও অশ্রু ঝরে। সুখের সুধু অশ্রু নাই। দীর্ঘনিশ্বাসও হৃদয়ের বেদনা-উচ্ছ্বাস। কিন্তু দুয়ের মধ্যে ভাবের তারতম্য কি? দীর্ঘনিশ্বাসে অতৃপ্তির ভাব কিছু বিশেষরূপে অভিব্যক্ত, অশ্রুজলে শান্তির ভাব। হৃদয় যখন ব্যথিত হইয়া আপনার মধ্যে মিলাইয়া থাকিতে চায়, একা একা আপনার মধ্যে যখন সে অজ্ঞাতবাস করে, তখন তাহার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে দীর্ঘনিশ্বাস হাহাকার করিয়া মরে। দীর্ঘনিশ্বাসে হৃদয়ের ভয়ানক অন্তর্দাহ হয়, হৃদয় জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যায়। অশ্রুজলে এ দাবানলভাব নাই, হৃদয় যেন গলিয়া গিয়া অশ্রুরূপে ঝরিয়া যায়; বেদনার অনেকটা উপশম হয়। দীর্ঘনিশ্বাসে অশ্রুজলের এ তৃপ্তি কোথায়? হৃদয় গুমরিয়া গুমরিয়া প্রতিদিন অবসন্ন হইয়া আসে, প্রাণে যে শেল বিঁধিয়া থাকে, তাহার জ্বালা আরও বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সে শেল ঘুচে না। এই দীর্ঘনিশ্বাস যখন বুকে আসিয়া আট্‌কাইয়া যায়, সহসা আসিতে আসিতে আর আসিতে পারে না, তখন লোকে উন্মাদ-হাসি হাসিয়া উঠে। তখন সে এক দারুণ যন্ত্রণার অবস্থা—ভাবিতে

কল্পনা শিহরিয়া উঠে। সহসা উথলিয়া উচ্ছ্বাস রুদ্ধ হইয়া গিয়া হৃদয় পাষাণের মত যেন হিম হইয়া যায়। অশ্রু যখন ঝরিতে পায় না, হৃদয়েই শুকাইয়া আসে, তখন উন্মাদ-হাসি দেখা দেয় না, অধরে হাসি মিলাইয়া যায়—ম্লান, ক্ষীণ, নিভ-নিভ। সে যাতনায় শান্তি আছে,—দীর্ঘনিশ্বাসের রৌদ্রতপ্ত মরুভূমিভাব নাই।

অভিমান যখন চোখের জল মুছিতে থাকে, তখন নৈরাশ্যের মধ্যেও কিছু আশা আছে—তখন অভিমানকে শান্ত করা যাইতে পারে, পুরাতন স্মৃতির উপর একটা আবরণ টানিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু অভিমানের চোখে যখন জল নাই, হৃদয়ে শুধু দীর্ঘনিশ্বাস উঠিয়া মিলাইয়া যায়, তখন তাহাকে শান্ত করা দায়, তখন অবস্থা বড় ভাল নয়। অনুতাপও চোখের জল ফেলিলে, ভরসা হয়, পুরাতন স্মৃতি ভুলিয়া এইবারে সে বুঝি নব-উদ্যমে কাজে লাগে। আর অনুতাপের হৃদয়ে যখন কেবলই দীর্ঘনিশ্বাস উথলিয়া উঠে, তখন স্মৃতির দংশনে দংশনে সে কাতর, তাহার অবস্থা মৃত্যুর সন্নিকট।

কিন্তু দুঃখের গভীরতা কোথায়—অশ্রুজলে কি দীর্ঘনিশ্বাসে? এ কথা বলা কিছু কঠিন। দীর্ঘশ্বাসের মধ্যেও যেমন, অশ্রুজলের হৃদয়েও সেইরূপ দুঃখ লুকাইয়া থাকিতে পারে। স্বতন্ত্র ভাবের হৃদয়ে স্বতন্ত্র ভাবের উচ্ছ্বাস। তবে রুদ্ধ প্রবাহ, রুদ্ধ উচ্ছ্বাস-যন্ত্রণাই যে অধিক কষ্টদায়ক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যেখানে হৃদয় বড়ই গভীর সেখানে উচ্ছ্বাস ততই কম বলিয়া উপলব্ধি হয়, যন্ত্রণাও সেখানে অধিক বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু বাস্তবিক সেখানে যন্ত্রণার অবসান নাই। লঘু হৃদয় সহজেই

ঝরিয়া যায়, যন্ত্রণা সেখানে আঁকড়িয়া থাকিতে পারে না। গভীর দুঃখের দীর্ঘনিশ্বাসে বড়ই কষ্ট—চোখে জল আসিলে কষ্টের কতকটা উপশম হয়।

দীর্ঘনিশ্বাসে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে—হৃদয়ের মধ্যে এমন একটা উলট্‌পালট্‌ হয় যে, কিছুই যেন ধরিয়া ছুঁইয়া পাওয়া যায় না। দীর্ঘনিশ্বাসে সান্ত্বনা পায় না। অশ্রুজলে কতকটা তবু সান্ত্বনা আছে—আপনাকে ব্যক্ত করিয়া তৃপ্তি হয়। সমদুঃখীর নিকট কাঁদিয়া অনেক সময় সুখ আছে, কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাস আপনার বাহিরে প্রায় বাহির হয় না। দীর্ঘনিশ্বাসে জীবন যেন বাহির হইতে চায়, কিন্তু পারে না, প্রতি উদ্যমে আঘাত খাইয়া ফিরিয়া আসে।

অশ্রুজলে প্রেমের মধুর ভাবটী বড় পরিস্ফুট—নৈরাশ্য নয়, হাহাকার নয়, প্রেমের মধ্যে যে একটী পবিত্র সৌন্দর্য্য চিরবিকশিত—সেই ভাবটী। সে ভাবে উগ্রভাবের একেবারে অভাব; তাহা বড়ই কোমল, মধুর, পবিত্র। তাহার তুলনায় দীর্ঘনিশ্বাসের কতকটা রৌদ্র ভাব বলা যাইতে পারে। অশ্রুজলের এই মধুর ভাবেই প্রধান সৌন্দর্য্য। এ ভাবে যতই ডুবা যায় ততই তাহার গভীরতার উপলব্ধি হয়। সমস্ত জগৎকে আপনার মধ্যে আনিয়া আমরা এই ভাবে ডুবিয়া যাই, যত ডুবি আপনাকে ততই ভুলিতে থাকি। এমন আত্মবিস্মৃতি আর বুঝি কোথাও নাই।

দীর্ঘনিশ্বাসে আপনাতে আর আপনি থাকি না, কিন্তু আপনাকে পাঁচজনের মধ্যে হারাইয়া ফেলি না। দীর্ঘনিশ্বাসে আত্মহত্যা; অশ্রুজলে আত্মবিসর্জ্জন। দীর্ঘনিশ্বাসে হৃদয় ছারখার হইয়া গিয়াছে, প্রতীকারাশা বিরল; অশ্রুজলে হৃদয়ের মোহ

ধুইয়া গিয়াছে, কিন্তু হৃদয় যায় নাই। অশ্রুজলে জগৎ ডুবিতে পারে; দীর্ঘনিশ্বাসের কাছে জগৎ ঘেঁসিতে পারে না—তাপ বড় প্রবল।

কিন্তু এ ছলনার সংসারে স্বর্গের অশ্রুজল ত প্রায় মিলে না। এখানে সকল বিষয়েই প্রতারণা আছে, হৃদয়ের ভাষায় ভাণ না থাকিবে কেন? হৃদয়হীন লোকে হৃদয় লইয়া উপহাস করে, হৃদয়ের বিরুদ্ধে সারি সারি শাণিত দন্ত ও নিষ্ঠুর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ খাড়া করিয়া দিয়া তামাসা দেখে। এই জন্য হৃদয়ের অশ্রুজল বিজন অরণ্যের শান্তিনিকেতনেই ঝরিয়া যায়। আর লোকালয়ে তার কণ্ঠ স্ফীত বদন চোখ মিটিমিটি করিয়া দু'এক ফোঁটা নীরস জল বাহির করে; তাহার চারিদিকে পরহৃদয়চ্ছিদ্রানুসন্ধিৎসুর আইনবদ্ধ বাহবাগুলি চাটুকারের মত ঘিরিয়া বসে, ইহাই তাহার অভিলাষ। কিন্তু যেমন লোকই হোক তাহার হৃদয়ে স্বর্গের অশ্রুজল একদিন না একদিন দেখা দিবেই।

অশ্রুজলের মত আমাদের বন্ধু কেহ নাই। এই অসীম সংসার-সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত যাহা উঠে—অশ্রুজল। দীর্ঘনিশ্বাসের তীব্র দংশন সেখানে নাই—সেখানে কি সুগভীর স্নেহ, শান্তিময় প্রেম! রোষে, ক্ষোভে, অভিমানে আমরা যখন আপনাকে ছাড়িয়া দি, তখন অশ্রুজল যদি দেখা না দেয়, তাহা হইলে প্রাণ কি বাঁচে? আমরা পদে পদে হৃদয়ে অনন্ত নরককুণ্ড রচনা করিতে বসি, কিন্তু এ সংসারে নাকি অশ্রুজল আজিও শুকায় নাই, তাই নরকযন্ত্রণার মধ্যে স্বর্গের সোপান দেখিয়া বিস্মিত হই। অশ্রুজলে যে কি পবিত্রতা আছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

বুকে যাহার দীর্ঘনিশ্বাস বিঁধিয়া আছে, তাহার জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার আশা ভরসা কিছুই নাই। অশ্রুজলে দলিত হৃদয় নবজীবন লাভ করে। অশ্রুজল সম্পদে সুখ, বিপদে বন্ধু, রোগে আরাম, শোকে শান্তি। অশ্রুধৌত হৃদয় ধ্রুবলোকের ছায়া।

হে অশ্রুজল! নিশ্বাস-শপ্ত হৃদয়ে তুমি চিরদিন শান্তি বর্ষণ কর, সেথান হইতে নির্ম্মম্ হাহাকার ঘুচিয়া যাক্। সংসারের শোক-তাপ-ভয়ে জরজর প্রাণে তুমি সেই অভয়পদের প্রতিষ্ঠা কর, ধরণীর পাপভার লঘু হোক। তুমি এস, এই ক্ষুদ্র মানব-শিশুর মলিন হৃদয়ে একবার এস, এ মরুভূমি ঘুচিয়া যাইবে। একবার শুধু এস, তুমি এস।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাব্যের উপেক্ষিতা

কবি তাঁহার কল্পনা-উৎসবে যত করুণাবারি সমস্তই কেবল জনকতনয়ার পুণ্য অভিষেকে নিঃশেষ করিয়াছেন। কিন্তু আর একটি যে ম্লানমুখী ঐহিকের সর্ব্বসুখবঞ্চিতা রাজবধূ সীতাদেবীর ছায়াতলে অবগুণ্ঠিতা হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, কবি-কমণ্ডলু হইতে একবিন্দু অভিষেকবারিও কেন তাঁহার চিরদুঃখাভিতপ্ত নম্রললাটে সিঞ্চিত হইল না। হায় অব্যক্তবেদনা দেবী উর্ম্মিলা, তুমি প্রত্যুষের তারার মত মহাকাব্যের সুমেরুশিখরে একবারমাত্র উদিত হইয়াছিলে, তারপরে অরুণালোকে আর তোমাকে দেখা গেল না! কোথায় তোমার উদয়াচল, কোথায় বা তোমার অস্তাচল তাহা প্রশ্ন করিতেও সকলে বিস্মৃত হইল।

কাব্যসংসারে এমন দুটি একটি রমণী আছে যাহারা কবিকর্ত্তৃক সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াও অমরলোক হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। পক্ষপাত-কৃপণ কাব্য তাহাদের জন্য স্থানসঙ্কোচ করিয়াছে বলিয়াই পাঠকের হৃদয় অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে আসন দান করে।

কিন্তু এই কবিপরিত্যক্তাদের মধ্যে কাহাকে কে হৃদয়ে আশ্রয় দিবেন, তাহা পাঠকবিশেষের প্রকৃতি এবং অভিরুচির উপর নির্ভর করে। আমি বলিতে পারি, সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যযজ্ঞশালার প্রান্তভূমিতে যে কয়টি অনাদৃতার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে, তাহার মধ্যে উর্ম্মিলাকে আমি প্রধান স্থান দিই।

বোধ করি তাহাই একটা কারণ, এমন মধুর নাম সংস্কৃত কাব্যে আর দ্বিতীয় নাই। নামকে যাঁহারা নামমাত্র মনে করেন

আমি তাঁহাদের দলে নই। সেক্সপিয়র বলিয়া গেছেন—গোলাপকে যে-কোনো নাম দেওয়া যাক্ তাহার মাধুর্য্যের তারতম্য হয় না। গোলাপ সম্বন্ধে হয়ত তাহা খাটিতেও পারে, কারণ গোলাপের মাধুর্য্য সঙ্কীর্ণসীমাবদ্ধ। তাহা কেবল গুটিকতক সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষগম্য গুণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু মানুষের মাধুর্য্য এমন সর্ব্বাংশে সুগোচর নহে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি সূক্ষ্ম সুকুমার সমাবেশে অনির্ব্বচনীয়তার উদ্রেক করে। তাহাকে আমরা কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা পাই না, কল্পনা দ্বারা সৃষ্টি করি। নাম সেই সৃষ্টিকার্য্যের সহায়তা করে। একবার মনে করিয়া দেখিলেই হয় দ্রৌপদীর নাম যদি উর্ম্মিলা হইত তবে সেই পঞ্চবীরপতিগর্ব্বিতা ক্ষত্রনারীর দীপ্ত তেজ এই তরুণ কোমল নামটির দ্বারা পদে পদে খণ্ডিত হইত।

অতএব এই নামটির জন্য বাল্মীকির নিকট কৃতজ্ঞ আছি। কবিগুরু ইহার প্রতি অনেক অবিচার করিয়াছেন, কিন্তু দৈবক্রমে ইহার নাম যে মাণ্ডবী অথবা শ্রুতকীর্ত্তি রাখেন নাই সে একটা বিশেষ সৌভাগ্য। মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না, জানিবার কৌতূহলও রাখি না।

উর্ম্মিলাকে কেবল আমরা দেখিলাম বধূবেশে, বিদেহনগরীর বিবাহসভায়। তারপরে যখন হইতে সে রঘুরাজকুলের সুবিপুল অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিল তখন হইতে আর তাহাকে একদিনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সেই তাহার বিবাহ-সভার বধূবেশের ছবিটিই মনে রহিয়া গেল। উর্ম্মিলা চিরবধূ—নির্ব্বাক্‌কুণ্ঠিতা নিঃশব্দচারিণী। ভবভূতির কাব্যেও তাহার সেই ছবিটুকুই মুহূর্ত্তের জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল—সীতা কেবল সস্নেহ-কৌতুকে একটিবার মাত্র তাহার উপরে তর্জ্জনী রাখিয়া দেবরকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! ইনি কে? লক্ষ্মণ লজ্জিত-হাস্যে মনে মনে কহিলেন, ওহো উর্ম্মিলার কথা আর্য্যা জিজ্ঞাসা করিতেছেন! এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ লজ্জায় সে ছবি ঢাকিয়া ফেলিলেন; তাহার পর রামচন্দ্রের এত বিচিত্র সুখদুঃখচিত্রশ্রেণীর মধ্যে আর একটিবারও কাহারও কৌতূহল-অঙ্গুলী এই ছবিটির উপরে পড়িল না। সে ত কেবল বধূ উর্ম্মিলা মাত্র।

তরুণ শুভ্রভালে যেদিন প্রথম সিন্দূরবিন্দুটি পরিয়াছিলেন, উর্ম্মিলা চিরদিনই সেইদিনকার নববধূ। কিন্তু রামের অভিষেক-মঙ্গলাচরণের আয়োজনে যেদিন অন্তঃপুরিকাগণ ব্যাপৃত ছিল সেদিন এই বধূটিও কি সীমন্তের উপর অর্দ্ধাবগুণ্ঠন টানিয়া রঘুকুললক্ষ্মীদের সহিত প্রসন্নকল্যাণমুখে মাঙ্গল্য-রচনায় নিরতিশয় ব্যস্ত ছিল না? আর যেদিন অযোধ্যা অন্ধকার করিয়া দুই কিশোর রাজভ্রাতা সীতাদেবীকে সঙ্গে লইয়া তপস্বিবেশে পথে বাহির হইলেন সেদিন বধূ উর্ম্মিলা রাজহর্ম্ম্যের কোন্ নিভৃত শয়নকক্ষে ধূলিশয্যায় বৃন্তচ্যুত মুকুলটির মত লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা কি কেহ জানে? সেদিনকার সেই বিশ্বব্যাপী বিলাপের মধ্যে এই বিদীর্য্যমাণ ক্ষুদ্র কোমল হৃদয়ের অসহ্য শোক কে দেখিয়াছিল? যে ঋষিকবি ক্রৌঞ্চবিরহিণীর বৈধব্যদুঃখ মুহূর্ত্তের জন্য সহ্য করিতে পারেন নাই, তিনিও একবার চাহিয়া দেখিলেন না।

লক্ষ্মণ রামের জন্য সর্ব্বপ্রকারে আত্মবিলোপ সাধন করিয়াছিলেন, সে গৌরব ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে আজও ঘোষিত হইতেছে, কিন্তু সীতার জন্য উর্ম্মিলার আত্মবিলোপ কেবল সংসারে নহে, কাব্যেও। লক্ষ্মণ তাঁহার দেবতাযুগলের জন্য কেবল নিজকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, উর্ম্মিলা নিজের চেয়ে অধিক নিজের স্বামীকে দান

করিয়াছিলেন। সে-কথা কাব্যে লেখা হইল না। সীতার অশ্রুজলে উর্ম্মিলা একেবারে মুছিয়া গেল।

লক্ষ্মণ ত বারো বৎসর ধরিয়া তাঁহার উপাস্য প্রিয়জনের প্রিয়কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন—নারী-জীবনের সেই বারোটি শ্রেষ্ঠ বৎসর উর্ম্মিলার কেমন করিয়া কাটিয়াছিল? সলজ্জ নবপ্রেমে আমোদিত বিকাসোন্মুখ হৃদয়মুকুলটি লইয়া স্বামীর সহিত যখন প্রথমতম মধুরতম পরিচয়ের আরম্ভসময় সেই মুহূর্ত্তে লক্ষ্মণ সীতাদেবীর রক্তচরণক্ষেপের প্রতি নত দৃষ্টি রাখিয়া বনে গমন করিলেন—যখন ফিরিলেন তখন নববধূর সুচির প্রণয়ালোকবঞ্চিত হৃদয়ে আর কি সেই নবীনতা ছিল? পাছে সীতার সহিত উর্ম্মিলার পরম দুঃখ কেহ তুলনা করে, তাই কি কবি সীতার স্বর্ণমন্দির হইতে এই শোকোজ্জ্বলা মহাদুঃখিনীকে একেবারে বাহির করিয়া দিয়াছেন—জানকীর পাদপীঠপার্শ্বেও বসাইতে সাহস করেন নাই?

সংস্কৃত কাব্যের আর দুইটি তপস্বিনী আমাদের চিত্তক্ষেত্রে তপোবন রচনা করিয়া বাস করিতেছে। প্রিয়ংবদা আর অনসূয়া। তাহারা ভর্ত্তৃগৃহগামিনী শকুন্তলাকে বিদায় দিয়া পথের মধ্য হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিল, নাটকের মধ্যে আর প্রবেশ করিল না, একেবারে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল।

জানি, কাব্যের মধ্যে সকলের সমান অধিকার থাকিতে পারে না। কঠিনহৃদয় কবি তাঁহার নায়ক-নায়িকার জন্য কত অক্ষয় প্রতিমা গড়িয়া গড়িয়া নির্ম্মমচিত্তে বিসর্জ্জন দেন! কিন্তু তিনি যেখানে যাহাকে কাব্যের প্রয়োজন বুঝিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলেন সেইখানে কি তাহার সম্পূর্ণ শেষ হয়? দীপ্তরোষ ঋষিশিষ্যদ্বয়

এবং হতবুদ্ধি রোরুদ্যমানা গৌতমী যখন তপোবনে ফিরিয়া আসিয়া উৎসুক উৎকণ্ঠিত সখী দুইটিকে রাজসভার বৃত্তান্ত জানাইল তখন তাহাদের কি হইল, সে-কথা শকুন্তলা নাটকের পক্ষে একেবারেই অনাবশ্যক, কিন্তু তাই বলিয়া কি সেই অকথিত অমেয়-বেদনা সেই খানেই ক্ষান্ত হইয়া গেল ? আমাদের হৃদয়ের মধ্যে কি বিনা ছন্দে বিনা ভাষায় চিরদিন তাহা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ফিরিতে লাগিল না ?

কাব্য হীরার টুক্‌রার মত কঠিন। যখন ভাবিয়া দেখি, প্রিয়ংবদা অনসূয়া, শকুন্তলার কতখানি ছিল—তখন সেই কণ্ব-দুহিতার পরমতম দুঃখের সময়েই সেই সখীদিগকে একেবারেই অনাবশ্যক অপবাদ দিয়া সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করা কাব্যের পক্ষে ন্যায়বিচারসঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু তাহা নিরতিশয় নিষ্ঠুর।

শকুন্তলার সুখসৌন্দর্য্য গৌরবগরিমা বৃদ্ধি করিবার জন্যই এই দুটি লাবণ্যপ্রতিমা নিজের সমস্ত দিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়াছিল। তিনটি সখী যখন জলের ঘট লইয়া অকালবিকসিত নবমালতীর তলে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন দুষ্যন্ত কি একা শকুন্তলাকে ভালবাসিয়াছিলেন ? তখন হাস্যে কৌতুকে নব যৌবনের বিলোল-মাধুর্য্যে কাহারা শকুন্তলাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল ? এই দুটি তাপসী সখী। একা শকুন্তলা শকুন্তলার এক-তৃতীয়াংশ! শকুন্তলার অধিকাংশই অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা, শকুন্তলাই সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। বারো আনা প্রেমালাপ ত তাহারই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দিল। তৃতীয় অঙ্কে যেখানে একাকিনী শকুন্তলার সহিত দুষ্যন্তের প্রেমাকুলতা বর্ণিত আছে সেখানে কবি অনেকটা হীনবল হইয়াছিলেন—কোনো মতে অচিরে গৌতমীকে আনিয়া তিনি

রক্ষা পাইলেন—কারণ শকুন্তলাকে যাহারা আবৃত করিয়া সম্পূর্ণ করিয়াছিল তাহারা সেখানে ছিল না। বৃন্তচ্যুত ফুলের উপর দিবসের সমস্ত প্রখর আলোক সহ্য হয় না—বৃন্তের বন্ধন এবং পল্লবের ঈষৎ অন্তরাল ব্যতীত সে আলোক তাহার উপর তেমন কমনীয় কোমল ভাবে পড়ে না। নাটকের ঐ ক'টি পত্রে সখী-বিরহিতা শকুন্তলা এতই সুস্পষ্টরূপে অসহায় অসম্পূর্ণ অনাবৃতভাবে চোখে পড়ে যে, তাহার দিকে যেন ভাল করিয়া চাহিতে সঙ্কোচ বোধ হয়—মাঝখানে আর্য্যা গৌতমীর আকস্মিক আবির্ভাবে পাঠকমাত্রেই মনে মনে আরাম লাভ করে।

আমি ত মনে করি, রাজসভায় দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে যে চিনিতে পারেন নাই তাহার প্রধান কারণ, সঙ্গে অনসূয়া প্রিয়ংবদা ছিল না। একে তপোবনের বাহিরে, তাহাতে খণ্ডিতা শকুন্তলা, চেনা কঠিন হইতে পারে।

শকুন্তলা বিদায় লইলেন, তাহার পরে সখীরা যখন শূন্য তপোবনে ফিরিয়া আসিল তখন কি তাহাদের শৈশবসহচরীর বিরহই তাহাদের একমাত্র দুঃখ? শকুন্তলার অভাব ছাড়া ইতিমধ্যে তপোবনের আর কি কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই? হায় তাহারা জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়াছে, যাহা জানিত না, তাহা জানিয়াছে। কাব্যের কাল্পনিক নায়িকার বিবরণ পড়িয়া নহে, তাহাদের প্রিয়তমা সখীর বিদীর্ণ হৃদয়ের মধ্যে অবতরণ করিয়া! এখন হইতে অপরাহ্নে আলবালে জল সেচন করিতে কি তাহারা মাঝে মাঝে বিস্মৃত হইবে না? এখন কি তাহারা মাঝে মাঝে পত্রমর্ম্মরে সচকিত হইয়া অশোক তরুর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন কোনো আগন্তুকের আশঙ্কা করিবে না? মৃগশিশু আর কি তাহাদের পরিপূর্ণ আদর পাইবে?

এখন সেই সখীভাবনির্ম্মুক্তা স্বতন্ত্রা অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদাকে মর্ম্মরিত তপোবনে তাহাদের নিজের জীবনকাহিনীসূত্রে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছি। তাহারা ত ছায়া নহে; শকুন্তলার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা এক দিগন্ত হইতে অন্য দিগন্তে অস্ত যায় নাই ত। তাহারা জীবন্ত, মূর্ত্তিমতী। রচিত কাব্যের বহির্দ্দেশে, অনভিনীত নাট্যের নেপথ্যে এখন তাহারা বাড়িয়া উঠিয়াছে—অতিপিনদ্ধ বল্কলে এখন তাহাদের যৌবনকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না—এখন তাহাদের কলহাস্যের উপর অন্তর্ঘন ভাবের আবেগ নববর্ষার প্রথম মেঘমালার মত অশ্রুগম্ভীর ছায়া ফেলিয়াছে। এখন এক এক দিন সেই অন্যমনস্কাদের উটজপ্রাঙ্গণ হইতে অতিথি আসিয়া ফিরিয়া যায়। আমরাও ফিরিয়া আসিলাম।

সংস্কৃত সাহিত্যে আর একটি অনাদৃতা আছে। তাহার সহিত পাঠকদের পরিচয়-সাধন করাইতে আমি কুণ্ঠিত। সে বড় কেহই নহে, সে কাদম্বরী-কাহিনীর পত্রলেখা। সে যেখানে আসিয়া অতি স্বল্প স্থানে আশ্রয় লইয়াছে সেখানে তাহার আসিবার কোনো-প্রকার প্রয়োজন ছিল না। স্থানটি তাহার পক্ষে বড় সংকীর্ণ, একটু এদিকে ওদিকে পা ফেলিলেই সঙ্কট।

এই আখ্যায়িকার পত্রলেখা যে সুকুমার সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আছে সেরূপ সম্বন্ধ আর কোনো সাহিত্যে কোথাও দেখি নাই। অথচ কবি অতি সহজে সরল চিত্তে এই অপূর্ব্ব সম্বন্ধ-বন্ধনের অবতারণা করিয়াছেন, কোনোখানে এই উর্ণাতন্তুর প্রতি এতটুকু টান পড়ে নাই যাহাতে মুহূর্ত্তেকের জন্য ছিন্ন হইবার আশঙ্কা মাত্র ঘটিতে পারে।

যুবরাজ চন্দ্রাপীড় যখন অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া

আসিলেন তখন একদিন প্রভাতকালে তাঁহার গৃহে কৈলাস নামে এক কঞ্চুকী প্রবেশ করিল—তাহার পশ্চাতে একটি কন্যা, অনতিযৌবনা, মস্তকে ইন্দ্রগোপ কীটের মত রক্তাম্বরে অবগুণ্ঠন, ললাটে চন্দন-তিলক, কটিতে হেমমেখলা, কোমলতনুলতার প্রত্যেক রেখাটি যেন সদ্য নূতন অঙ্কিত ;—এই তরুণী লাবণ্যপ্রভাপ্রভাবে ভবন পূর্ণ করিয়া ক্বণিতমণিনূপুরাকলিত চরণে কঞ্চুকীর অনুগমন করিল।

কঞ্চুকী প্রণাম করিয়া ক্ষিতিতলে দক্ষিণ কর রাখিয়া জ্ঞাপন করিল—"কুমার, আপনার মাতা মহাদেবী বিলাসবতী জানাইতেছেন—এই কন্যা পরাজিত কুলুতেশ্বরের দুহিতা, বন্দিনী, ইহার নাম পত্রলেখা ! এই অনাথা রাজদুহিতাকে আমি দুহিতা-নির্ব্বিশেষে এতকাল পালন করিয়াছি। এক্ষণে ইহাকে তোমার তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী করিয়া প্রেরণ করিলাম। ইহাকে সামান্য পরিজনের মত দেখিয়ো না, বালিকার মত লালন করিয়া নিজের চিত্তবৃত্তির মত চাপল্য হইতে নিবারণ করিয়ো, শিষ্যার ন্যায় দেখিও, সুহৃদের ন্যায় সমস্ত বিশ্রব্ধব্যাপারে ইহাকে অভ্যন্তরে লইয়ো, এবং এই কল্যাণীকে এমত সকল কার্য্যে নিযুক্ত করিয়ো যাহাতে এ তোমার অতিথির পরিচারিকা হইতে পারে !" কৈলাস এই কথা বলিতেই পত্রলেখা তাঁহাকে অভিজাতপ্রণাম করিল এবং চন্দ্রাপীড় তাহাকে অনিমেষলোচনে সুচিরকাল নিরীক্ষণ করিয়া "অম্বা যেমন আজ্ঞা করিলেন তাহাই হইবে" বলিয়া দূতকে বিদায় করিয়া দিলেন।

পত্রলেখা পত্নী নহে, প্রণয়িনীও নহে, কিঙ্করীও নহে, পুরুষের সহচরী। এই প্রকার অপরূপ সখীত্ব দুই সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী একটি

বালুতটের মত—কেমন করিয়া তাহা রক্ষা পায়? নবযৌবন কুমারকুমারীর মধ্যে অনাদিকালের যে চিরন্তন প্রবল আকর্ষণ আছে তাহা দুই দিক্ হইতেই এই সঙ্কীর্ণ বাঁধটুকুকে ক্ষয় করিয়া লঙ্ঘন করে না কেন?

কিন্তু কবি সেই অনাথা রাজকন্যাকে চিরদিনই এই অপ্রশস্ত আশ্রয়ের মধ্যে বসাইয়া রাখিয়াছেন, এই গণ্ডীর রেখামাত্র বাহিরে তাহাকে কোনো দিন টানেন নাই। হতভাগিনী বন্দিনীর প্রতি কবির ইহা অপেক্ষা উপেক্ষা আর কি হইতে পারে? একটি সূক্ষ্ম যবনিকার আড়ালে বাস করিয়াও সে আপনার স্বাভাবিক স্থান পাইল না। পুরুষের হৃদয়ের পার্শ্বে সে জাগিয়া রহিল, কিন্তু ভিতরে পদার্পণ করিল না। কোনো দিন একটা অসতর্ক বসন্তের বাতাসে এই সখীত্ব-পর্দ্দার একটা প্রান্তও উড়িয়া পড়িল না!

অথচ সখীত্বের মধ্যে লেশমাত্র অন্তরাল ছিল না। কবি বলিতেছেন, পত্রলেখা সেই প্রথম দিন হইতে চন্দ্রাপীড়ের দর্শনমাত্রেই সেবারসসমুপজাতানন্দা হইয়া দিন নাই রাত্রি নাই উপবেশনে উত্থানে ভ্রমণে ছায়ার মত রাজপুত্রের পার্শ্ব পরিত্যাগ করিল না। চন্দ্রাপীড়েরও তাহাকে দেখা অবধি প্রতিক্ষণে উপচীয়মানা মহতী প্রীতি জন্মিল। প্রতিদিন ইহার প্রতি প্রসাদ রক্ষা করিলেন এবং সমস্ত বিশ্বাসকার্য্যে ইহাকে আত্মহৃদয় হইতে অব্যতিরিক্ত মনে করিতে লাগিলেন।

এই সম্বন্ধটি অপূর্ব্ব সুমধুর, কিন্তু ইহার মধ্যে নারী-অধিকারের পূর্ণতা নাই। নারীর সহিত নারীর যেরূপ লজ্জাবোধ-হীন সখীসম্পর্ক থাকিতে পারে, পুরুষের সহিত তাহার সেইরূপ অসঙ্কোচ অনবচ্ছিন্ন নৈকট্যে পত্রলেখার নারী-মর্য্যাদার প্রতি

কাদম্বরীকাব্যের যে একটা অবজ্ঞা প্রকাশ পায় তাহাতে কি পাঠককে আঘাত করে না? কিসের আঘাত? আশঙ্কার নহে, সংশয়ের নহে। কারণ কবি যদি আশঙ্কা-সংশয়ের লেশমাত্র স্থান রাখিতেন তবে সেটা আমরা পত্রলেখার নারীত্বের প্রতি কথঞ্চিৎ সম্মান বলিয়া গ্রহণ করিতাম। কিন্তু এই দুটি তরুণ-তরুণীর মধ্যে লজ্জা আশঙ্কা এবং সন্দেহের দোদুল্যমান স্নিগ্ধ ছায়াটুকু পর্য্যন্ত নাই। পত্রলেখা তাহার অপূর্ব্ব সম্বন্ধবশত অন্তঃপুর ত ত্যাগই করিয়াছে কিন্তু স্ত্রী পুরুষ পরস্পর সমীপবর্ত্তী হইলে স্বভাবতই যে একটি সঙ্কোচে সাধ্বসে এমন কি সহাস্য ছলনায় একটি লীলান্বিত কম্পমান মানসিক অন্তরাল আপনি বিরচিত হইতে পারে ইহাদের মধ্যে সেটুকুও হয় নাই। সেই কারণেই এই অন্তঃপুরবিচ্যুতা অন্তঃপুরিকার জন্য সর্ব্বদাই ক্ষোভ জন্মিতে থাকে।

চন্দ্রাপীড়ের সহিত পত্রলেখার নৈকট্যও অসামান্য। দিগ্বিজয়-যাত্রার সময় একই হস্তিপৃষ্ঠে পত্রলেখাকে সম্মুখে বসাইয়া রাজপুত্র আসন গ্রহণ করেন। শিবিরে রাত্রিকালে চন্দ্রাপীড় যখন নিজ শয্যার অনতিদূরে শয়ননিষণ্ণ পুরুষ সখা বৈশম্পায়নের সহিত আলাপ করিতে থাকেন তখন নিকটে ক্ষিতিতলবিন্যস্ত কুথার উপর সখী পত্রলেখা প্রসুপ্ত থাকে।

অবশেষে কাদম্বরীর সহিত চন্দ্রাপীড়ের যখন প্রণয়সংঘটন হইল তখনও পত্রলেখা আপন ক্ষুদ্র স্থানটুকুর মধ্যে অব্যাহতভাবে রহিল। কারণ, পুরুষ-চিত্তে নারী যতটা আসন পাইতে পারে তাহার সঙ্কীর্ণতম প্রান্তটুকুমাত্র সে অধিকার করিয়াছিল,—সেখানে যখন মহামহোৎসবের জন্য স্থান করিতে হইল, তখন ঐটুকু প্রান্ত হইতে বঞ্চিত করা আবশ্যকই হইল না।

পত্রলেখার প্রতি কাদম্বরীর ঈর্ষ্যার আভাসমাত্রও ছিল না। এমন কি, চন্দ্রাপীড়ের সহিত পত্রলেখার প্রীতিসম্বন্ধ বলিয়াই কাদম্বরী তাহাকে প্রিয়সখীজ্ঞানে সাদরে গ্রহণ করিল। কাদম্বরীকাব্যের মধ্যে পত্রলেখা যে অপরূপ ভূখণ্ডের মধ্যে আছে যেখানে ঈর্ষ্যা সংশয় সঙ্কট বেদনা কিছুই নাই, তাহা স্বর্গের ন্যায় নিষ্কণ্টক, অথচ সেখানে স্বর্গের অমৃতবিন্দু কই ?

প্রেমের উচ্ছ্বসিত অমৃতপান তাহার সম্মুখেই চলিতেছে। ভ্রাণেও কি কোনো দিনের জন্য তাহার কোনো একটা শিরার রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠে নাই? সে কি চন্দ্রাপীড়ের ছায়া? রাজপুত্রের তপ্তযৌবনের তাপটুকুমাত্র কি তাহাকে স্পর্শ করে নাই? কবি সে প্রশ্নের উত্তরটুকুও দিতে উপেক্ষা করিয়াছেন। কাব্যসৃষ্টির মধ্যে সে এত উপেক্ষিতা।

পত্রলেখা যখন কিয়ৎকাল কাদম্বরীর সহিত একত্রবাসের পর বার্ত্তাসহ চন্দ্রাপীড়ের নিকট ফিরিয়া আসিল, যখন স্মিতহাস্যের দ্বারা দূর হইতেই চন্দ্রাপীড়ের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া সে নমস্কার করিল, তখন পত্রলেখা প্রকৃতিবল্লভা হইলেও কাদম্বরীর নিকট হইতে প্রসাদলব্ধ আর একটি সৌভাগ্যের ন্যায় বল্লভতরতা প্রাপ্ত হইল এবং তাহাকে অতিশয় আদর দেখাইয়া যুবরাজ আসন হইতে উত্থিত হইয়া আলিঙ্গন করিলেন।

চন্দ্রাপীড়ের এই আদর এই আলিঙ্গনের দ্বারাই পত্রলেখা কবিকর্ত্তৃক অনাদৃতা। আমরা বলি কবি অন্ধ। কাদম্বরী এবং মহাশ্বেতার দিকেই ক্রমাগত একদৃষ্টে চাহিয়া তাঁহার চক্ষু ঝলসিয়া গেছে, এই ক্ষুদ্র বন্দিনীটিকে তিনি দেখিতে পান নাই। ইহার মধ্যে যে প্রণয়তৃষার্ত্ত চিরবঞ্চিত একটি নারীহৃদয় রহিয়া গেছে সে-কথা

তিনি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন। বাণভট্টের কল্পনা মুক্তহস্ত—অস্থানে অপাত্রেও তিনি অজস্র বর্ষণ করিয়া চলিয়াছেন। কেবল তাঁহার সমস্ত কৃপণতা এই বিগতনাথা রাজদুহিতার প্রতি। তিনি পক্ষপাতদূষিত পরম অন্ধতাবশত পত্রলেখার হৃদয়ের নিগূঢ়তম কথা কিছুই জানিতেন না। তিনি মনে করিতেছেন তরঙ্গলীলাকে তিনি যে-পর্য্যন্ত আসিবার অনুমতি করিয়াছেন, সে সেই পর্য্যন্ত আসিয়াই থামিয়া আছে—পূর্ণ চন্দ্রোদয়েও সে তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করে নাই। তাই কাদম্বরী পড়িয়া কেবলই মনে হয় অন্য সমস্ত নায়িকার কথা অনাবশ্যক বাহুল্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু পত্রলেখার কথা কিছুই বলা হয় নাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহাকাব্যের লক্ষণ

ইংরাজি এপিক্-শব্দের অনুবাদে মহাকাব্য-শব্দের প্রয়োগ চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু এপিকের সমস্ত লক্ষণের সহিত মহাকাব্যের সমস্ত লক্ষণ মিলে কি না, তাহা বলিতে পারি না। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে আমার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, কিন্তু শুনিয়াছি যে, আলঙ্কারিকেরা মহাকাব্যের লক্ষণ যেরূপ সূক্ষ্মভাবে বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহাতে মহাকবিগণের চিন্তার কারণ কিছুই রাখেন নাই। কালিদাস, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি কবিগণের রচিত মহাকাব্য এ দেশে চলিত আছে, এবং ঐ সকল মহাকাব্য সম্ভবত অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য। রামায়ণ ও মহাভারত, এই দুই গ্রন্থকে মহাকাব্য বলা চলে কি না, তাহা লইয়া একটা তুমুল সমস্যা গোড়াতেই দাঁড়ায়। ইংরাজি পুস্তকে রামায়ণ ও মহাভারত এপিক্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, কিন্তু আমাদের পণ্ডিতেরা উহাদিগকে মহাকাব্য বলিতে সর্ব্বদা সম্মত হন না। প্রথমত এ দুই গ্রন্থ অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়মাবলী অত্যন্ত উৎকটরূপে লঙ্ঘন করিয়াছে। দ্বিতীয়ত মহাকাব্য বলিলে উহাদের গৌরবহানির সম্ভাবনা জন্মে। ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদি আখ্যা দিলে বোধ করি এই দুই গ্রন্থের মর্য্যাদা রক্ষা হইতে পারে। কিন্তু মহাকাব্য বলিলে উহাদের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হয়।

বস্তুতই মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হয়। কুমারসম্ভব ও কিরাতার্জ্জুনীয় যে অর্থে মহাকাব্য, রামায়ণ-মহাভারত কখনই সে অর্থে মহাকাব্য

নহে। কুমারসম্ভব, কিরাতার্জ্জুনীয় যে শ্রেণীর—যে পর্য্যায়ের গ্রন্থ, রামায়ণ-মহাভারত কখনই সে শ্রেণীর—সে পর্য্যায়ের গ্রন্থ নহে। একের নাম মহাকাব্য দিলে, অন্যকে মহাকাব্য বলা কিছুতেই সঙ্গত হয় না।

রামায়ণ-মহাভারতের ঐতিহাসিকত্বে ও ধর্ম্মশাস্ত্রত্বে সম্পূর্ণ আস্থাবান্ থাকিয়াও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, উহাতে কাব্যরসও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। মহর্ষি বাল্মীকি ও কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের মুখ্য উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, উঁহারা যাহা লিখিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে কবিত্ব রহিয়া গিয়াছে,—হয় ত উঁহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু কবিত্ব যে আছে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ করিবার উপায় নাই।

রামায়ণ-মহাভারতে কবিত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলেই, মহর্ষিদ্বয়কে মহাকবি ও তাঁহাদের কাব্যদ্বয়কে মহাকাব্য না বলিলে চলে না। কেন না, ভাষাতে আর কোন শব্দ নাই, যদ্দ্বারা এই কাব্যদ্বয়ের সঙ্গত নামকরণ চলিতে পারে। কুমার-সম্ভব-কিরাতার্জ্জুনীয়কে আপাতত মহাকাব্যের শ্রেণী হইতে খারিজ করিয়া দিয়া আমরা রামায়ণ-মহাভারতকেই মহাকাব্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

মনে হইতেছে মেকলে কোথায় বলিয়াছেন, সভ্যতার সহিত কবিত্বের কতকটা খাদ্য-খাদক বা অহি-নকুল সম্বন্ধ রহিয়াছে। সভ্যতা কবিত্বকে গ্রাস করে; অথবা সভ্যতার আওতায় কবিতার লতা বাড়িতে পায় না। বলা বাহুল্য, মেকলের অনেক উক্তির মত এই উক্তিটিকেও সুধীজনে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। বিগত উনবিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার আস্ফালন

সত্ত্বেও ইউরোপখণ্ডে কবিত্বের যেরূপ স্ফূর্ত্তি দেখা গিয়াছে, তাহাই তাহার প্রমাণ। অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই।

কিন্তু আমার বোধ হয় মেকলের ঐ উক্তির ভিতর একটু প্রচ্ছন্ন সত্য আছে। সভ্যতা কবিত্বের মস্তক চর্ব্বণ না করিতে পারে, কিন্তু মহাকাব্যকে বোধ করি সশরীরে গ্রাস করিয়া ফেলে। আবার বলা আবশ্যক, মহাকাব্য-শব্দ আমি আলঙ্কারিক-সম্মত অর্থে ব্যবহার করিতেছি না। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও প্যারাডাইস্ লষ্ট্‌কে আমি এ স্থলে মহাকাব্যের মধ্যে ফেলিতেছি না। রামায়ণ-মহাভারত যে পর্য্যায়ের কাব্য, সেই পর্য্যায়ের কাব্যকেই আমি মহাকাব্য বলিতেছি। পৃথিবীতে কত কবি কত কাব্য লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, কিন্তু মহাকাব্য সে-ই কোন্ কালে রচিত হইয়া গিয়াছে, তাহার পর আর একখানাও রচিত হইল না। পাশ্চাত্ত্য কাব্যসাহিত্যে লেখকের কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি নাই; কিন্তু সন্দেহ হয়, কেবল হোমারের নামে প্রচলিত গ্রন্থদুইখানি ব্যতীত আর কোন কাব্যকে রামায়ণ-মহাভারতের সমান পর্য্যায়ে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। পাশ্চাত্ত্য দেশে সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত কবিত্বের অবনতি হইয়াছে, এ কথা কেহই বলিতে পারিবেন না; কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়ারের নাম মনে রাখিয়াও অকুতোভয়ে বলা যাইতে পারে, ইউরোপ-মহাদেশেও এক বারের বেশী হোমারের জন্ম হয় নাই।

বস্তুতই পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে ও সভ্যতার ইতিহাসে কোন্ প্রাচীনকালে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের উদ্ভব হইয়াছিল; তাহার পর কত-হাজার বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু মহাকাব্যের আর উৎপত্তি হইল না। কেন এরূপ হইল, তাহার

কারণ চিন্তনীয় ; কিন্তু সেই কারণ আবিষ্কারে লেখকের ক্ষমতা নাই। তবে এক একবার মনে হয়, মনুষ্যসমাজের বর্ত্তমান অবস্থাই বোধ করি আর সেই-শ্রেণীর মহাকাব্য উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল নহে।

রামায়ণ-মহাভারত ও হোমারের মহাকাব্যে আমরা মনুষ্য-সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত দেখি, তাহাতে সেই সমাজকে আধুনিক হিসাবে সভ্য বলিতে পারা যায় না। মনুষ্যসমাজের সে অবস্থা আবার কখনও ফিরিয়া আসিবে কি না, তাহা জানি না ; কিন্তু তাৎকালিক সমাজে যে সকল ঘটনা প্রতিদিন সংঘটিত হইত, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা ঘটিতে পারে না। আমরা এমন কল্পনায় আনিতে পারি না যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি কোন ইউরোপের রাজসভায় আতিথ্য-স্বীকার করিয়া অবশেষে রাজলক্ষ্মীকে ষ্টীমারে তুলিয়া প্রস্থান করিতেছেন, ও তাহার প্রতিশোধগ্রহণার্থ ইউরোপের নরপালবর্গ ওয়াশিংটন অবরুদ্ধ করিয়া দশবৎসরকাল বসিয়া আছেন। ডিলারী বন্দীকৃত লর্ড মেথুয়েন্‌কে গাড়ির চাকায় বাঁধিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার বন্ধুর উপত্যকায় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছেন, ইহা কোন দিনের টেলিগ্রামে দেখিবার কেহ আশা করেন নাই। সিডান্‌-ক্ষেত্রে বিসমার্ক লুই নেপোলিয়ন্‌কে হস্তগত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার বুক চিরিয়া নেপোলিয়ন্‌-বংশের শোণিতের আস্বাদগ্রহণ আবশ্যক বোধ করেন নাই। ত্রেতাযুগ অবসানের বহুদিন পরে বুয়রদেশে লঙ্কাকাণ্ডের অপেক্ষাও তুমুল ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু কোন বিজয়ী মহাবীরকে তজ্জন্য লাঙ্গুলের ব্যবহার করিতে হয় নাই।

সেকালের এই অসভ্যতা আমাদের চোখে বড়ই বীভৎস ঠেকে সন্দেহ নাই ; কিন্তু সেকালের সামাজিকতার আর একটা দিক্ আছে, একালে সে দিক্‌টাও তেমন দেখিতে পাই না। বার্ক এক সময় আপনার মহাপ্রাণতার ঝোঁকে বলিয়াছিলেন, শিভাল্‌রির দিন গত হইয়াছে। শিভাল্‌রি-নামক অনির্ব্বাচ্য বস্তু নগ্ন বর্ব্বরতার সহিত নিরাবরণ মনুষ্যত্বের অপূর্ব্ব মিশ্রণে সমুৎপন্ন। একালে মানুষ মানুষের রক্তপান করিয়া জিঘাংসার তৃপ্তি করিতে চাহে না বটে ; কিন্তু আবার জ্যেষ্ঠভ্রাতার কটাক্ষ-মাত্রশাসনে, পত্নীর অপমান স্বচক্ষে দেখিয়াও, আত্মসংযমে সমর্থ হয় কি না, বলা যায় না। একালের রাজারা মালকোঁচা মারিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গদাহস্তে অবতীর্ণ হন না সত্য বটে, কিন্তু ভীমরতিগ্রস্ত পিতার একটা কথা রাখিবার জন্য ফিজিদ্বীপে নির্ব্বাসন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকেন কি না বলিতে পারি না। অশ্বত্থামা ঘোর নিশাকালে সুখসুপ্ত বালকবৃন্দের হত্যাসাধন করিয়া ভীষণ ক্রূরতা দেখাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু সভা ডাকিয়া ও খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া সেই ক্রূরতার সমর্থন তাঁহার নিতান্তই আবশ্যক হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণ যখন জয়বিষয়ে নিতান্ত হতাশ হইয়া নিশাকালে শত্রুশিবিরে ভীষ্মের নিকট দীনভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ভীষ্মকে তাঁহার জীবনটুকু দান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের লৌহবর্ম্মের অন্তরালে কারেন্‌সি নোটের গোছা লইয়া যাওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই।

গত চারি হাজার বৎসরের মধ্যে মনুষ্যসমাজের বাহিরের মূর্ত্তিটা অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে সত্য কথা, কিন্তু

তাহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতির কতটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা বলা দুষ্কর। মনুষ্যের বাহিরের পরিচ্ছদটা সম্পূর্ণ বদ্‌লাইয়াছে, কিন্তু মনুষ্যের ভিতরের গঠন অনেকটা একরূপই আছে। সেকালের রাজরাজড়াও বোধ করি সময়মত কৌপীনধারী হইয়া সভামধ্যে বাহির হইতে লজ্জিত হইতেন না; কিন্তু এখনকার অন্নহীন শ্রমজীবীরাও সমস্ত অঙ্গের মালিন্য ও বিরূপতা পোষাকের আচ্ছাদনে আবৃত রাখিতে বাধ্য হয়। সেকালে ক্রূরতা ছিল, বর্ব্বরতা ছিল, পাশবিকতা ছিল, এবং তাহা নিতান্ত নগ্ন, নিরাবরণ অবস্থাতেই ছিল। তাহার উপর কোনরূপ আচ্ছাদন, কোনরূপ পালিশ্, কোনরূপ রঙ্-ফলান ছিল না। একালেও ক্রূরতা, বর্ব্বরতা ও পাশবিকতা হয় ত ঠিক তেমনি বর্ত্তমান আছে; তবে তাহার উপর একটা কৃত্রিম ভণ্ডামির আবরণ স্থাপিত হইয়া তাহার বীভৎস ভাবকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে। সম্প্রতি চীনদেশে সভ্য ইউরোপের সম্মিলিত সেনা যে পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে আটিলা ও জঙ্গিস্ খাঁর প্রেতাত্মার আর লজ্জিত হইবার কোন কারণই নাই।

বস্তুতই চারি হাজার বৎসরের ইতিহাস সূক্ষ্মভাবে তলাইয়া দেখিলে বুঝা যায়, মনুষ্যচরিত্র অধিক বদ্‌লায় নাই; তবে সমাজের মূর্ত্তিটা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে; এবং মনুষ্য-সমাজের অবস্থা যে-কাব্যগ্রন্থে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, সেই কাব্যের মূর্ত্তিও যে তদনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। বিস্ময়ের কারণ থাক্ আর নাই থাক্, আধুনিক কালের সাহিত্যে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের আর আবির্ভাব হয় নাই, এবং আর যে কখনও হইবে, তাহা

আশা করাও দুষ্কর। সাহিত্যে মহাকাব্যের যুগ বোধ হয় অতীত হইয়া গিয়াছে। কালের যখন অবধি নাই ও পৃথ্বী যখন বিপুলা, তখন বড় কবির ও কাব্যের অসম্ভাব কখন হইবে না, কিন্তু মনুষ্যসমাজের সেই প্রাচীন অবস্থা ফিরিয়া আসিবার যদি সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে মহাকবির ও মহাকাব্যের বোধ করি আবির্ভাব আর হইবে না।

বস্তুতই আর আবির্ভাবের আশা নাই। মহাকাব্যের মধ্যে একটা উন্মুক্ত অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা আছে, তাহা বোধ করি আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না। সুনিপুণ শিল্পী একালে তাজমহল গড়িতে পারেন, কিন্তু পিরামিডের দিন বুঝি একেবারে চলিয়া গিয়াছে। মহাকাব্যগুলিকে আমরা মহাকায় অদ্ভুত পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। এক একবার মনে হয়, উহাদিগকে কোন মানবহস্তনির্ম্মিত কৃত্রিম কারুকার্য্যের সহিত তুলনা না করিয়া প্রকৃতির হস্তনির্ম্মিত নৈসর্গিক পদার্থের সহিত উপমিত করা উচিত।

আমাদের ভারতবর্ষের মহাভারতকে এক একবার ভারতবর্ষের হিমাচলের সঙ্গে তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। হিমাচল যেমন তাহার বিপুল পাষাণকলেবরের অঙ্কদেশে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছে, মহাভারতের বিপুল কলেবর তেমনি ভারতীয় সাহিত্যকে কত সহস্র বৎসর কাল অঙ্কে রাখিয়া লালন-পালন ও পোষণ করিয়া আসিতেছে। হিমাচলের বিশাল বক্ষোদেশ হইতে বিনিঃসৃত সহস্র উৎস হইতে সহস্র স্রোতস্বিনী অমৃত-রসপ্রবাহে ভারতভূমিকে আর্দ্র ও সিক্ত করিয়া 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' পুণ্যভূমিতে পরিণত করিয়াছে, সেইরূপ মহাভারতের

মধ্য হইতে সহস্র উপাখ্যান, সহস্র কাহিনী, সহস্র কথা সমগ্র জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে সহস্র ধারা প্রবাহিত করিয়া পুণ্যতর ভাবপ্রবাহে জাতীয় সাহিত্যকে চিরহরিৎ রাখিয়া বহুকোটি লোকের জাতীয় জীবনে পুষ্টি ও কান্তি প্রদান করিয়া আসিতেছে। ভূতত্ত্ববিৎ যেমন হিমাচলের ক্রমবিন্যস্ত স্তরপরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার মধ্য হইতে কত বিস্ময়কর জীবের অস্থিকঙ্কাল উদ্ধার করিয়া অতীতের লুপ্তস্মৃতি কালের কুক্ষি হইতে উদ্ঘাটন করেন; সেইরূপ প্রত্নতত্ত্ববিৎ এই বিশাল গ্রন্থের স্তরপরম্পরা হইতে ভারতীয় জনসমাজের অতীত ইতিহাসের বিস্মৃত নিদর্শনের চিহ্ন ধরিয়া ইতিহাসের অতীত অধ্যায় আবিষ্কার করেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

বুদ্ধচরিত

জাতকে লিখিত আছে যে, সিদ্ধার্থ আষাঢ় মাসে পূর্ণিমা তিথিতে পিতৃগৃহ হইতে অভিনিষ্ক্রমণ করেন। সেই রাত্রে তাঁহার রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া অনেক যোজন দূরে অনোমা নামক নদীর তীরে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে অশ্ব হইতে নামিয়া রাজমুকুট দূরে ফেলিয়া দিলেন, ও অঙ্গ হইতে মনিমুক্তা আভরণ সকল খুলিয়া ছন্দকের হস্তে দিয়া কহিলেন, "ছন্দক, এই সমস্ত আভরণ নাও, আর কণ্টককে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাও; আমি এ স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।" ছন্দক বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া কহিল, "প্রভু! আমাকে ফিরাবেন না, আমিও গৃহত্যাগী হইয়া আপনার অনুগামী হইব।" কিন্তু সিদ্ধার্থ তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, তাহাকে ফিরিয়া যাইতে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিলেন, বলিলেন, "তোমার এখনও সন্ন্যাস-গ্রহণের সময় হয় নাই, তুমি না ফিরিলে আমি কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছি মনে করিয়া আমার পিতা ও বাড়ীর আর সকলে কি ভাবিবে? তুমি যাও, এবং রাজবাটীর সকলকে বল আমার সমস্তই মঙ্গল। আমি বহুকাল ধরিয়া যে প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছি, এক্ষণে তাহা পালন করিতে চলিলাম, আমার অভীষ্ট-সিদ্ধ হইলেই আমি বাড়ী ফিরিব, আমার জন্য কেহ যেন চিন্তাকুল না হন।"

কুমারের আদেশক্রমে ছন্দক অগত্যা অশ্ব ও আভরণ লইয়া শোকার্ত্তহৃদয়ে রাজভবনে ফিরিয়া গেল, এবং রাজাকে সংবাদ দিল যে, যুবরাজ গৃহত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসিবেশে কোথায় চলিয়া গেলেন তাহার কোন ঠিকানা নাই।

গৌতম ছন্দককে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে বিশ্রাম করত পরিশেষে মগধ-রাজধানী রাজগৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। বিম্বিসার তখন ঐ প্রদেশের প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। সিদ্ধার্থ নগরে ভিক্ষা করিয়া নিজের আহার সংগ্রহ করিতেন। তাঁহার শরীরে অলোকসামান্য তেজঃপুঞ্জদৃষ্টে নাগরিকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। এই নবীন সন্ন্যাসীর আগমনবার্ত্তা রাজসভা পর্য্যন্ত পৌঁছে। বিম্বিসার একদিন প্রাতঃকালে বহু পরিজন সমভিব্যাহারে বহুমূল্য ভেট লইয়া সিদ্ধার্থের সমীপে উপস্থিত হন। তিনি তাঁহার সুবিমল দেহকান্তি দর্শনে বিমোহিত হইলেন। পরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রভু! আপনার দর্শন লাভ করিয়া আমি পরম প্রমুদিত হইয়াছি। আপনি আমার সহকারী হউন। যদি আপনি আমার অনুবর্ত্তী হন, আপনি এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইবেন। আপনি যাহা চান সকলই পাইবেন।" তৎপরে তাঁহাকে বহুবিধ মূল্যবান্ সামগ্রী উপঢৌকন দিয়া কহিলেন, "আমার সঙ্গে আসুন, এই দুর্লভ কাম্যবস্তুসকল উপভোগ করিয়া সুখী হইবেন।" এই সাধুকে গৃহস্থাশ্রমে ফিরাইয়া আপনার পার্শ্বচর করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে রাজা এইরূপ অশেষ প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। সিদ্ধার্থ মধুর প্রিয় বাক্যে উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আপনার সর্ব্বথা মঙ্গল হউক, এই সকল ভোগ্য

বিষয় আপনারি থাকুক, আমি কোন কাম্যবস্তুর প্রার্থী নহি। বিষয়-বাসনা আমার চিত্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে। আমার লক্ষ্যস্থান স্বতন্ত্র।" পরে তিনি রাজার নিকট আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন, "কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোদন আমার পিতা। বুদ্ধত্ব লাভের আশয়ে আমি পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছি।" বিম্বিসার তখন বলিলেন, "স্বামিন্, আমি তবে বিদায় হই। আপনি যদি ভবিষ্যতে বুদ্ধত্ব লাভ করেন, আমি আপনার ধর্ম্মের আশ্রয় লইব।" এই বলিয়া বিম্বিসার তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া রাজগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাজার সহিত সিদ্ধার্থের এই প্রথম পরিচয়। এক্ষণে তিনি বোধিসত্ব—বুদ্ধত্ব লাভের পর তাঁহাদের পুনর্ম্মিলন হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধির নানা উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

রাজগৃহ ভাগীরথীর রমণীয় অধিত্যকায় অবস্থাপিত এক অপূর্ব্ব সাধনক্ষেত্র। বিন্ধ্যাচলের উত্তরস্থ পঞ্চ শৈলখণ্ডে পরিবেষ্টিত বাহিরের উপপ্লব হইতে সুরক্ষিত, প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্য্যে পরিবৃত, বিজনতাসুলভ অথচ নগরীর সন্নিকর্ষবশতঃ ভিক্ষান্ন-সংগ্রহের অনুকূল ইত্যাদি কারণে, ঐ সকল গিরিগুহায় বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী বাস করিত। তাহাদের মধ্যে আলাড় কলম ও রুদ্রক নামক দুইজন খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ উপাধ্যায়ের সঙ্গে গৌতমের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। প্রথমে তিনি আলাড় কলমের নিকট গমন করেন: আলাড়ের তিন শত শিষ্য ছিল। গৌতম তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকটে দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, কিন্তু সে শিক্ষায় তিনি তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। পরে তিনি রুদ্রকের নিকট কিছু কাল ধর্ম্মশিক্ষা করেন। তাহাও

তাঁহার মনঃপূত হইল না। এই দুই গুরূপদিষ্ট জ্ঞানমার্গে তাঁহার অভীপ্সিত গম্যস্থানে পৌঁছিতে না পারিয়া, তিনি সিদ্ধিলাভের অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

পুরাকাল হইতে ভারতবর্ষে এই একটি সংস্কার বদ্ধমূল আছে যে, তপশ্চর্য্যার দ্বারা দেবতাদেরও সমকক্ষ হওয়া সম্ভব হয়, এবং দৈবশক্তি, অন্তর্দৃষ্টি লাভ ও প্রভূত পুণ্যসঞ্চয় করা যায়। আলাড় ও রুদ্রকের নিকটে দর্শন শিক্ষা করিয়াও গৌতম যখন সন্তোষ লাভ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি স্থির করিলেন যে, একান্তে অবস্থানপূর্ব্বক সেই লোকবিশ্রুত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তাহার চূড়ান্ত সীমা পর্য্যন্ত গিয়া দেখিবেন তিনি কি ফল লাভ করিতে পারেন। তদনুসারে তিনি বর্ত্তমান বুদ্ধগয়ার মন্দিরের সন্নিকট উরুবেলা বনে গমন করিয়া, নৈরঞ্জনা নদীতীরে পাঁচজন অনুরক্ত শিষ্যের সাহচর্য্যে ছয় বৎসর যাবৎ ঘোরতর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। "শূন্যে আলম্বিত বৃহৎ ঘণ্টাধ্বনির ন্যায়" তাঁহার এই তপস্যার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। এই কঠোর তপশ্চরণে তাঁহার মুখবিবর ও নাসিকারন্ধ্র হইতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হইল। ক্রমে তাঁহার কর্ণচ্ছিদ্র রুদ্ধ হইল। তিনি তাঁহার আহার সংযত করিয়া আনিলেন, এমন কি শেষে একটিমাত্র তণ্ডুল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন, এবং এইরূপ উপবাস ও শরীর-শোষণে অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গেলেন। অবশেষে একদিন চিন্তামগ্ন চিত্তে ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে করিতে তিনি হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিল যে তাঁহার যথার্থই মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু ক্রমে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলেন। এই

অবস্থায় একটি রাখাল বালক তাঁহাকে এক বাটী দুগ্ধ আনিয়া দিল, সেই দুগ্ধ পান করিয়া তিনি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন। এই প্রকার তপশ্চর্য্যার দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফললাভে হতাশ হইয়া পূর্ব্ববৎ নিয়মিত আহারাদি করিতে লাগিলেন, এবং তপস্যার সংকল্প ত্যাগ করিলেন। এই সঙ্কট সময়ে, "যখন তাঁহার পক্ষে অপরের সমবেদনা বিশেষ আবশ্যক ছিল, যখন অনুরক্তজনের প্রীতি, ভক্তি ও উৎসাহবাক্য তাঁহার সংশয়াচ্ছন্ন চিত্তে বল দিতে পারিত, তখন তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বারাণসী চলিয়া গেল। তপশ্চরণ পরিত্যাগ করার দরুন তিনি তাহাদের শ্রদ্ধা হারাইলেন, এবং এই দারুণ দুঃসময়ে তিনি তাহাদের কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বিফলতার তীব্র জ্বালা একাকী সহ্য করিতে বাধ্য হইলেন।"

এই অসহায় অবস্থায় তিনি নৈরঞ্জনাতীরে একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে নিকটস্থ এক অশ্বত্থ বৃক্ষতলে গিয়া ধ্যানমগ্ন হন। ইহার অব্যবহিতপূর্ব্বে পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীবাসিনী সুজাতা নাম্নী একটি সাধ্বী রমণী এই বনে আগমন করেন। সুজাতা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—"আমার একটি শিশু-সন্তান হইলে বনদেবতার নিকট পূজা দিব।" যখন তিনি এই ঘোরতর উপোষণাদি কৃচ্ছ্রসাধনে ম্রিয়মাণ তপস্বীকে দেখিলেন, তিনি তাঁহাকে বনদেবতা ভাবিয়া তাঁহার সম্মুখে ভেট লইয়া আসিলেন। সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, কি আনিয়াছ?" সুজাতা কহিলেন, "আমি আপনার জন্য এই পরম উপাদেয় পরমান্ন আনিয়াছি। ভগবন্! সদ্যঃপ্রসূত শত গাভীদুগ্ধে আমি পঞ্চাশটি গাভী পোষণ করিয়াছি, তাহাদের দুগ্ধে পঁচিশ, তাহাদের দুগ্ধে আবার বারোটি গাভী

পরিপুষ্ট। এই দ্বাদশ গাভীর দুগ্ধ পান করাইয়া আমার পালের মধ্যে ছয়টি ভাল ভাল গরু বাছিয়া তাহাদের দুধ দুহিয়া লই। সেই দুগ্ধ উৎকৃষ্ট তণ্ডুলে সুগন্ধি মশলা দিয়া পাক করিয়া আনিয়াছি। আমার ব্রত এই যে, দেবতার অনুগ্রহে আমার একটি পুত্র-সন্তান জন্মিলে, এই অন্ন উৎসর্গ করিয়া দেবার্চ্চনা করিব। প্রভু! এখন সেই পরমান্ন লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি, প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করুন।"* সিদ্ধার্থ সুজাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "তুমি যেমন তোমার ব্রত পালন করিয়া সুখী হইয়াছ, সেইরূপ আমিও যেন আমার জীবনব্রত সাধন করিতে সক্ষম হই।" এই দুগ্ধপানে তিনি শরীরে বল পাইয়া পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষতলে গিয়া যোগাসনে আসীন হইলেন। সেই রাত্রে ঐ বৃক্ষতলে সমাধিস্থ হইয়া তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া প্রবুদ্ধ হইলেন। সেই অবধি ঐ বৃক্ষ বোধিবৃক্ষ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল।

বোধিসত্ত্ব যখন নৈরঞ্জনাতীরে বোধিদ্রুমমূলে যোগাসনে আসীন হন, তখন তিনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং।
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু॥
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং।
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥

এ আসনে দেহ মম যাক্ শুকাইয়া,
চর্ম্ম অস্থি মাংস যাক্ প্রলয়ে ডুবিয়া।

* *Light of Asia*—Edwin Arnold.

না লভিয়া বোধিজ্ঞান দুর্লভ জগতে,
টলিবে না দেহ মোর এ আসন হ'তে।

এই আসনে বসিয়া বোধিসত্ত্বের দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত হইল। তিনি তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিলেন। তিনি বৃক্ষতলে ধ্যানযোগে জগতের যে কার্য্যকারণশৃঙ্খল প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহা এই,—

অবিদ্যা হইতে সংস্কার।
সংস্কার হইতে বিজ্ঞান (Consciousness)।
বিজ্ঞান হইতে নামরূপ।
নামরূপ হইতে ষড়ায়তন (অর্থাৎ মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়)।
ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ।
স্পর্শ হইতে বেদনা।
বেদনা হইতে তৃষ্ণা।
তৃষ্ণা হইতে উপাদান (আসক্তি)।
উপাদান হইতে ভব।
ভব হইতে জন্ম।
জন্ম হইতে রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, দুঃখ ও যন্ত্রণা।

অবিদ্যাই সকল দুঃখের মূল। অবিদ্যা-নাশে সংস্কার বিনষ্ট হয়; পরে নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, তৃষ্ণা, আসক্তি প্রভৃতি পর্য্যায়ক্রমে বিনষ্ট হইলে, জন্মবন্ধন ছিন্ন হয়; পরিশেষে জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক, সর্ব্ব দুঃখ বিদূরিত হয়। এইরূপে দুঃখের মূলকারণ ও মূলচ্ছেদ বুদ্ধদেব ধ্যানযোগে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, অবিদ্যা বা অজ্ঞানই আমাদের সকল দুঃখের কারণ, এবং অবিদ্যার অপগমেই দুঃখের সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়।

বোধিসত্ত্ব যে মুহূর্ত্তে জগতের দুঃখের উৎপত্তি ও নিরোধের এইরূপ প্রণালী নির্দ্ধারণ করিলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তিনি "বুদ্ধ" এই নাম ধারণ করেন।

বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াই তিনি নিম্নোদ্ধৃত উদান গান করিয়াছিলেন,—

অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্‌সম্‌ অনিব্বিসম্‌
গহকারকং গবেসন্তো দুঃখাজাতি পুনপ্পুনং।
গহকারক দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি
সব্বাতে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংখিতং
বিসংখারগতং চিত্তং তণ্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা।

জন্মজন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান,
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্ম্মাণ।
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহকারক! গৃহ না পারিবি রচিবারে আর;
ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহভিত্তিচয়,
সংস্কার-বিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাদম্বরী

শূদ্রক নামে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন অতিবদান্য মহাবল পরাক্রান্ত অশেষ-গুণশালী এক নরপতি ছিলেন। বিদিশা নাম্নী তাঁহার রাজধানী উন্মত্তকলহংস-কোলাহল-মুখরিত বেগবতী বেত্রবতী নদীর কূলে অবস্থিত ছিল। রাজা নিজ বাহুবলে ও পরাক্রমে অশেষ দেশ জয় করিয়া সসাগরা ধরায় আধিপত্য স্থাপন-পূর্ব্বক সুখে ও নিরুদ্বেগচিত্তে কাব্য-ইতিহাস, সঙ্গীত-আলেখ্য ইত্যাদির আলোচনা ও সাম্রাজ্যভোগ করিতেছিলেন। একদা রাজা প্রাতঃকালে অমাত্য কুমারপালিত ও অন্যান্য রাজকুমারের সহিত সভামণ্ডপে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে বিষধরজড়িত চন্দনলতার ন্যায় ভীষণ-রমণীয়া, অঙ্গনাজনবিরুদ্ধ কিরীচাস্ত্রধারিণী, শরৎ-লক্ষ্মীর ন্যায় কলহংসশুভ্রবসনা, এবং বিন্ধ্যবনভূমির ন্যায় বেত্রলতাবতী প্রতীহারী আসিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে নিবেদন করিল, "মহারাজ! দক্ষিণাপথ হইতে এক চণ্ডালকন্যা আসিয়াছে। তাহার সমভিব্যাহারে এক শুকপক্ষী। সে বলিতেছে, 'মহারাজ সকল রত্নের আকর, অতএব এই পক্ষি-রত্ন তাঁহার পাদপদ্মে সমর্পণ করিতে আসিয়াছি।' সেই চণ্ডাল-কন্যা দ্বারে দণ্ডায়মানা আছে, অনুমতি হইলে আসিয়া পাদপদ্ম দর্শন করে।"

রাজা প্রতীহারীর বাক্য শুনিয়া সাতিশয় কৌতুকাবিষ্ট হইলেন এবং সমীপবর্ত্তী সভাসদ্গণের মুখাবলোকনপূর্ব্বক কহিলেন,

"হানি কি, লইয়া আইস।" প্রতীহারী 'যে আজ্ঞা', বলিয়া চণ্ডালকন্যাকে সঙ্গে করিয়া আনিল। চণ্ডালকন্যা অমলমণিকুট্টিমস্থ সভামণ্ডপে প্রবেশ করিয়া দেখিল উপরে অনতিবৃহৎ মনোহর চন্দ্রাতপ, তাহার অমলশুভ্র দুকূলবিতান কনকশৃঙ্খলনিয়মিত চারি মণিদণ্ডে বিধৃত রহিয়াছে, চন্দ্রাতপের চতুর্দ্দিকে স্থূল মুক্তাকলাপ মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে; নিম্নে রাজা বিবিধ স্বর্ণময় অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া মণিময় সিংহাসনে বসিয়া আছেন; তাঁহার বামপদ জ্যোৎস্নাশুভ্র স্ফাটিক পাদপীঠে বিন্যস্ত রহিয়াছে; অমৃতফেনের ন্যায় লঘুশুভ্র পরিধেয় দুকূলবসনের প্রান্তে গোরোচনা-অঙ্কিত হংস-মিথুন কনকদণ্ডযুক্ত চামরের বাতাসে প্রনর্ত্তিত হইতেছে; মস্তকে আমোদিত মালতীমালা, যেন উষাকালে অস্তাচলশিখর তারকাপুঞ্জ-বিক্ষিপ্ত; সমাগত রাজগণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। অন্যান্য পর্ব্বতের মধ্যগত হইলে কনকশিখর সুমেরুর যেরূপ শোভা হয়, রাজা সেইরূপ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া সভামণ্ডপ উজ্জ্বল করিতেছেন। চণ্ডালকন্যা সভার শোভা দেখিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইল এবং নৃপতিকে অনন্যমনা করিবার ইচ্ছায় রক্তকুবলয়দল-কোমল-করস্থিত বেণুযষ্টি দ্বারা মণিময় সভাকুট্টিমে একবার আঘাত করিল। তাহাতে চণ্ডালকন্যার হস্তস্থিত রত্নবলয় বাজিয়া উঠিল। তালফল পতিত হইলে অরণ্যচারী হস্তিযূথ যেমন সেইদিকে দৃষ্টিপাত করে, বেণুযষ্টির শব্দ শুনিবামাত্র সেইরূপ সকলের চক্ষু রাজার মুখমণ্ডল হইতে অপসৃত হইয়া সেইদিকে প্রসৃত হইল।

রাজাও সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, অগ্রে একজন পলিতকেশ ব্যায়ামপুষ্টশরীর বৃদ্ধ, পশ্চাতে স্বর্ণশলাকানির্ম্মিত-পিঞ্জরহস্তে কাকপক্ষধারী একটি বালক এবং মধ্যে এক পরমা

সুন্দরী অচিরোদ্ভিন্নযৌবনা কুমারী আসিতেছে। সেই কুমারী সঞ্চারিণী ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্মিত পুত্তলিকার ন্যায়, তাহার সর্ব্বশরীর আগুল্‌ফলম্বিত নীল কঞ্চুক দ্বারা আবৃত, তাহার উপর রক্তাংশুক-রচিত অবগুণ্ঠন—যেন নীলোৎপলের উপর সন্ধ্যার লোহিত-লাবণ্য। সে নিদ্রার মত লোচনগ্রাহিণী, অশরীরিণীর মত স্পর্শবর্জ্জিতা, চিত্র-লিখিতার মত শুধু দর্শনীয়া, মূর্চ্ছার ন্যায় মনোহরা। কন্যার এরূপ রূপলাবণ্য যে, কোন ক্রমেই তাহাকে চণ্ডালকন্যা বলিয়া বোধ হয় না। রাজা তাহার নিরুপম সৌন্দর্য্য ও অসামান্য সৌকুমার্য্য অনিমিষলোচনে অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ভাবিলেন, বিধাতা বুঝি হীনজাতি বলিয়া ইহাকে স্পর্শ করেন নাই, মনে মনে কল্পনা করিয়াই ইহার রূপলাবণ্য নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। তাহা না হইলে এরূপ রমণীয় কান্তি ও এরূপ অলৌকিক সৌন্দর্য্য কিরূপে হইতে পারে। যাহা হউক, চণ্ডালের গৃহে এরূপ সুন্দরী কুমারীর সমুদ্ভব নিতান্ত অসম্ভব ও আশ্চর্য্যের বিষয়। এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে কন্যা সম্মুখে আসিয়া বিনীতভাবে প্রণাম করিল। বৃদ্ধ পিঞ্জর লইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বিনয়-বচনে নিবেদন করিল,—"মহারাজ! পিঞ্জরস্থিত এই শুক সকল শাস্ত্রে পারদর্শী, রাজনীতিপ্রয়োগবিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ, সদ্বক্তা, চতুর, নৃত্যগীতচিত্র প্রভৃতি সকলকলাভিজ্ঞ, কাব্য-নাটক-ইতিহাসের মর্ম্মজ্ঞ ও গুণগ্রাহী। যে-সকল বিদ্যা মনুষ্যেরাও অবগত নহেন তৎসমুদায় ইহার কণ্ঠস্থ। ইহার নাম বৈশম্পায়ন। ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত নরপতি অপেক্ষা আপনি বিদ্বান্ ও গুণগ্রাহী। এই নিমিত্ত আমাদিগের স্বামি-দুহিতা আপনার নিকট এই শুকপক্ষী আনয়ন করিয়াছেন। অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে

ইনি আপনাকে চরিতার্থ বোধ করেন।" এই বলিয়া সম্মুখে পিঞ্জর রাখিয়া সে কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইল।

পিঞ্জরমধ্যবর্ত্তী শুক দক্ষিণ চরণ উন্নত করিয়া অতি স্পষ্টবাক্যে 'মহারাজের জয় হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। রাজা শুকের মুখ হইতে অর্থযুক্ত সুস্পষ্ট সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর কুমারপালিতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ অমাত্য! পক্ষিজাতিও সুস্পষ্টরূপে বর্ণোচ্চারণ করিতে ও মধুরস্বরে কথা কহিতে পারে। আমি জানিতাম পক্ষী ও পশুজাতি কেবল আহার, নিদ্রা, ভয় প্রভৃতিরই পরতন্ত্র, উহাদিগের বুদ্ধিশক্তি অথবা বাকৃশক্তি কিছুই নাই। কিন্তু শুকের এই ব্যাপার দেখিয়া অতি আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। প্রথমতঃ, ইহাই আশ্চর্য্য যে, পক্ষী মনুষ্যের মত কথা কহিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, আশীর্ব্বাদ প্রয়োগের সময় ব্রাহ্মণেরা যেরূপ দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, শুকপক্ষীও সেইরূপ দক্ষিণ চরণ উন্নত করিয়া যথাবিহিত আশীর্ব্বাদ করিল। কি আশ্চর্য্য! ইহার বুদ্ধি এবং মনোবৃত্তিও মনুষ্যের মত দেখিতেছি।"

রাজার কথা শুনিয়া কুমারপালিত কহিলেন, "মহারাজ! পক্ষিজাতি যে মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতে পারে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। লোকেরা শুক শারিকা প্রভৃতি পক্ষীদিগকে প্রযত্নাতিশয়-সহকারে শিক্ষা দেয় এবং উহারাও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারবশতঃ অনায়াসে শিখিতে পারে।" এই কথা কহিতে কহিতে সভাভঙ্গসূচক মধ্যাহ্নকালীন শঙ্খধ্বনি হইলে সমগ্র সভা চঞ্চল ও মুখর হইয়া উঠিল। স্নানসময় উপস্থিত দেখিয়া নরপতি সমাগত রাজাদিগকে সম্মানসূচক বাক্যপ্রয়োগ দ্বারা

সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন, চণ্ডালকন্যাকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন এবং তাম্বূলকরঙ্কবাহিনীকে কহিলেন, "তুমি বৈশম্পায়নকে অন্তঃপুরে লইয়া যাও ও স্নান-ভোজন করাইয়া দাও।"

তৎপরে আপনি সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, ইহাতে তাঁহার কণ্ঠদাম দুলিয়া উঠিল, উত্তরীয় বস্ত্র হইতে পিঙ্গলবর্ণ কুঙ্কুম-চূর্ণরেণু স্খলিত হইয়া পড়িতে লাগিল, কর্ণোৎপল দুলিয়া দুলিয়া গণ্ডস্থল স্পর্শ করিতে লাগিল। চামরগ্রাহিণী বারবিলাসিনীগণ স্কন্ধদেশে চামর ফেলিয়া সসম্ভ্রমে সরিয়া যাইতে তাহাদের মণিনূপুর কমল-মধুপানমত্ত-কলহংসনাদের মত বাজিয়া উঠিল, চারিদিকে সকলে প্রণত হইল।

রাজা কতিপয় সুহৃৎ সমভিব্যাহারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ভূষণ ও পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিয়া চন্দ্রতারকাশূন্য গগনের মত শোভমান হইলেন। ব্যায়ামের উপকরণসমূহ সমাহৃত হইলে সমবয়স্ক রাজকুমারগণের সহিত কিয়ৎকাল ব্যায়াম করিলেন। তখন পরিজনসকল স্নানোপকরণ সমাহরণের জন্য সত্বর হইয়া উঠিল এবং অল্প লোকের সত্বর ইতস্ততঃ গমনাগমনে রাজভবন জনাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

স্নানাগারে সিতবিতান প্রলম্বিত রহিয়াছে; পরিচারিকাসকল মণ্ডলাকারে অপেক্ষা করিতেছে; স্ফাটিক স্নানপীঠ পাতা আছে; তাহার পার্শ্বে অতিসুরভি-গন্ধ-সলিলপূর্ণ স্নানকলসসকল সজ্জিত; পরিমলাকৃষ্ট ভ্রমরকুল কলসমুখ অন্ধকার করিয়া উড়িতেছে, যেন আতপভয়ে কলসমুখ নীলবস্ত্রে আবৃত রাখা হইয়াছে; মধ্যস্থলে গন্ধোদকপূর্ণ কনকময় জলদ্রোণী রহিয়াছে।

রাজা স্নানগৃহে প্রবেশ করিয়া স্ফাটিক পীঠে উপবেশন করিলেন। বারবিলাসিনীগণ তাঁহার মস্তকে সুগন্ধি আমলক লেপন করিয়া দিল। তখন রাজা জলদ্রোণীতে অবতরণ করিলেন এবং বার-যোষাগণ বক্ষের অঞ্চল আকর্ষণপূর্ব্বক কটিদেশে নিবিড়নিবদ্ধ করিয়া হস্ত ও চরণবলয় উর্দ্ধে সমুৎসারিত করিয়া, অলকদাম কর্ণপার্শ্বে সরাইয়া, স্নানকলস লইয়া চারিদিক্ হইতে রাজাকে অভিষেক করিতে উপস্থিত হইল।

রাজা দ্রোণীসলিল হইতে উঠিয়া রাজহংসশুভ্র স্ফাটিক পীঠে দাঁড়াইলেন। তখন কেহ বা মরকতকলস হইতে, কেহ বা স্ফাটিক কলস হইতে চন্দনরসমিশ্র জল রাজার মস্তকে ঢালিয়া দিল; কেহ রজতকলসের পার্শ্বদেশে হস্তপল্লব-বিন্যাস দ্বারা কলস উত্তোলিত করিয়া তীর্থসলিলধারা বর্ষণ করিল, যেন রজনী পূর্ণচন্দ্র-মণ্ডল হইতে জ্যোৎস্নাধারা ঢালিয়া দিল; কেহ কনককলস হইতে কুঙ্কুমজল ঢালিয়া দিল, বোধ হইল যেন দিবসশ্রী বালাতপ বর্ষণ করিল।

এইরূপে স্নান সমাপন করিয়া সর্পনির্ম্মোকের ন্যায় ধবল-লঘু ধৌতবাস পরিধানান্তে রাজা শরদম্বরের মত শোভমান হইলেন। অতি-ধবল-জলধরচ্ছেদ-শুচি দুকূলপটপল্লব দ্বারা শিরোবেষ্টন করাতে তুহিনগিরির মত শোভিত হইলেন।

তৎপরে পূজা, আহার প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্ম সমাপন করিয়া শয়নাগারে প্রবেশপূর্ব্বক বিবিধগন্ধামোদিত সুশুভ্র কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া বৈশম্পায়নকে আনয়নের নিমিত্ত প্রতীহারীকে আদেশ দিলেন। প্রতীহারী আজ্ঞামাত্র বৈশম্পায়নকে শয়নাগারে আনয়ন করিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৈশম্পায়ন!

তুমি কোন্ দেশে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? তোমার জনক-জননী কে? কিরূপে সমস্ত শাস্ত্র অভ্যাস করিলে? তুমি কি জাতিস্মর, অথবা কোন মহাপুরুষ, যোগবলে বিহগবেশ ধারণ করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছ, কিংবা অভীষ্ট দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া বর প্রাপ্ত হইয়াছ? তুমি পূর্ব্বে কোথায় বাস করিতে? কি রূপেই বা চণ্ডালহস্তগত হইয়া পিঞ্জরাবদ্ধ হইলে? এই সকল শুনিতে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে, অতএব তোমার আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহলাবিষ্ট চিত্তকে পরিতৃপ্ত কর।"

রাজার এই কথা শুনিয়া বৈশম্পায়ন বিনয়-বাক্যে কহিল, "যদি আমার জন্মবৃত্তান্ত শুনিতে মহারাজের নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়া থাকে তবে শ্রবণ করুন,—

"ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে বিন্ধ্যাচলের নিকটে এক অটবী আছে। উহাকে বিন্ধ্যাটবী কহে। ঐ অটবীর মধ্যে গোদাবরী নদীর তীরে মহর্ষি অগস্ত্যের পবিত্র সুন্দর আশ্রম ছিল। সে স্থানে রামচন্দ্র পিতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালনের নিমিত্ত সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পঞ্চবটীতে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া কিঞ্চিৎকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ঐ আশ্রমের অনতিদূরে উৎফুল্ল-কুমুদ-কুবলয়-শোভিত, জলচরপক্ষিসঙ্কুল পম্পা নামক সরোবর আছে। ঐ সরোবরের পশ্চিম তীরে ভগবান্ রামচন্দ্র শর দ্বারা যে সপ্ততাল বিদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার নিকটে এক প্রকাণ্ড শাল্মলী বৃক্ষ আছে। বৃহৎ এক অজগর সর্প সর্ব্বদা ঐ বৃক্ষের মূলদেশ বেষ্টন করিয়া থাকাতে বোধ হয় যেন আলবাল দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে। উহার শাখা-প্রশাখাসকল এরূপ উন্নত ও বিস্তৃত যে, বোধ হয় যেন উহা

হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক গগনমণ্ডলের দৈর্ঘ্য পরিমাণ করিতে উঠিতেছে। স্কন্ধদেশ এরূপ উচ্চ, বোধ হয় যেন, একেবারে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিবার উদ্দেশ্যে মুখ বাড়াইতেছে। ঐ তরুর পল্লবান্তরে, কোটরে, শাখাগ্রে, স্কন্ধসন্ধিতে ও বল্কলবিবরে সহস্র কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া শুক শারিকা প্রভৃতি নানাবিধ পক্ষিগণ সুখে ও নির্ভয়ে বাস করে। তরু অতিশয় প্রাচীন; সুতরাং বিরলপল্লব হইয়াও, পক্ষিশাবকদিগের দিবানিশ অবস্থিতিপ্রযুক্ত সর্ব্বদা নিবিড়পল্লবাকীর্ণ বলিয়া বোধ হয়। কোন কোন পক্ষি-শাবকের পক্ষোদ্ভেদ হয় নাই, তাহাদিগকে ঐ বৃক্ষের ফল বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। পক্ষীরা রাত্রিকালে বৃক্ষকোটরে আপন আপন নীড়ে নিদ্রা যায়। প্রভাত হইলে আহারের অন্বেষণে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গগনমার্গে উড্ডীন হয়। তৎকালে বোধ হয় যেন হরিদ্বর্ণ দূর্ব্বাদলপরিপূর্ণ ক্ষেত্র বা অসংখ্য ইন্দ্রধনু আকাশমার্গ দিয়া চলিয়া যাইতেছে! তাহারা দিগ্দিগন্তে গমন করিয়া আহারদ্রব্য অন্বেষণ-পূর্ব্বক আপনারা ভোজন করে এবং শাবকদিগের নিমিত্ত বিবিধ ফলরস ও কলমমঞ্জরী বহন করিয়া আনে এবং রক্তানুলিপ্ত ব্যাঘ্র-নখের ন্যায় চঞ্চুপুট দ্বারা শাবকদিগকে যত্নপূর্ব্বক আহার করাইয়া দেয়।

"সেই বৃক্ষের এক জীর্ণ কোটরে আমার পিতামাতা বাস করিতেন। কালক্রমে মাতা আমাকে প্রসব করিয়া সূতিকা-পীড়ায় অভিভূতা হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। পিতা তৎকালে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, আবার প্রিয়তমা জায়ার বিয়োগ-শোকে অতিশয় ব্যাকুল ও দুঃখিতচিত্ত হইলেন। তথাপি স্নেহ-বশতঃ আমাকেই অবলম্বন করিয়া শোকসংবরণপূর্ব্বক আমার

লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান্ হইয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বার্দ্ধক্যবশতঃ তাঁহার পিচ্ছজাল স্বল্প জর্জ্জর ও শিথিল হইয়া গিয়াছিল; তাঁহার গমন করিবার কিছুমাত্র শক্তি ছিল না; তথাপি ধীরে ধীরে সেই আবাসতরুতলে নামিয়া, অন্য পক্ষিকুলায়ভ্রষ্ট শালিবল্লরী হইতে যে যৎকিঞ্চিৎ আহারদ্রব্য পাইতেন আমাকে আনিয়া দিতেন, আমার আহারাবশিষ্ট যাহা থাকিত আপনি ভোজন করিয়া কোনপ্রকারে জীবনধারণ করিতেন।

"একদা নিশাবসানে গগনতল যখন প্রভাত-সন্ধ্যারাগে লোহিত, চন্দ্র তখন পদ্মমধুর মত রক্তবর্ণ পক্ষপুটশালী বৃদ্ধহংসের ন্যায় মন্দাকিনী-পুলিন হইতে পশ্চিমসমুদ্রতটে অবতরণ করিতেছেন; দিক্‌চক্রবালে বৃদ্ধ রঙ্কুমৃগের রোমের মত একটি পাণ্ডুতা ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হইতেছে; গজ-রুধিররক্ত সিংহজটার লোমের ন্যায় লোহিত, ঈষৎতপ্ত লাক্ষাতন্তুর ন্যায় পাটলবর্ণ সুদীর্ঘ সূর্য্যরশ্মি-গুলি যেন পদ্মরাগমণি-শলাকার সম্মার্জ্জনী দ্বারা গগনকুট্টিম হইতে তারাপুষ্পগুলিকে সমুৎসারিত করিয়া দিতেছে; সপ্তর্ষিমণ্ডল উত্তরদিকে অম্বরতল হইতে সন্ধ্যা-উপাসনার জন্য যেন মানস-সরোবরের তীরে অবতরণ করিতেছেন; অরুণকরনিক্ষিপ্ত তারা-গণের ন্যায় বিকশিত-শুক্তিসম্পুট-স্খলিত মুক্তাফলনিকর বিক্ষিপ্ত হইয়া পশ্চিমসমুদ্রতট ধবলিত করিয়াছে; তপোবনবাসী অগ্নিহোত্রিদিগের গৃহ হইতে রাসভ-রোম-ধূসর ধূমলেখা উত্থিত হইয়া তরুশিখরে পারাবতমালার ন্যায় কুণ্ডলিত হইয়া ঘুরিতেছে; নিশাবসানহেতু জড়িমপ্রাপ্ত সমীরণ হিমশীকর বহন করিয়া, পল্লবলতা নাচাইয়া, কমলবনের সুগন্ধ হরণ করিয়া মন্দমন্দ

বহিতে লাগিল ; প্রভাতস্নিগ্ধ-সমীরণাহত হইয়া নিদ্রালস চক্ষুর উত্তপ্ত জতুরসাশ্লিষ্ট পক্ষ্মমালা ঈষৎ বিকশিত করিয়া উষরশয্যাধূসর বনমৃগসকল জাগরিত হইয়া উঠিল ; পক্ষিগণের কলরবে অরণ্যানী মুখরিত হইল। ক্রমে সূর্য্য স্পষ্ট হইতে লাগিল। কিঞ্চিদুন্মুক্ত নব-নলিনদল-সম্পুটের মত পাটলবর্ণ নবোদিত রবির মঞ্জিষ্ঠারাগ-লোহিত কিরণজালে গগনমণ্ডল লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন শাল্মলীবৃক্ষস্থিত পক্ষিগণ একে একে আহারের অন্বেষণে অভিলষিত প্রদেশে প্রস্থান করিল। পক্ষিশাবকেরা নিঃশব্দে কোটরে রহিয়াছে ও আমি পিতার নিকটে বসিয়া আছি, এমন সময়ে ভয়াবহ মৃগয়াকোলাহল শুনিতে পাইলাম। কোন দিকে সিংহ-সকল গভীর স্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিল ; কোন প্রদেশে তুরঙ্গ, কুরঙ্গ, মাতঙ্গ প্রভৃতি বনচর পশুসকল বন আন্দোলন করিয়া বেড়াইতে লাগিল ; কোন স্থানে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বরাহ প্রভৃতি ভীষণাকার জন্তুসকল ছুটাছুটি করিতে লাগিল ; কোন স্থানে মহিষ, গণ্ডার প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ জন্তুগণ অতি বেগে দৌড়িতে লাগিল ও তাহাদিগের গাত্রঘর্ষণে বৃক্ষসকল ভগ্ন হইতে আরম্ভ হইল। মাতঙ্গের চীৎকারে, তুরঙ্গের হ্রেষারবে, সিংহের গর্জ্জনে ও পক্ষীদিগের কলরবে বন আকুল হইয়া উঠিল এবং তরুগণও যেন ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। আমি সেই কোলাহল শ্রবণে ভয়বিহ্বল ও কম্পিতকলেবর হইয়া নিরাপদ্ হইবার আশায় পিতার জীর্ণ পক্ষপুটের অন্তরালে লুকাইলাম। তথা হইতে ব্যাধদিগের নানাপ্রকার চীৎকার ও কোলাহল শুনিতে লাগিলাম।

"যখন মৃগয়াকোলাহল নিবৃত্ত হইয়া অরণ্যানী নিস্তব্ধ হইয়াছে, তখন আমি পিতার পক্ষপুট হইতে আস্তে আস্তে বিনির্গত হইয়া

কোটর হইতে মুখ বাড়াইয়া যে দিকে কোলাহল হইতেছিল সেই দিকে ত্রাসচঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। দেখিলাম কৃতান্তের সহোদরের ন্যায়, পাপের সারথির ন্যায়, নরকের দ্বারপালের ন্যায় বিকটমূর্ত্তি এক সেনাপতির সমভিব্যাহারে ঘনীভূত অন্ধকার অথবা অঞ্জনশিলার স্তম্ভসম্ভার-সদৃশ কৃষ্ণকায় কুরূপ ও কদাকার কতকগুলি শবরসৈন্য আসিতেছে। তাহাদিগকে দেখিলে ভূত-বেষ্টিত ভৈরব ও দূতমধ্যবর্ত্তী কালান্তককে স্মরণ হয়। পরে অবগত হইলাম যে, সেই সেনাপতির নাম মাতঙ্গক। তাহার স্কন্ধাবলম্বী আকুটিলাগ্র কুন্তলভার কৃষ্ণক্রুর মুখমণ্ডল বেষ্টন করিয়া আছে; সুরাপানে তাহার দুই চক্ষু জবাবর্ণ; সর্ব্ব শরীরে বিন্দু বিন্দু রক্ত লাগিয়াছে; সঙ্গে কতকগুলি বড় বড় শিকারী কুকুর আছে। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন কোন বিকটাকার অসুর বন্য পশু ধরিয়া খাইতে আসিয়াছে। শবরসৈন্য অবলোকন করিয়া মনে করিলাম, ইহারা কি দুরাচার ও দুষ্কর্ম্মান্বিত। জনশূন্য অরণ্য ইহাদিগের বাসস্থান, মদ্য, মাংস আহার, ধনু ধন, কুক্কুর সুহৃৎ, ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর সহিত একত্র বাস এবং পশুদিগের প্রাণবধ করাই জীবিকা ও ব্যবসায়। অন্তঃকরণে দয়ার লেশ নাই, অধর্ম্মের ভয় নাই ও সদাচারে প্রবৃত্তি নাই। ইহারা সাধুবিগর্হিত পথ অবলম্বন করিয়া সকলের নিকটেই নিন্দাস্পদ ও ঘৃণাস্পদ হইতেছে সন্দেহ নাই। এই চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময়ে মৃগয়াজন্য শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত তাহারা আমাদিগের আবাসতরুতলের ছায়ায় আসিয়া উপবিষ্ট হইল। অনতিদূরস্থিত সরোবর হইতে কমলপত্রসম্পুটে করিয়া দ্রবমুক্তাফল-সদৃশ স্বচ্ছ জল ও মৃণাল আনিয়া পিপাসা ও ক্ষুধা

শান্ত করিল। তাহারা যখন অমল ধবল মৃণাল ভক্ষণ করিতেছিল, মনে হইতেছিল যেন রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিতেছে। কিছুক্ষণ বসিয়া শ্রান্তি দূর করিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

"শবরসৈন্যের মধ্যে এক বৃদ্ধ সেদিন কিছুই শিকার করিতে পারে নাই ও মাংস প্রভৃতি কিছুই পায় নাই; সে উহাদিগের সঙ্গে না গিয়া তরুতলে দণ্ডায়মান থাকিল। সকলে দৃষ্টিপথের অগোচর হইলে, রুধিরবিন্দুপাটল দুই চক্ষু দ্বারা সেই তরুর মূল হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত একবার এমনভাবে নিরীক্ষণ করিল যেন পক্ষিগণের আয়ুই পান করিতেছে। তাহার নেত্রপাতমাত্রেই কোটরস্থিত পক্ষিশাবকদিগের প্রাণ উড়িয়া গেল। হায়, নৃশংসের অসাধ্য কি আছে! সোপানশ্রেণীতে পাদক্ষেপপূর্ব্বক অট্টালিকায় যেরূপ অনায়াসে উঠা যায়, সেইরূপ অবলীলাক্রমে সেই নৃশংস সেই কণ্টকাকীর্ণ দুরারোহ প্রকাণ্ড মহীরুহে আরোহণ করিল এবং কোটরে কর প্রসারিত করিয়া পক্ষিশাবকদিগকে ধরিয়া একে একে বহির্গত করিতে লাগিল। কোন কোন শাবক অল্পদিবসজাত, তাহাদের নবপ্রসূত কমনীয় পাটলকান্তি যেন শাল্মলীকুসুমের মত, কাহারও পদ্মের নূতন দলগুলির মত অল্প উদ্গত পক্ষদ্বয়, কাহারও বা পদ্মরাগের প্রায় বর্ণ, কাহারও বা লোহিতায়মান চঞ্চুর অগ্রভাগ ঈষদুন্মুক্তমুখ কমলের মত, কাহারও বা মস্তক অনবরত কম্পিত হইতেছে, যেন ব্যাধকে নিবারণ করিতেছে; এই সমস্ত অসমর্থ শুকশিশুগুলিকে বনস্পতির শাখাসন্ধি ও কোটরাভ্যন্তর হইতে এক একটি ফলের মত গ্রহণ করিয়া প্রাণসংহারপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পিতার বৃদ্ধ বয়স, অকস্মাৎ এই বিষম সঙ্কট উপস্থিত হওয়াতে তিনি নিতান্ত

ভীত হইলেন। ভয়ে কলেবর দ্বিগুণ কাঁপিতে লাগিল এবং তালুদেশ শুষ্ক হইয়া গেল। পিতা ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন কিন্তু প্রতিকারের কোন উপায় না দেখিয়া আমাকে ত্রাসে শিথিলসন্ধি পক্ষপুটে আচ্ছাদন করিলেন ও আপন বক্ষঃস্থলের নিম্নে লুকাইয়া রাখিলেন। আমাকে যখন পক্ষপুটে আচ্ছাদন করেন তখন দেখিলাম তাঁহার নয়নযুগল হইতে জলধারা পড়িতেছে। নৃশংস ব্যাধ ক্রমে ক্রমে আমাদিগের কুলায়ের সমীপবর্ত্তী হইল এবং কালসর্পাকার বামকর কোটরে প্রবিষ্ট করিয়া পিতাকে ধরিল। তিনি চঞ্চুপুট দ্বারা যথাশক্তি আঘাত ও দংশন করিলেন কিন্তু সে কিছুতেই ছাড়িল না;—কোটর হইতে বহির্গত করিল, যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিল, পরিশেষে প্রাণ বিনষ্ট করিয়া নিম্নে নিক্ষেপ করিল। পিতার পক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত ও ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়াছিলাম বলিয়া সে আমাকে দেখিতে পায় নাই। ঐ তরু-তলে শুষ্ক পর্ণরাশি পুঞ্জিত ছিল, আমি তাহারই উপর পতিত হইলাম, অধিক আঘাত লাগিল না।

"অধিক বয়স না হইলে অন্তঃকরণে স্নেহের সঞ্চার হয় না, কিন্তু ভয়ের সঞ্চার জন্মাবধিই হইয়া থাকে। শৈশবপ্রযুক্ত আমার অন্তঃকরণে স্নেহ সঞ্চার না হওয়াতে আমার কেবল ভয়ই হইল। প্রাণ পরিত্যাগের উপযুক্ত কাল পাইয়াও আমি নিতান্ত নৃশংস ও নির্দ্দয়ের ন্যায় মৃত পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। অস্থির চরণ ও অসমগ্রোদিত পক্ষপুটের সাহায্যে ধীরে ধীরে গমন করিবার উদ্যোগ করাতেও বারংবার ভূতলে পড়িতে ও তথা হইতে উঠিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, বুঝি এ যাত্রায় কৃতান্তের করাল-গ্রাস হইতে পরিত্রাণ হইল না।

পরিশেষে মন্দ মন্দ গমন করিয়া নিকটস্থিত এক ঘনকৃষ্ণপল্লবিত তমালতরুর মূলদেশে লুকাইলাম, তখন মনে হইল যেন পিতৃ-কোলেই আশ্রয় পাইলাম। এমন সময়ে সেই নৃশংস চণ্ডাল শাল্মলীবৃক্ষ হইতে নামিয়া পক্ষিশাবকদিগকে একত্র করিয়া লতাপাশে বদ্ধ করিল এবং যে পথে শবরসৈন্যেরা গিয়াছিল সেই পথ দিয়া চলিয়া গেল।......”

তারাশঙ্কর তর্করত্ন।

নীরব কবি

যাঁহারা শ্রুতিসুখাবহ ছন্দোবন্ধে শব্দের সহিত শব্দ গাঁথিয়া, শুধু কথার ছটায় সকলকে মোহিত করিতে চেষ্টা করেন, অশিক্ষিত ইতর লোকেরা তাঁহাদিগকেই কবি বলিয়া আদর করে।

ঈদৃশ কবি এবং ঐরূপ কাব্যের পরীক্ষাস্থান কর্ণ। কবিতাও তালে তালে পঠিত বা উচ্চারিত হয়; তাহার সঙ্গে সঙ্গে শরীরও যেন তালে তালে, বিবিধ ভঙ্গিতে নাচিতে থাকে। আরবী, উর্দ্দু, হিন্দী, পারসী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত প্রভৃতি পুরাতন ও নূতন ভাষা-নিচয়ে ঐরূপ কাব্যের অভাব নাই। ভট্ট, মাগধ এবং কবিওয়ালা বলিয়া প্রসিদ্ধ গাথকদিগের অধিকাংশই এই শ্রেণীর কবি। কোন একটা নাম দিতে হইলে, ইহাদিগকে শাব্দিক কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত নহে। কেন না, শব্দের পর শব্দ-বিন্যাসের চাতুরী বিনা সাধারণতঃ ইহাদিগের কবিতায় আর কিছুই থাকে না। যদি কিছু থাকে, তাহাও প্রায় স্বাদ-গ্রাহী ব্যক্তির সুখ-প্রীতিকর বলিয়া গ্রাহ্য হয় না।

সহৃদয়, রসজ্ঞ ব্যক্তিরা কাব্যের অন্বেষণ করিতে হইলে আর একটুকু উর্দ্ধে আরোহণ করেন। তাঁহারা ছন্দোবদ্ধ বাক্য শুনিয়াই গলিয়া পড়েন না, অথবা কতকগুলি সুললিত শব্দ পাইয়াই মোহিত হন না। যে কথাটি শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়া ক্ষণিক আনন্দ উৎপাদন করিল, তাহা হৃদয়স্থান পর্য্যন্তও গমন

করে কি না, ইহাই তাঁহারা অগ্রে বিচার করেন। যে কথায় অন্তরের অন্তর-নিহিত কোন লুক্কায়িত রস উছলিয়া না উঠে, সৌন্দর্য্যের কোন নূতন মূর্ত্তি মানস-নেত্রের সন্নিধানে উপস্থিত না হয়, হৃদয়তন্ত্রী কোন এক নূতন তানে বাজিতে না থাকে কিংবা আত্মা ভাব-ভরে দুলিয়া না পড়ে, তাঁহাদিগের নিকট তাহা কাব্য বলিয়াই গৃহীত হয় না। ইংলণ্ডের অধিকাংশ কবিই ছন্দোবিন্যাস-নৈপুণ্যে শেক্ষপীরের * শিক্ষাগুরু; অনেক বালিকার কবিতাও সেই কবিকুল-পূজ্য পৃথ্বী-ভূষণ কবির কবিতা-নিচয় অপেক্ষা কাণে শুনিতে অধিক মিষ্ট;—জয়দেবের † গীতগোবিন্দের যেরূপ পদলালিত্য, অভিজ্ঞান-শকুন্তল ‡ কিংবা উত্তরচরিতের § আদি, অন্ত, মধ্য, কোথাও তদনুরূপ কিছু

* শেক্ষপীর ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান কবি। ইনি ১৫৬৪ খ্রীঃ অব্দে ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড নগরে জন্মগ্রহণ এবং ১৬১১ খ্রীঃ অব্দে মানবলীলা-সংবরণ করেন। ইনি ম্যাক্‌বেথ এবং হেম্‌লেট্‌ প্রভৃতি বহুসংখ্যক আশ্চর্য্য নাটক রচন করিয়া জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

† কেন্দুবিল্বনিবাসী জয়দেব গোস্বামী। ইঁহার প্রণীত গীতগোবিন্দ একখানি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গীতিকাব্য। গীতগোবিন্দে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণিত হইয়াছে। গোবিন্দদেবের প্রেমলীলা গীতিকবিতায় বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ঐ কাব্যের নাম গীতগোবিন্দ। জয়দেব গোস্বামী চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ কি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে জীবিত ছিলেন।

‡ ইহা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রণয়, পরিণয়, বিচ্ছেদ ও পুনর্ম্মিলন-বিষয়ক কালিদাস-প্রণীত ভুবন-বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক।

§ সীতার বনবাস-বিষয়ক অতি মনোহর করুণরসাত্মক সংস্কৃত নাটক। ইহার প্রণেতা ভবভূতি অসামান্য কবি।

লক্ষিত হয় না ;—নৈষধের * প্রগল্‌ভ পদ-বিন্যাসের নিকট রত্নাবলীর † সরল, তরল, মধুর রচনা কিছুই নয় বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে। সুরুচিসম্পন্ন বিচক্ষণ লোকেরা তথাপি শেক্ষপীর, কালিদাস ও ভবভূতিকেই প্রাণের সহিত পূজা করেন, এবং নৈষধের নাচনি ছন্দের কবিতাপুঞ্জ এক দিকে সরাইয়া রাখিয়া রত্নাবলীর কবি সৌন্দর্য্যের যে সকল কমনীয় আলেখ্য আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহাই পিপাসুপ্রাণে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। কারণ, শব্দগ্রন্থনের ভঙ্গিবৈচিত্র্য ভাষা লইয়া লীলা-খেলার বৈচিত্র্যপ্রদর্শন মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে ভাবই কাব্যের প্রাণ। যেমনই আভরণের তুলনায় রূপ, তেমনই শব্দগত মাধুর্য্যের তুলনায় সৌন্দর্য্যময় ভাব। সুতরাং কাব্যের পরীক্ষায় শব্দে ও ভাবে বড় বেশী তারতম্য।

যাঁহারা চিন্তাক্ষম ও মনস্বী বলিয়া জগতে সম্মানিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের বিবেচনায় কবিতার আরও একটি গ্রাম আছে। তাহা অতীব উচ্চ—অসামান্য শক্তিলভ্য। যাহা লিখিত হইল, তাহাই কাব্য, এবং যিনি লিখিলেন তিনিই কবি, এমন কথা তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে লিখিত চিত্রে কাব্যের আভাসমাত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত কাব্য এক অনির্ব্বচনীয় অমৃত। মনুষ্যের অপূর্ণ এবং অপবিত্র ভাষা

* নিষধ-রাজ্যের অধিপতি নল রাজা এবং বিদর্ভরাজ-দুহিতা দময়ন্তীর প্রণয়, পরিণয়, বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন-বিষয়ক শ্রীহর্ষ-প্রণীত সংস্কৃত মহাকাব্য।

† সিংহল-রাজ্যের রাজকন্যা রত্নাবলী এবং বৎসরাজের প্রণয় ও পরিণয়-বিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক।

উহাকে ধারণ কিংবা বহন করিতে সাধারণতঃ সমর্থ হয় না। যাঁহার হৃদয় যতক্ষণের জন্য তাদৃশ কাব্যের বিলাস-ক্ষেত্র হয়, তিনি ততক্ষণের জন্য হিমাচলের অবিচলিত স্থৈর্য্যের ন্যায়, আকাশের অনন্ত বিস্তারের ন্যায়, অক্ষুব্ধ সমুদ্রের অনির্ব্বচনীয় গাম্ভীর্য্যের ন্যায় এবং যোগ-রত তাপসের ধ্যানের ন্যায় নিস্তব্ধ ও নীরব রহেন। তিনি শুধু হৃদয়েই সেই স্বর্গীয় সুধাসিন্ধুর কণিকামাত্র পান করিয়া কৃতার্থ হন; লৌকিক বাক্য এবং লোক-ব্যবহৃত বর্ণমালায় কিছুই ব্যক্ত করিয়া উঠিতে পারেন না। লোক স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ দৌড়িতে চাহে, কিন্তু কোন মতেই দৌড়িতে পারে না; কথা কহিবার জন্য ব্যাকুল হয়, কিন্তু কোন কথাই অধরে ফুটিল বলিয়া অনুভব করে না, তিনিও তথাবিধ দশা প্রাপ্ত হইয়া তখন স্তম্ভিতভাবেই অবস্থিত থাকেন। প্রকাশের জন্য যত কিছু চেষ্টা, সমস্তই তখন তাঁহার বিফল হয়, প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্তও তখন বিলুপ্ত হইয়া যায়।

কোন তত্ত্বের অন্তস্তলে প্রবেশ করা যাহাদিগের বুদ্ধির অসাধ্য, প্রাগুক্ত সত্যটিকে নিতান্ত লঘু কথা বলিয়া উপহাস করা তাহাদিগের পক্ষে অসম্ভব নহে। তাহারা এইরূপ মনে করিতে পারে যে, কিছু না বলিয়া এবং কিছু না লিখিয়াই যদি কবির অলৌকিক সম্পদ্ সম্ভোগ করা যায়, তবে ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্য কি? ইচ্ছা হইবে, আর অমনি ধ্যানস্থ হইয়া কবির দেবাসনে উপবেশন করিব,—বীণাপাণি মূর্ত্তিমতী হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইবেন,—প্রকৃতি তদীয় প্রিয়তম নিকেতনের লুক্কায়িত দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিবেন, এবং সংসার কাব্যকুঞ্জের কমনীয় মূর্ত্তি ধারণ করিবে। ইহার মত আর সুলভ সুখ কি?

কিন্তু কবিত্বের এইরূপ আবেশ অথবা অনুপ্রাণনা প্রকৃত প্রস্তাবে মনুষ্যের ইচ্ছাধীন কি না, এবং ইচ্ছা সকলেরই অদৃষ্টে সকল সময়ে ঘটে কি না, কিংবা ঘটিতে পারে কি না, গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। ইচ্ছা করিয়া কতকগুলি সুললিত শব্দসংযোগে, কিছু একটা লিখিয়া তোলা আপনার সাধ্য; ইচ্ছা করিয়া কোন বিষয়ে ঐরূপ শ্রুতিহারি কিছু একটা বলিয়া, লোকের চিত্তবিনোদ করাও আপনার সাধ্য। কিন্তু ইচ্ছা করিয়া কে কোথায় বিশ্বময় সৌন্দর্য্যের উপাসক এবং বিশ্বপ্রেমের প্রেমিক হইতে পারিয়াছে? আর ইচ্ছা করিয়া কবে কে আপনার হৃদয়কে আপনি দ্রবীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছে? ইচ্ছা বুদ্ধিকে চালনা করিতে পারে, মনকেও অনেক দূর উত্তেজিত করিতে পারে; কিন্তু প্রতিভা ও প্রকৃতির মূল প্রস্রবণ ইচ্ছার অগম্য স্থান।

চন্দ্রমা মৃদু মৃদু হাসিতেছে, তরঙ্গিণী মৃদুতরঙ্গনাদে নিজ দুঃখের গীত গাইতেছে, বৃক্ষপত্র মৃদুসঞ্চালনে অটবীর প্রণয়াহ্বান প্রকাশ করিতেছে, এ সকল অভ্যস্ত কথা অনেকেই অভ্যাস-বলে লিখিতে পারে। কিন্তু চন্দ্রমা যখন হাসিতে থাকে, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে এ সংসারে কয়টি হৃদয় প্রকৃতির সেই বিচিত্র শোভার সুখ-শীতল স্পর্শে আনন্দের উচ্ছ্বাসে মৃদু হাস্যে উৎফুল্ল হয়? কে কলনাদিনী তরঙ্গিণীর তটে উপবিষ্ট হইয়া,—তাহার অনতিস্ফুট দুঃখের গীতের সহিত নিজ দুঃখের গীত মিশ্রিত করিতে ক্ষমতা রাখে? তরুলতার আহ্বানে ইতর-জন-ভোগ্য পাশব ভোগসুখের আহ্বানে কয় জনে অবহেলা করিতে পারে?

হর্ষ, দুঃখ, ক্রোধ ও প্রীতি প্রভৃতি ভাব-নিচয়ের ভাষা চির-কালই গাঢ়তার মাত্রানুসারে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে। যে

হর্ষ, যে দুঃখ, যে ক্রোধ, অথবা যে প্রীতি নিতান্ত তরল, সহজেই তাহা বাহির হইয়া পড়ে। যেমন তরল ভাব, তেমন তরল ভাষা। মনুষ্যের মন অল্প হর্ষে শফরীর ন্যায় চঞ্চল হয়, অল্প আনন্দে অধীর হইয়া উঠে, হর্ষ অথবা আনন্দজনিত হাস্যোল্লাস কিছুতেই তখন নিবৃত্ত হয় না। অল্প দুঃখ অশ্রুজলেই বিগলিত হইয়া যায়। অল্প মাত্রার ক্রোধ ভ্রূকুঞ্চনে ও তর্জ্জন-গর্জ্জনেই ব্যয়িত হয়। অতি অল্পপ্রীতি, অল্পজলা স্রোতস্বতীর ন্যায় সর্ব্বদা খল-খল করে। কিন্তু যে হর্ষ শরীরের রোমে রোমে অমৃতরসের ন্যায় সঞ্চরণ করে, যে দুঃখ গরলখণ্ডের ন্যায় হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে লগ্ন হইয়া থাকে, যে ক্রোধ চিত্তকে তুষানলবৎ অহর্নিশ দাহন করে, যে প্রীতি একবার নিশার স্বপ্নের ন্যায় অলীক বোধ হয়, আবার আত্মাকে সাধারণ আনন্দ ও নিরানন্দের অধিকার হইতে বহু ঊর্দ্ধে লইয়া যায়, তাহা প্রায় কখনও দৃশ্য কি শ্রাব্য ভাষায় সুচারুরূপে পরিস্ফুট হয় না।

কবিতার ভাষাও এই নিয়মের অধীন। লঘু কবির যত কিছু সম্পদ্ তাহা শব্দেই পর্য্যবসিত হয়। তদপেক্ষা উচ্চতর কবির শব্দসম্পত্তি অপেক্ষাকৃত অল্প, রস-গাম্ভীর্য্যই অধিক। কিন্তু যখন কাহারও হৃদয়ে কাব্যের সেই অনির্ব্বচনীয় অমৃতস্রোত অতি প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, যখন মন কল্পনার ঐন্দ্রজালিক পক্ষে উড্ডীন হইয়া তারকায় তারকায় প্রকৃতির জ্বলদক্ষরলেখা পাঠ করিতে থাকে, এবং গিরিশৃঙ্গ, সাগরগর্ভ, আলোক ও অন্ধকার সর্ব্বত্র একসঙ্গে বিচরণ করে; যখন আত্মা তত্ত্বের প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে আত্মহারার মত হইয়া পড়ে, এবং বুদ্ধি অনুসন্ধানে বিরত হইয়া, ক্ষণকালের তরে, তরঙ্গের সহিত তরঙ্গের

ন্যায় হৃদয়েই বিলয় পায়; তখন ভয়বিহ্বলা ভাষা আপনিই জড়ীভূত হইয়া যায়; কে আর কাহার কথা প্রকাশ করে? প্রকৃতি নীরব, কাব্য নীরব, কবিও তখন স্পন্দহীন ও নীরব। ভাব-লহরী নীরবে উত্থিত হয়, নীরবে লীলা করে এবং নীরবেই বিলীন হইয়া যায়। মুগ্ধা বালা যেমন দর্পণে আপনার সুন্দরচ্ছায়া আপনি দেখিয়া চকিত-নয়নে চাহিয়া থাকে, জ্যোৎস্নাময়ী যামিনী যেমন আপনার সুখে আপনি হাসে, বনান্তবায়ু যেমন আপনার দুঃখে আপনি ক্রন্দন করে, কবিও তখন সেইরূপ আপনার ভাবে আপনি পরিপূর্ণ হইয়া জীবন্মৃতের ন্যায় আপনাতে আপনি নিমজ্জিত হন। কাহার নিকট কি কহিবেন, কে কি শুনিয়া কি কহিবে, কে প্রশংসা করিবে, কে নিন্দা করিবে, কে তাঁহার কথায় মুগ্ধ হইবে, কে অসন্তুষ্ট থাকিবে, ইত্যাদি কোন চিন্তাই তাঁহার তদানীন্তন সুখ-সৌন্দর্য্যময় হৃদয়-জগতে স্থান প্রাপ্ত হয় না। মান, অপমান, সম্পদ্, বিপদ্, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ জীবন ও মৃত্যু, সমস্তই তখন তাঁহার নিকট, উচ্চতম শৈল-শিখর-সমাসীন যোগীর নিকট মানবসমাজের বিবিধ ক্ষুদ্র কোলাহলের ন্যায় অতি নিম্নস্থ ও দূরস্থ হইয়া পড়ে। সংসার আছে কি নাই, ইহাও তখন তাঁহার বোধগম্য থাকে না। তাঁহার নিজের অস্তিত্বও তখন মুহূর্ত্তের জন্য এই বিশ্বব্যাপি-সৌন্দর্য্য-সাগরে বিলুপ্ত হয়।

যাঁহারা বিধাতার প্রসাদে অথবা প্রকৃতির কোন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় নিয়মে, এইরূপ কবি-প্রাণ লাভ করিয়াছেন, এবং লোকাতীত কবিত্বের পূর্ণ আবির্ভাবে সময়ে সময়ে এইরূপ অভিভূত হন, আমরা তাঁহাদিগকে চিনি আর না চিনি,

তাঁহারাই সাধক, তাঁহারাই সিদ্ধ এবং তাঁহারাই মানবজাতির দিব্য চক্ষু। তাঁহারা উদাসীন হইলেও আসক্তের ন্যায় কর্ম্মরত ও স্নেহপ্রবণ। তাঁহারা বাহিরে অতি কঠিনপ্রকৃতির লোক হইলেও অন্তরে অবলার ন্যায় কোমল। তাঁহাদিগের আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতঃই জগতের সুখ-প্রবর্ত্তিনী, জগতের হিত-সাধিনী; তাঁহাদিগের আশা বসন্তসমাগমের প্রিয়সংবাদ-দায়িনী কোকিলার ন্যায় পীযূষবর্ষিণী। ধর্ম্ম তাঁহাদিগের কাছে কঠোর ব্রত নহে। ধর্ম্ম ও জীবন, সুখ ও সাধনা এই সমস্তই তাঁহাদিগের কাছে এক এবং অভিন্ন পদার্থ। সমীরণ তাঁহাদিগের স্বর্গোপম পবিত্র স্পর্শে শীতল ও সুরভি হয় বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি, নচেৎ এই স্বার্থচিন্তাময় সংসার-মরুতে সকলেই প্রাণে মরিতাম। পৃথিবী তাঁহাদিগের পদরেণু প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই মনুষ্যের নিবাসযোগ্য হইয়াছে, নচেৎ ইহা নিরয়-নিবাস হইতেও ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করিত। তাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াই, মনুষ্যের ভাষা অদ্যাপি শোক-দুঃখের সুদারুণ পরীক্ষা-সময়ে মনুষ্যের দগ্ধহৃদয়কে শীতল করিতেছে, নৈরাশ্যে আশ্বাস দিতেছে; দয়া, উৎসাহ, শান্তি ও প্রীতি প্রভৃতি অতিমানুষিক ভাবের ভার বহন করিতেছে, নচেৎ ইহা পিশাচকণ্ঠ হইতেও অধিকতর শ্রুতিকঠোর হইত। ভক্তি এইরূপ কবিদিগের হৃদয়কাননে নিত্যবিকসিত কুসুম; আরাধনা সেই ভক্তিবিলসিত হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

পলাশির যুদ্ধ

রজনী প্রভাত হইল। যে প্রভাতে ভারতগগনে বৃটিশ-সৌভাগ্য-সূর্য্য সমুদিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই প্রভাতে,—"১১৭০ হিজরী ৫ সাওয়াল রোজ পঞ্চসোম্বা" * (বৃহস্পতিবারে) পলাশি-প্রান্তরে ইংরাজ-বাঙ্গালী শক্তিপরীক্ষার জন্য একে একে গাত্রোত্থান করিতে লাগিল।

ইংরাজেরা যে আম্র বনে সেনা-সমাবেশ করিয়াছিলেন, তাহার নাম "লক্ষবাগ",—লোকে বলে তাহা লক্ষ বৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল। এই আম্রকাননের পশ্চিমোত্তর কোণে মৃগয়ামঞ্চ; ক্লাইব তাহার পার্শ্বে,—লক্ষবাগের উত্তরে—উন্মুক্ত প্রান্তরে—ব্যূহ রচনা করিলেন। সিরাজদ্দৌলা প্রত্যূষেই মীরজাফর, ইয়ার লতিফ এবং রায়দুর্ল্লভকে শিবির হইতে অগ্রসর হইবার অনুমতি করিয়াছিলেন। তাঁহারা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ব্যূহ রচনা করিয়া শ্রেণীসম্বদ্ধ বলাকাপ্রবাহের ন্যায় ধীর মন্থর গতিতে আম্র বন বেষ্টন করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ইংরাজদিগের মনে হইল এই চক্রব্যূহ যদি আম্র বন বেষ্টন করিয়া কামানে অগ্নি-সংযোগ করে তবেই সর্ব্বনাশ! † ক্লাইবের

* মুতক্ষরীন।

† At daybreak of the 23rd, the Nabob's army was perceived marching out of their lines towards the grove, which we were in possession of; their intention seemed to be to surround us.—Ive's Journal.

গোরাপল্টন চারিদলে বিভক্ত হইয়া মেজর কিল্‌প্যাট্রিক, মেজর গ্রাণ্ট, মেজর কূট, এবং কাপ্তান গপের অধীনে অস্ত্রধারণ করিল,—মধ্যস্থলে 'গোরা লোগ', বামে-দক্ষিণে 'কালা আদ্‌মীরা' ছয়টি কামান সম্মুখে করিয়া সারি বাঁধিয়া দণ্ডায়মান হইল। মীরমদনের সিপাহী-সেনা সম্মুখস্থ সরোবর-তীরে সমবেত হইয়াছিল। এক পার্শ্বে ফরাসী-বীর সিনফ্রেঁ, এক পার্শ্বে বাঙ্গালী-বীর মোহনলাল; মধ্যস্থলে বাঙ্গালী-সেনাপতি মীরমদন সেনাচালনার ভার গ্রহণ করিলেন।

সিরাজ-বাহিনীর আস্তরণাবৃত রণহস্তী, সুশিক্ষিত অশ্বসেনা এবং সুগঠিত আগ্নেয়াস্ত্র যখন ধীরে ধীরে সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন ইংরাজেরা ভাবিলেন—সিরাজ-ব্যূহ দুর্ভেদ্য! *

বেলা ৮ ঘটিকার সময়ে মীরমদন সরোবর-তীরে কামানে অগ্নি-সংযোগ করিলেন;—প্রথম গোলাতেই ইংরাজ-পক্ষে একজন হত এবং একজন আহত হইল। তাহার পর মুহুর্মুহুঃ কামান চলিতে লাগিল—মুহুর্মুহুঃ ইংরাজ-সেনা ধরাশায়ী হইতে লাগিল। এই ভাবে আধ ঘণ্টা যুদ্ধ চলিয়াছিল। এই আধ ঘণ্টায় ১০ জন গোরা ও ২০ জন কালা সিপাহী মৃত্যুক্রোড় আশ্রয় করিল। †

* What with the number of elephants, all covered with scarlet cloth embroidery, their horse, with their drawn swords glistening in the sun, their heavy cannon, drawn by vast trains of oxen and their standards flying,—they made a grand and formidable appearance.—Scrafton.

† Orme, Vol. ii, 175.

ইংরাজের কামান নীরব ছিল না। তাহার প্রচণ্ড পীড়নে নবাব-সেনাও ধরাশায়ী হইতেছিল। কিন্তু তাহাতে নবাবের গোলন্দাজ-দিগের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই, তাহারা অক্ষতদেহে বিপুলবিক্রমে ইংরাজ-সেনার মধ্যে মিনিটে মিনিটে গোলা প্রক্ষেপ করিতে লাগিল। আধ ঘণ্টাতেই ক্লাইবের সমরসাধ মিটিল। আধ ঘণ্টাতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন প্রতি মিনিটে একটি করিয়া হত ও কতকগুলি আহত হইতে থাকিলে, তাঁহার তিন সহস্র সিপাহী অধিকক্ষণ শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশ করিবার অবসর পাইবে না। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য ক্লাইবকে সসৈন্যে হটিতে হইল। * ইংরাজ-সেনার দুইটি কামান বাহিরে থাকিল, আর চারিটি কামান লইয়া তাহারা আম্র বনের মধ্যে লুকাইয়া গেল ; ক্লাইবের আদেশে সকলেই বৃক্ষান্তরালে বসিয়া পড়িল। নবাবের তোপমঞ্চগুলি ৪ হাত উচ্চ। সুতরাং মীরমদনের গোলা ইংরাজ-সেনার মাথার উপর দিয়া ছুটিতে লাগিল ; কচিৎ বা বৃক্ষশাখায় প্রতিহত হইতে লাগিল।

বৃক্ষান্তরালে লুকাইয়া থাকিয়াও ক্লাইবের আশঙ্কা দূর হইল না। নবাব-সেনার ব্যূহ-রচনায় এবং সমর-কৌশলে তাঁহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। তিনি উমিচাঁদকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"তোমাদিগকে বিশ্বাস করিয়া বড়ই কুকর্ম্ম করিয়াছি। তোমাদের সঙ্গে কথা ছিল যে, একটা যৎসামান্য যুদ্ধাভিনয় হইলেই মনস্কাম পূর্ণ হইবে ; সিরাজ-সেনা

* We soon found such a shower of balls pouring upon us from their fifty pieces of cannon * * * that we retired under cover of the bank.—Scrafton's Reflections.

যুদ্ধক্ষেত্রে বাহুবল প্রদর্শন করিবে না। এখন যে তাহার সকল কথাই বিপরীত হইতেছে?" * উমিচাঁদ বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন,—"যাহারা যুদ্ধ করিতেছে, তাহারা মীরমদন এবং মোহনলালের সেনাদল; তাহারাই কেবল প্রভুভক্ত। তাহাদিগকে কায়ক্লেশে পরাজিত করিতে পারিলেই হয়; অন্যান্য সেনানায়কগণ কেহই অস্ত্র চালনা করিবেন না।" †

মীরমদন ধীরে ধীরে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বিপুল বিক্রমে গোলা চালনা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে মীরজাফরের চক্রব্যূহ যদি আর একটু অগ্রসর হইয়া কামানে অগ্নি-সংযোগ করিত তাহা হইলে আর রক্ষা ছিল না! ‡ কিন্তু মীরজাফর, ইয়ার লতিফ, রায়দুর্ল্লভ যেথানে সেনাসমাবেশ করিয়াছিলেন, সেইখানেই চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রণকৌতুক দর্শন করিতে লাগিলেন। § বেলা ১২ টার সময়ে গলদ্‌ঘর্ম্ম-কলেবরে ক্লাইব সমরসভার পরামর্শ

* "সাবেদ জঙ্গ্‌নে (ক্লাইব) আমীনচাঁদসে বাদ্‌গুমান্ হো কর্, গোসা ফর্‌মায়া, আওর কহা কে এসাহি ওয়াদা থা কে থাকিক্ লড়াইমে বদয়ার দিলি হাসিল্ হো যায় গা, আওর শাহী ফৌজভি সিরাজুদ্দৌলাসে মন্‌হেরেক হেয়; ওয়া সব তেরি বাতেঁ বর্‌খেলাফ্ পায়ি জাতি হেঁয়।"—মুতক্ষরীন (অনুবাদ)।

† Stewart's History of Bengal.

‡ As soon as their rear was out of the camp, failing in their plan to surround us, they halted.—Ive's Journal.

§ "মীর মহম্মদ জাফর খাঁ ওগয়রহ, যো বায়েস্ ইস্ কোস্তখুন কে হুয়ে থে, জিস্ তরফ্‌কে মোকরব্ থে, ওহা খড়ে তামাসা দেখ্ রহে থে।"—মুতক্ষরীন (অনুবাদ)।

জিজ্ঞাসা করিতে বসিলেন। স্থির হইল যে, সমুদয় দিন আম্র বনে লুকাইয়া কোনরূপে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে হইবে। * মহাবীর পলাশি-বিজেতা যে এইরূপে প্রাণরক্ষা করিয়াই সমর জয় করেন, সে কথা তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

ধূমপুঞ্জে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর আবার আষাঢ়ের নবমেঘে মধ্যাহ্নেই পৃথিবী তমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। ঠিক মধ্যাহ্ন-সময়ে মেঘ বারিবর্ষণ করিল; মীরমদনের অনেক বারুদ ভিজিয়া গেল; তাঁহার কামানগুলি শিথিল হইয়া পড়িল। তিনি পুনরায় বিপুল বিক্রমে শত্রুদলনের আয়োজন করিতেছেন, এমন সময়ে ইংরাজের একটি গোলা আসিয়া তাঁহার উরুস্থল ছিন্ন করিয়া ফেলিল। †

বাঙ্গালী-সেনাপতি বীরের ন্যায় পলায়িত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিতে গিয়া দৈববিড়ম্বনায় সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। মোহনলাল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, মীরমদনকে সকলে ধরাধরি করিয়া সিরাজদ্দৌলার সম্মুখে লইয়া গেলেন। তিনি বেশী

* At 11 o'clock Colonel Clive consulted his officers at the drumhead; and it was resolved to maintain the connonade during the day, but at midnight to attack the Nabab's camp.—Orme, Vol. ii, 179.

† The battle being attended with so little bloodshed, arose from two causes; first,—the army was sheltered by so high a bank that the heavy artillery of the enemy could not possibly make them much mischief. The other was,—that Suraja Dowla had not confidence in his army, nor his army any confidence in him, and therefore, they did not do their duty.—Clive's Evidence.

কিছু বলিবার অবসর পাইলেন না, এইমাত্র বলিলেন—"শত্রুসেনা আম্র বনে পলায়ন করিয়াছে, তথাপি নবাবের প্রধান সেনাপতিগণ কেহই যুদ্ধ করিতেছেন না; সসৈন্যে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।"* মীরমদনের বীর বাহু অবসন্ন হইল; সিরাজদ্দৌলার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! একমাত্র মীরমদনের ভরসা পাইয়া সিরাজদ্দৌলা শত্রুদলের কুটিল কৌশলে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে সিরাজের বল-ভরসা অকস্মাৎ তিরোহিত হইয়া গেল।

সিরাজ অনন্যোপায় হইয়া আর একবার মীরজাফরকে উত্তেজিত করিবার জন্য তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মীরজাফর অনেক ইতস্ততঃ করিয়া, অনেক কালহরণ করিয়া, অবশেষে প্রিয়পুত্র মীরন এবং পাত্রমিত্রদিগের সহিত দলবদ্ধ হইয়া সতর্কপদবিক্ষেপে সিরাজের পটমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন।† মীরজাফর ভাবিয়াছিলেন, সিরাজদ্দৌলা হয়ত তাঁহাকে বন্দী করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু পটমণ্ডপে প্রবেশ করিবামাত্র সিরাজ তাঁহার সম্মুখে রাজমুকুট রাখিয়া দিয়া, ব্যাকুল হৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন,—"যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, তুমি ভিন্ন রাজমুকুট রক্ষা করেন, এমন আর কেহ নাই। মাতামহ জীবিত নাই। তুমিই এখন তাঁহার স্থান পূর্ণ কর। মীরজাফর! আলিবর্দ্দির পুণ্যনাম স্মরণ করিয়া আমার মানসম্ভ্রম এবং জীবনরক্ষার সহায়তা

* He was immediately carried to the Nawab; and having uttered a few words, expressive of his own loyalty, and the want of it in others, died in his presence.—Stewart.

† মুতক্ষরীন।

কর।” মীরজাফর সসম্ভ্রমে যথারীতি রাজমুকুটকে কুর্নিশ করিয়া, বুকের উপর হাত রাখিয়া, বিশ্বস্তভাবে বলিতে লাগিলেন,—“অবশ্যই শত্রুজয় করিব। কিন্তু আজ দিবা অবসান-প্রায় হইয়াছে, সিপাহীরা প্রভাত হইতে রণশ্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে; আজ সেনাদল শিবিরে প্রত্যাগমন করুক;—প্রভাতে আবার যুদ্ধ করিলেই হইবে।” সিরাজ বলিলেন,—“নিশারণে ইংরাজ-সেনা শিবির আক্রমণ করিলেই যে সর্ব্বনাশ হইবে?” মীরজাফর সগর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন,—“আমরা রহিয়াছি কেন?” * সিরাজের মতিভ্রম হইল। তিনি মীরজাফরের মৌখিক উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত হইয়া, সেনাদলকে শিবিরে প্রত্যাগমন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। মহারাজ মোহনলাল তখন বিপুল বিক্রমে শত্রুসেনার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি সসম্ভ্রমে বলিয়া পাঠাইলেন—“আর দুইচারি দণ্ডের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হইবে, এখন কি শিবিরে প্রত্যাগমন করিবার সময়? পদমাত্র পশ্চাদ্গামী হইলে, সিপাহীদল ছত্রভঙ্গ হইয়া সর্ব্বনাশ সংঘটিত করিবে,—ফিরিব না, যুদ্ধ করিব।” † এ সংবাদে মীরজাফর শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি বিবিধ বিধানে সিরাজদ্দৌলার মনস্তুষ্টি করিয়া পুনরায় সংবাদ পাঠাইলেন—“ক্ষান্ত হও, শিবিরে প্রত্যাগমন কর।” রোষে-ক্ষোভে মোহনলালের নয়নযুগল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি আর কি করিবেন? তিনি একজন মনসবদার মাত্র।

* Stewart's History of Bengal.

† মুতক্ষরীন।

সমরক্ষেত্রে সেনাপতির আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। যথাসম্ভব শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ধীরে ধীরে শিবিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মীরজাফরের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ক্লাইবকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—"মীরমদন গতায়ু হইয়াছেন, আর লুকাইয়া থাকা নিষ্প্রয়োজন। ইচ্ছা হয় এখনি অথবা রাত্রি ৩ ঘটিকার সময়ে শিবির আক্রমণ করিবেন, তাহা হইলে সহজেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে।"*

মোহনলালকে শিবিরে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া, ইংরাজ-সেনা আম্র বন হইতে বাহির হইতে লাগিল। ক্লাইব এই সময়ে মৃগয়ামঞ্চের কক্ষমধ্যে বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি সে সময়ে নিরাপদে নিদ্রামগ্ন হইয়াছিলেন। মেজর কিল্‌প্যাট্রিক আম্র বনে সেনাচালনা করিতেছিলেন! † ইংরাজ-সেনা পুনরায় উন্মুক্ত প্রান্তরে সমবেত হইয়াছে, এই সংবাদে ক্লাইব দ্রুতপদে সেনাদলে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহার অনুমতি না লইয়াই কিল্‌প্যাট্রিক এরূপ অসমসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া, সেই অপরাধে তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। ‡ পরে আত্মভ্রম বুঝিতে পারিয়া, স্বয়ং সেনাচালনার ভার গ্রহণ করিয়া, মেজর সাহেবের দৃষ্টান্তানুসরণ করত ক্রমশঃ সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এতদ্দর্শনে অনেকেই পলায়ন করিতে লাগিল।

* Orme, Vol. ii, 175.

† Some say he was asleep, which is not improbable, considering how little rest he had for so many hours before; but this is no imputation either against his courage or conduct.—Orme, Vol. ii, 176.

‡ *Ibid.*

কিন্তু ফরাসী-বীর সিনফ্রেঁ এবং বাঙ্গালী-বীর মোহনলাল ফিরিয়া দাঁড়াইলেন ;—তাঁহাদের সেনাদল হটিল না। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ,—তাঁহারা অকুতোভয়ে অমিতবিক্রমে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

এদিকে কতকগুলি সিপাহী-সেনাকে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে দেখিয়া সুচতুর রায়দুর্ল্লভ সিরাজদ্দৌলাকেও পলায়ন করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। সিরাজ সহসা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন না। মুসলমান ইতিহাস-লেখক বলেন যে, যখন দিবা অবসানপ্রায়, তখন সিরাজদ্দৌলা দেখিলেন যে বিপুল সেনাপ্রবাহের মধ্যে অল্প লোকেই তাঁহার জন্য যুদ্ধ করিতে-ছেন ; এইরূপ অবস্থায় তাঁহার মনে হইল, পলাশিতে পরাজিত না হইয়া, রাজধানী রক্ষার জন্য মুর্শিদাবাদে গমন করাই বুদ্ধি-মানের কার্য্য।* রাজবল্লভও সেই মতের পোষণ করিলেন। সুতরাং সিরাজদ্দৌলা আর ইতস্ততঃ না করিয়া, দুই সহস্র অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে গজারোহণে যুদ্ধভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন। †

মীরজাফর সময় পাইয়া ইংরাজদলে যোগদান করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইংরাজেরা কিন্তু শত্রুমিত্র

* "সিরাজুদ্দৌলানে যব্ লস্করকা ইয়া হাল দেখা, নেয়ায়েৎ খৌফ্‌মন্ হো থর্‌সে ভালা আঁহুসে, কেঁওকে বহুৎ কম্‌লোগোঁকে আপ্‌না দোস্ত জানতা থা * * কৈ ঘড়িভর রোজ বাকী রহথা কে খোদ্‌ভি ভাগ নিক্‌লা।"—মুতক্ষরীন (অনুবাদ)।

† অর্ম্মি সিরাজদ্দৌলাকে 'উষ্ট্রারোহণ' করাইয়াছেন ; মেকলে তাহার উপর রং চড়াইয়া 'দ্রুতগামী' শব্দ যোগ করিয়া দিয়াছেন। স্ক্রাফ্‌টন যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন, তিনি লিখিয়াগিয়াছেন—"সিরাজ গজারোহণেই পলায়ন করিয়াছিলেন।"

চিনিতে না পারিয়া, তাঁহার উপরও গোলাবর্ষণ করিতে ত্রুটি করিলেন না! * অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিতে করিতে মোহনলাল এবং সিনফ্রে বিশ্বাসঘাতক নবাব-সেনানায়কদিগের উপর বিরক্ত হইয়া সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। নবাবের পরিত্যক্ত জনশূন্য পটমণ্ডপের দিকে ইংরাজ-সেনা মহাদম্ভে অগ্রসর হইয়া, পলাশি-যুদ্ধের শেষ চিত্রপট উদ্‌ঘাটিত করিল। †

পরিণাম বড়ই উজ্জ্বল বলিয়া পলাশির যুদ্ধ এখন বৃটিশ-বাহিনীর মহাযুদ্ধের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। যে সেনাদল পলাশি-সমরে জয়লাভ করিয়াছিল, তাহাদের পতাকাশীর্ষে এখনও পলাশির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ‡ কিন্তু যেরূপে পলাশি-ক্ষেত্রে সিরাজ-সেনার পরাজয় সাধিত হইয়াছিল, তাহাতে ইহাকে প্রকৃত সমর বলিয়া বর্ণনা করা যায় না! সিরাজ-সেনা যেরূপ ভাবে ব্যূহ রচনা করিয়াছিল, সেইরূপ ভাবে সমরক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া থাকিলেও তাহাদিগকে পরাজিত করা সম্ভব হইত না। তাহারা আম্র বন বেষ্টন করিয়া বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিলে ত কথাই ছিল না!

* Orme, Vol. ii, 176.

† It was only when treason had done her work, when treason had driven the Nuab from the field, when treason had removed his army from its commanding position, that Clive was able to advance without the certainty of being annihilated. Plassy, then, though a decisive, can never be considered a great battle.—Col. Malleson's Decisive Battles of India, p. 73.

‡ Praise was more particularly given to the 39th Regiment which still bears on its banners the name of 'Plassy' and the motto *Primus in Indis*.—Great Battles of the British Army, p.169.

রাজবিদ্রোহীদিগের কুমন্ত্রণায় সিরাজদ্দৌলা সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে, রাজবিদ্রোহিদলের চক্রান্তে সিরাজ-সেনা তাহাদের অধিকৃত সঙ্কেতভূমি হইতে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিলে, এবং মীরজাফরাদির চক্রব্যূহ আত্মকার্য্য-সাধন করিতে অগ্রসর না হইয়া ধীরে ধীরে শিবিরাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলে,—শূন্যক্ষেত্রের উপর দিয়া ইংরাজেরা সদর্পে অগ্রসর হইবার অবসর লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল কথার আলোচনা করিয়া ইংরাজ বীর-কেশরী মহামতি ম্যালিসন বলিয়া গিয়াছেন,—"ইহাকে প্রকৃত যুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করা যায় না।" * পলাশির যুদ্ধভূমি ভাগীরথীর গর্ভে বিলীন হইয়াছে। † লক্ষবাগের শেষ আম্রবৃক্ষটি সমূলে উৎখাত হইয়া বিলাতে চালান হইয়াছে। ‡ মহেশপুরের কুঠির সাহেবেরা নাকি সেই আম্রকাষ্ঠে একটি সিন্দুক প্রস্তুত করিয়া মহারাণী ভারতেশ্বরীকে উপঢৌকন পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এখন কেবল স্থাননির্দ্দেশের জন্য একটি আধুনিক জয়স্তম্ভে লিখিত আছে :—

PLASSY

ERECTED BY THE BENGAL GOVERNMENT, 1883.

* It was not a fair fight.—Col. Mallison.

† যুদ্ধভূমির নিকট দিয়া যে রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার একটি ষ্টেশনের নাম—পলাশি। তাহা যুদ্ধক্ষেত্র নহে। লর্ড কর্জন সমগ্র নদীয়া জেলাকে পলাশি জেলা বলিয়া নূতন নামে পরিচিত করিয়া স্মৃতিরক্ষার কল্পনা করিয়াছিলেন ; সে কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

‡ H. Beveridge, C. S.

এই বয়াক্ষর ফলকলিপি ভিন্ন আরও এক নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা একজন মুসলমান জমাদারের সমাধিস্তূপ। মুসলমান বীর সম্মুখ-সংগ্রামে সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন-রক্ষার জন্য প্রাণপণে অস্ত্রচালনা করিয়া, অবশেষে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। প্রতি বৃহস্পতিবারে বাঙ্গালী কৃষাণ-কৃষাণীরা তাহার উপর ভক্তিভরে ফুল-ফল-তণ্ডুলকণা "সিন্নি" প্রদান করিয়া এখনও সেই পুরাকাহিনী সঞ্জীবিত রাখিয়াছে।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে

হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে? সেই নির্ম্মল নীলাভ জল—যার মধ্যে দশ হাত গভীরের মাছের পাখ্‌না গোণা যায়, সেই অপূর্ব্ব সুস্বাদু হিমশীতল "গাঙ্গং বারি মনোহারি" আর সেই অদ্ভুত "হর্‌ হর্‌ হর্‌" তরঙ্গোত্থ ধ্বনি, সাম্‌নে গিরিনির্ঝরের "হর্‌ হর্‌" প্রতিধ্বনি,—সেই বিপিনে বাস, মাধুকরী ভিক্ষা, গঙ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপাকার-শিলাখণ্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই জল পান, চারিদিকে কণপ্রত্যাশী মৎস্যকুলের নির্ভয় বিচরণ? সে গঙ্গাজল-প্রীতি, গঙ্গার মহিমা, সে গাঙ্গ্য বারির বৈরাগ্যপ্রদ স্পর্শ, সে হিমালয়বাহিনী গঙ্গা, শ্রীনগর, টিহিরি, উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রী, তোমাদের কেউ কেউ গোমুখী পর্য্যন্ত দেখেচ; কিন্তু আমাদের কর্দ্দমাবিলা, হরগাত্র-বিঘর্ষণশুভ্রা, সহস্রপোতবক্ষা এ কলিকাতার গঙ্গায় কি এক টান আছে, তা ভোলবার নয়। সে কি স্বদেশপ্রিয়তা বা বাল্যসংস্কার—কে জানে? হিন্দুর সঙ্গে মায়ের সঙ্গে এ কি সম্বন্ধ।—কুসংস্কার কি? হবে, গঙ্গা গঙ্গা কোরে জন্ম কাটায়, গঙ্গাজলে মরে, দূর দূরান্তরের লোক গঙ্গাজল নিয়ে যায়, তাম্র-পাত্রে যত্ন কোরে রাখে, পালপার্ব্বণে বিন্দু বিন্দু পান করে। রাজারাজড়ারা ঘড়া পূরে রাখে, কত অর্থব্যয় কোরে গঙ্গোত্রীর জল রামেশ্বরের উপর নিয়ে গিয়ে চড়ায়; হিন্দু বিদেশে যায়—

হৃষীকেশ ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গঙ্গার শোভা ও মাহাত্ম্য।

রেঙ্গুন, জাভা, হংকং, জাঞ্জীবর, মাডাগাস্কর, সুয়েজ, এডেন্, মাল্‌টা—সঙ্গে গঙ্গাজল, সঙ্গে গীতা। গীতা-গঙ্গা—হিঁদুর হিঁদুয়ানি। গেল বারে আমিও একটু নিয়েছিলুম—কি জানি! বাগে পেলেই এক আধ বিন্দু পান কর্‌তাম। পান কর্‌লেই কিন্তু সে পাশ্চাত্ত্য জনস্রোতের মধ্যে, সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে, সে কোটী কোটী মানবের উন্মত্তপ্রায় দ্রুতপদসঞ্চারের মধ্যে মন যেন স্থির হ'য়ে যেত। সে জনস্রোত, সে রজোগুণের আস্ফালন, সে পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বিসংঘর্ষ, সে বিলাসক্ষেত্র, অমরাবতীসম পারিস, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন, রোম—সব লোপ হয়ে যেত, আর শুন্‌তাম—সেই "হর্ হর্ হর্," দেখ্‌তাম—সেই হিমালয়ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন, আর কল্লোলিনী সুরতরঙ্গিণী যেন হৃদয়ে মস্তকে শিরায় শিরায় সঞ্চার কর্‌চেন, আর গর্জ্জে গর্জ্জে ডাক্‌চেন—"হর্ হর্ হর্" !!

* * * * *

আপনার লোকের একটি রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। নিজের খ্যাঁদা-বোঁচা ভাই বোন ছেলে মেয়ের চেয়ে গন্ধর্ব্বলোকেও সুন্দর পাওয়া যাবে না সত্য। কিন্তু গন্ধর্ব্বলোক বেড়িয়েও যদি আপনার লোককে যথার্থ সুন্দর পাওয়া যায়, সে আহ্লাদ রাখ্‌বার কি আর জায়গা থাকে? এই অনন্তশস্পশ্যামলা সহস্রস্রোতস্বতীমাল্যধারিণী বাঙ্গালা দেশের একটি রূপ আছে। সে রূপ—কিছু আছে মলয়ালমে (মালাবার), আর কিছু কাশ্মীরে। জলে কি আর রূপ নাই? জলে জলময়, মুষলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্চে, রাশি রাশি

বাঙ্গালা দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য।

তাল নারিকেল খেজুরের মাথা একটু অবনত হ'য়ে সে ধারাসম্পাত বইচে, চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ,—এতে কি রূপ নাই? আর আমাদের গঙ্গার কিনারা, বিদেশ থেকে না এলে, ডায়মণ্ড-হারবারের মুখ দিয়ে না গঙ্গায় প্রবেশ করলে, সে বোঝা যায় না। সে নীল নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোণালি কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ ঝোপ তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেল্‌চে, তার নীচে ফিকে, ঘন, ঈষৎ পীতাভ একটু কালো মেশানো, ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ী ঢালা আম নীচু জাম কাঁটাল,—পাতাই পাতা—গাছ ডাল পালা আর দেখা যাচ্চে না, আশে পাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেল্‌চে দুল্‌চে, আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়ারকান্দি ইরানি তুর্কিস্তানি গাল্‌চে দুল্‌চে কোথায় হার মেনে যায়—সেই ঘাস, যতদূর চাও সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে ছুঁটে ঠিক কোরে রেখেচে; জলের কিনারা পর্য্যন্ত সেই ঘাস; গঙ্গার মৃদুমন্দ হিল্লোল যে অবধি জমিকে ঢেকেচে, যে অবধি অল্প অল্প লীলাময় ধাক্কা দিচ্চে, সে অবধি ঘাসে আঁটা। আবার তার নীচে আমাদের গঙ্গাজল। আবার পায়ের নীচে থেকে দেখ, ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর পর্য্যন্ত, একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা, একটি রঙে এত রকমারি, আর কোথাও দেখেচ? বলি, রঙের নেশা ধরেচে কখন কি—যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে? হুঁ, বলি—এই বেলা এ গঙ্গা-মার শোভা যা দেখবার দেখে নাও, আর বড়একটা কিছু

থাক্‌চে না। দৈত্য-দানবের হাতে প’ড়ে এ সব যাবে। ঐ ঘাসের যায়গায় উঠবেন—ইটের পাঁজা, আর নাব্‌বেন ইটখোলার গর্ত্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে খেলা কর্‌চে, সেখানে দাঁড়াবেন পাট-বোঝাই ফ্ল্যাট, আর সেই গাধাবোট; আর ঐ তাল-তমাল-আঁব-নীচুর রঙ, ঐ নীল আকাশ, মেঘের বাহার, ও-সব কি আর দেখ্‌তে পাবে? দেখ্‌বে—পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মত অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আচেন্ কলের চিম্‌নি!!!

* * * * *

কি সুন্দর! সাম্‌নে যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘন নীলজল তরঙ্গায়িত, ফেনিল, বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নাচ্চে। পেছনে আমাদের গঙ্গাজল, সেই বিভূতিভূষণা, সেই "গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেঃ।" সে জল অপেক্ষাকৃত স্থির, সাম্‌নে মধ্যবর্ত্তী রেখা। জাহাজ একবার সাদা জলের একবার কালো জলের উপর উঠ্‌চে। ঐ সাদা জল শেষ হয়ে গেল। এবার খালি নীলাম্বু, সাম্‌নে পেছনে আশে পাশে খালি নীল নীল নীল জল, খালি তরঙ্গভঙ্গ। নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গ-আভা, নীল পট্টবাস পরিধান। কোটী কোটী অসুর দেবভয়ে সমুদ্রের তলায় লুকিয়েছিল; আজ তাদের সুযোগ, আজ তাদের বরুণ সহায়, পবনদেব সাথী; মহা গর্জ্জন, বিকট হুঙ্কার, ফেনময় অট্টহাস দৈত্যকুল আজ মহোদধির উপর রণতাণ্ডবে মত্ত হয়েচে! তার মাঝে আমাদের অর্ণবপোত; পোতমধ্যে যে জাতি সসাগরা ধরাপতি, সেই জাতির নরনারী—বিচিত্র বেশভূষা, স্নিগ্ধ চন্দ্রের ন্যায় বর্ণ, মূর্ত্তিমান্ আত্ম-নির্ভর, আত্মপ্রত্যয়, কৃষ্ণবর্ণের নিকট দর্প ও দম্ভের ছবির ন্যায়

প্রতীয়মান—সগর্ব্ব পাদচারণ করিতেছে। উপরে বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের জীমূতমন্দ্র, চারিদিকে শুভ্রশির তরঙ্গকুলের লম্ফ-ঝম্ফ গুরুগর্জ্জন, পোতশ্রেষ্ঠের সমুদ্র-বল উপেক্ষাকারী মহাযন্ত্রের হুহুঙ্কার—সে এক বিরাট্ সম্মিলন—তন্দ্রাচ্ছন্নের ন্যায় বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া ইহাই শুনিতেছি; সহসা এ সমস্ত যেন ভেদ করিয়া বহু স্ত্রীপুরুষকণ্ঠের মিশ্রণোৎপন্ন গভীরনাদ ও তার-সম্মিলিত "রুল ব্রিটানিয়া রুল দি ওয়েভস্" মহাগীতধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল।

স্বামী বিবেকানন্দ।

মহাত্মা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সে আজ অনেক দিনের কথা। এক সুদূর পল্লীতে বাল্যকালে আমি যখন কল্পনার ফলকে নানা রঙ ফলাইতেছিলাম, তখন সেই কল্পনার সোণালি ফলকে দুইটি চিত্র বেশ সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিত—তাহার একখানি 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর'; অপর-খানি 'গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়'। তখন আমি স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে পড়ি। বড়ই ইচ্ছা হইত, এই দুই জনকে একবার দেখিব। আমার বেশ মনে আছে আমার একজন আত্মীয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেন, "বাবা, গুরুদাস জজের মত হও।" গুরুদাস জজের গুণগ্রাম শুনিতে শুনিতে আমার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া উঠিত। একবার স্কুলের এক অবকাশে কলিকাতায় আসিলাম। বাগবাজার ষ্ট্রীটে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকিতাম। তাঁহাদের নিকট শুনিলাম যে গুরুদাসবাবু প্রতি রবিবারে সেই পথ দিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যান। প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই আমি শয্যাত্যাগ করিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইতাম। সেই যে সৌম্য সুন্দর প্রশান্ত মূর্ত্তি বাল্যকালে আমাকে ভুলাইয়াছিল, তাহার প্রভাব আমি কখনও অতিক্রম করিতে পারি নাই। তিনি যে ছেলেবেলা হইতেই এমনই করিয়া আমাকে রাস্তায় দাঁড় করাইয়াছেন, একথা যখন পরে আমি

গুরুদাসবাবুকে বলিয়াছি, তখন তিনি তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়ের সঙ্গে বলিতেন, "আপনি আমাকে বড়ই বাড়াইয়া দিতেছেন!" দেখিতাম তিনি আত্মপ্রশংসা শুনিয়া বড়ই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছেন। ব্রাহ্মণ জানিতেন না যে, তাঁহার মহত্ত্বকে বাড়াইয়া তোলা আর পর্ব্বত-চূড়ার উচ্চতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা একই প্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল।

বস্তুতঃ তাঁহার মন পর্ব্বত-চূড়ার মতই উন্নত ছিল; তাঁহার চরিত্র পর্ব্বত-চূড়ার মতই অচল অটল স্থির ছিল; পর্ব্বত-চূড়ারই মত আর্য্য-গৌরব তাঁহার সেই ক্ষীণ কৃশ শরীরের ভিতর মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান ছিল। আমি তাঁহার বড় কাছে গিয়া পড়িবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম। সেই জন্য হয়ত ভাল করিয়া আমি তাঁহাকে বুঝিতে পারি নাই। কোনও জিনিষকে ভাল করিয়া দেখিতে গেলে যেটুকু দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে হয়, আমার বোধ হয় সেটকু দূরত্ব ছিল না। আমি তাঁহার নিকট শিষ্যের মত, ভক্তের মত, সন্তানের মত গিয়াছিলাম। তিনিও আমাকে যে স্নেহ দান করিয়াছিলেন, তাহার মত স্নেহ অন্যের নিকট কখনও পাই নাই, পাইব না।

যখনই গিয়া তাঁহার পদতলে বসিতাম, তখনই তিনি নানা কথার ছলে তাঁহার জীবনের আলোক আমার দিকে ফিরাইয়া ধরিতেন। সে পুণ্যস্পর্শে নিজের দৈন্য যে কেবল মাথা নত করিয়া তাঁহার চরণ-ধূলির নিম্নে পড়িত, তাহা নহে; মনে হইত, পিতামাতা যেমন আপন শিশুর ধূলি-মলিনতা সযত্নে মুছাইয়া তাহাকে আপনার অঙ্কে তুলিয়া লন, তেমনই তিনি সমস্ত দৈন্য ঘুচাইয়া সকলকে আপনার পার্শ্বে বসাইতেন। কেহ বুঝিতে

পারিত না, তিনি কত বড়। এই যে অভিমানলেশবর্জ্জিত মহানুভবতা, ইহা আর কাহারও নিকটে গিয়া অনুভব করি নাই।

আমি আমার দিক্ দিয়াই তাঁহার কথা বলিতেছি। কিন্তু এ কথা, যাঁহারা গুরুদাসবাবুর সম্পর্কে আসিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের সম্বন্ধেই খাটে। তাঁহার চরিত্র একখানি পরশ-পাথরের মত ছিল। যাহাকে তিনি স্পর্শ করিয়াছেন, তাহাকেই সোণা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের যাঁহারা নেতা তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই গুরুদাসের প্রভাব স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। তাঁহাদের যে অংশ তিনি স্পর্শ করিতে পারিয়াছিলেন, সেই অংশকেই উজ্জ্বল ও মহনীয় করিয়া গিয়াছেন। কত লোককে যে তিনি হাত ধরিয়া উপরে উঠাইয়া দিয়াছেন, তাহা আমাদের জানিবার সময় আসিবে পরে—যখন আমাদের দেশের বর্ত্তমান কালের নেতাদিগের জীবন-চরিত যথার্থভাবে লিপিবদ্ধ হইবে।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। সে সময় আমার নাই; সে যোগ্যতার দাবীও আমি রাখি না। আমি শুধু একটি বিষয় সম্বন্ধে বলিব। গুরুদাসবাবুর চরিত্রে হিন্দু ধর্ম্মের প্রভাব কেমন জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল—তিনি প্রাচীন ঋষিদিগের আদর্শ কেমন ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন—ব্রাহ্মণের তেজ কেমন তাঁহাতে দেদীপ্যমান হইয়াছিল—সে সকল ন্যূনাধিক সাম্প্রদায়িক কথা। যাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তাঁহাদেরই নিকটে সে সকল কথার মূল্য থাকিতে পারে। আমি তাঁহার সার্ব্বজনীন একটি ভাব যাহা লক্ষ্য করিয়াছি, যাহা সকলেরই আদরের বস্তু এবং যাহা হিন্দু

ধর্ম্মেরও সার, সেই সম্বন্ধে কিছু বলিব। তাঁহার চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান অভিব্যক্তি হইয়াছিল তাঁহার আত্ম-নিবৃত্তিতে। আমরা সকলেই জানি তাঁহার মাতৃভক্তি কিরূপ প্রগাঢ় ছিল, তাঁহার নিষ্ঠা কিরূপ অসীম ছিল। কিন্তু অনেকে হয়ত জানেন না যে, নিবৃত্তিই তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য-সম্পাদন করিয়াছিল। তিনি বাসনাকে যথাসাধ্য খর্ব্ব করিয়াছিলেন, ভোগকে প্রায় বর্জ্জন করিয়াছিলেন, বিলাস-স্পৃহা তাঁহার জীবনে কখনও দেখা দেয় নাই, লালসা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। এই জন্যই তিনি হাইকোর্টের বিচারপতির পদ লাভ করিয়াও বিচলিত হয়েন নাই। সময় উপস্থিত হইলে তিনি তাহা পরিত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই। ভাইস চ্যান্সেলারের পদ গ্রহণ করিয়া যখন তাহার দুই বর্ষ সমাপ্ত হইল, তখন তিনি রাজপ্রতিনিধির অনুরোধেও আর এক দিনের জন্যও সে লোভনীয় পদ অধিকার করিতে ইচ্ছা করেন নাই; পদমর্য্যাদা, সম্মান, প্রতিষ্ঠা, যশ তাঁহাকেই অন্বেষণ করিয়া বরণ করিত, তিনি কখনও তাহাদের জন্য লোলুপ হয়েন নাই; এবং যখন যশের পুষ্পমাল্য তাঁহার কণ্ঠে অর্পিত হইত, তখন তিনি সে পুষ্পমাল্য তাঁহার অফিসের পোষাকের মতই ছাড়িয়া ফেলিতেন। অভিমান কখনও তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইতে পারে নাই। বাহ্য আড়ম্বরের অন্তরালে তিনি তাঁহার আত্মাকে মুক্ত—স্বাধীন রাখিতে চেষ্টা করিতেন। খড়ম পায়ে দিয়া কোঁচার খুট গায়ে দিয়া তিনি যখন বসিতেন, তখন তাঁহার পবিত্র আত্মার জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া যে আলোক-বিকিরণ করিত তাহার তুলনায় রাজপদ, সম্পদ্, গৌরব সকলই বৃথা।

যখন তিনি গঙ্গার ঘাটে মৃত্যুশয্যায় শয়ান, তখন তিনি আমাকে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহারই মধ্যে তাঁহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য সুন্দর রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি দুর্ব্বল, অস্থিকঙ্কালসার দেহে শয্যাবিলগ্ন, উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে জাহ্নবীর অনাবিল জলরাশির উচ্ছল কল্লোল তাঁহার চক্ষু-কর্ণের শান্তিসাধন করিতেছে। তখনও সেই ব্রাহ্মণ তারস্বরে বলিলেন, "আমি এখানে আসিয়া ভাল বোধ করিতেছি; শয্যায় শুইয়া, ঐ দেখুন গঙ্গার দিগন্ত-প্রসারিণী মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি। ভাবিতেছি এই দিকে যাইব কি আপনাদের দিকে ফিরিব। বোধ হয় ঐ দিকে যাওয়াই ভাল, কিন্তু এখনও আমি আপনাদের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিতে পারি নাই, পারিলে ত জীবন্মুক্ত হইতে পারিতাম।"

এই জীবন্মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। আহারের জন্য, বিলাসের জন্য, ভোগের জন্য তিনি কখনই আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। জীবনকে ইহাদের অনেক ঊর্দ্ধে স্থাপন করিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার কামনা। তাই আজ দেশ অশ্রুপ্লাবনে তাঁহার চিতা-রজ প্রক্ষালিত করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি—তিনি যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, যে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা আমাদের পক্ষে অক্ষয় হউক। আমরা জানি আত্মার বিনাশ নাই। এই বিজ্ঞান-মন্দিরে দাঁড়াইয়া আধুনিক বিজ্ঞানের শক্তিবাদের আশ্রয় লইয়া বলিতে পারি—আত্মা শক্তির কেন্দ্রমাত্র। সে শক্তি দেহের সহিত লয়প্রাপ্ত হয় না। যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ—কোন্ সুদূর অতীতে দেহরক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের আত্মা শত সহস্র

আত্মাকে শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া দেশকালের ব্যবধান দূর করিয়া দিয়া অমরতা লাভ করিয়াছে। আমি আশা করি, স্বর্গীয় ঋষিকল্প, সুব্রাহ্মণ, ত্যাগশীল, মহাত্মা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন আমাদের অন্তরে শক্তিসঞ্চার করিয়া যুগযুগান্ত কাল আমাদের জীবন ও দেশকে ধন্য করিবে।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

তাজমহল

সম্রাটের নিবাস-দুর্গের অভ্যন্তরস্থ দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিতে দেখিতে যখন গাইডের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, তখন এক সময়ে সে আমাকে এক আলোকহীন নির্ব্বাত সুড়ঙ্গের মধ্যে অনেকদূর পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিল; কিছুদূর পর্য্যন্ত সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতে হয়, তাহার পর পথ ক্রমে অপ্রশস্ত হইয়া আসিয়াছে এবং উহা এমন সূচিভেদ্য অন্ধকারে আবৃত যে, সে অন্ধকারে অল্পক্ষণ থাকিলেই সূর্য্যচন্দ্রালোকিত ধরণীর বক্ষোবিহারী জীবের শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হয়। বৃহৎ একটি মশাল জ্বালাইয়া আমাদের সঙ্গে এক ব্যক্তি সেই সুড়ঙ্গপথে পথ দেখাইয়া যাইতেছিল, আমি এবং আমার গাইড মীর খাঁর তৎকালীন মনোভাব কি ছিল জানি না; আমি স্বীকার করিতেছি যে যতদূর আমি সেই সুড়ঙ্গপথে নামিয়া গিয়াছিলাম, ভয়লেশশূন্য দ্বিধাহীন চিত্তে যাই নাই। কিছুদূর গিয়া যখন অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হইয়া আসিতে লাগিল এবং বায়ুহীন সুড়ঙ্গের আর্দ্রমৃত্তিকা আমার পায়ে ঠেকিতে লাগিল, আমি আর অগ্রসর না হইয়া মীর খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাতালোকবর্জ্জিত এই পাতালপুরীর সুড়ঙ্গপথ মোগল বাদশাহগণের কি প্রয়োজনে লাগিত জান? সে আমার প্রশ্নের রকম শুনিয়া হাসিয়া যাহা বলিল তাহার মর্ম্মার্থ এই :—মুসলমান বাদশাহগণের একাধিক বেগম থাকিতই। যদি কখনও কোন বেগমের স্নেহ মমতা প্রেম ও সতীত্বের প্রতি

বাদশাহের সন্দেহ জন্মিত, তাহার প্রাণদণ্ডের বিধান হইত কিন্তু বধদণ্ডার্হ সাধারণ জনগণের মৃত্যু-ব্যবস্থার সহিত বেগম-গণের মৃত্যু-ব্যবস্থা এক হইতে পারে না এবং প্রকাশ্য স্থানেও তাহাদের বধকার্য্য সমাধা হইতে পারে না, সেই জন্য রঙমহলের মধ্যে এই অন্ধকার মৃত্যুপুরী নির্ম্মিত হইয়াছিল। যাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইত, তাহাকে এই অলোকহীন বায়ুশূন্য পাতাল-পুরীতে রাখিয়া তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইত। অল্পকাল মধ্যেই সে হতভাগিনী এই অন্ধকার হইতে আর কোন গাঢ়তর অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত হইত কি না কে জানে? এইরূপে নিরুদ্বেগে বেগমের জীবনলীলা সাঙ্গ হইয়া যাইত, বাহিরের কাকপ্রাণীতেও জানিতে পারিত না।

সূচিভেদ্য অন্ধকারাবৃত বাতবিবর্জ্জিত মৃত্যুপুরীর সুড়ঙ্গপথে দাঁড়াইয়া মীর খাঁর মুখে এই কথা শুনিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। আমি আর অগ্রসর হইলাম না। তাহাকে কহিলাম, "ফিরিয়া চল।" এই বলিয়া আমি সর্ব্বাগ্রে ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। মীর খাঁর ইচ্ছা ছিল যে আরও কিছুদূর আমরা যাই; সে বারংবার বলিতে লাগিল যে আর একটু অগ্রসর হইলেই যেখানে বেগম সাহেবাদিগের বধকার্য্য শেষ করা হইত, সে অন্ধকার মৃত্যুগহ্বর দেখা যাইবে। আমি তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, যে ব্যক্তি মশাল লইয়া গিয়াছিল তাহাকে ফিরিতে বলিলাম এবং এক তিলও অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে, যে পথে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিলাম সেই পথে, ফিরিয়া আসিতে লাগিলাম। অগত্যা মীর খাঁ এবং মশাল্চীও আমার সঙ্গে ফিরিল। সুড়ঙ্গপথ এমনই বায়ুহীন যে, যে সময়টুকু আমরা

সেখানে ছিলাম সেই অল্পকাল মধ্যেই আমাদের মশাল দুই তিন বার নিবিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল, জানি না কি কৌশলে মশালচী একেবারে উহা নির্ব্বাপিত হইতে দেয় নাই। যদি সেই বাতালোক-বিবর্জ্জিত রসাতলপথে আমাদের মশালটি নিবিয়া যাইত তাহা হইলে আমি যে ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিতাম, সে কথা স্বীকার করিতে আমার কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ হইতেছে না। যাঁহারা আগ্রাদুর্গের এই রসাতলপুরীর অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ দেখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই যে আমার সহিত একমত হইবেন সে বিষয়েও আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

সত্য সত্যই কিংবা ভয়ে জানি না, যখন সেই সূচিভেদ্য অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে দাঁড়াইয়া অভাগিনী বেগমগণের শোচনীয় মৃত্যু-গল্প খাঁ সাহেবের মুখে শুনিতেছিলাম, আমার বোধ হইতে লাগিল যেন শ্বাসক্রিয়া-রোধ হইয়া আসিতেছে। তাহার উপরে সেই বায়ুহীন রসাতলের আর্দ্রমৃত্তিকার স্পর্শ যখন পদতলে অনুভব করিলাম তখন মনে হইতেছিল, সত্য সত্যই বুঝি যমপুরীতে আসিয়াছি এবং আর কিছুক্ষণ এখানে বিলম্ব করিলে ভূতপূর্ব্ব বেগমগণের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভও বুঝি অসম্ভব নহে। মীর খাঁ তাহার গাইডগিরি ব্যবসায় আরম্ভ করিবার পর হইতে বহু লোককে এই যমদ্বার দেখাইয়া আনিয়াছে; সুতরাং তাহার মনে কোন আশঙ্কা জাগিবার কোন কারণই হয়ত ছিল না। কিন্তু বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমও যাহার পূর্ণ হয় নাই সেরূপ বঙ্গ-সন্তানের মনোভাব সে সময়ে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে আমার পাঠক-পাঠিকাগণকে বিশেষ আয়াস করিতে হইবে না যাহা হউক, সেই যমপুরীর অন্ধকার দ্বারদেশ হইতে উদ্ধারলাভ

করিয়া আর বিলম্ব করি নাই এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাজগঞ্জে পৌঁছিতে হইবে বলিয়া সেই সময়েই তদভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলাম।

আগ্রাদুর্গের ফটক হইতে তাজের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত পথ নিতান্ত কম নহে, এই দীর্ঘপথ একাকী গাড়ীতে বসিয়া অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল এবং তখন মনের মধ্যে কত কি যে উদয় হইতেছিল তাহা আজ বিশ্লেষণ করিয়া বলিবার উপায় নাই। তবে এইটুকু মনে আছে যে, যে রাজাধিরাজের অকৃত্রিম নিবিড় প্রেম এবং দুঃসহ বিরহ-বেদনার মূর্ত্তচ্ছবি পৃথিবীর নানা দিগ্‌দেশাগত বিরহবিধুর নরনারীর হৃদয়ের ধন হইয়া রহিয়াছে, সেই প্রেমিক-প্রধান শাজাহানের নিবাস-দুর্গে নারীবধের নির্ম্মম আয়োজনের সামঞ্জস্য আমি নিজ মনে রক্ষা করিতে পারিতে-ছিলাম না;—কেবলই আমার মনে হইতেছিল যে ঐ অন্ধকার বায়ুবিহীন মৃত্যুপুরী শাজাহানের পূর্ব্বগত বা পরবর্ত্তী কোন সম্রাটের কীর্ত্তি; শাজাহানের আজ্ঞায় উহা কখনই নির্ম্মিত হয় নাই; কিংবা সেই অন্ধকার ভূ-গৃহ অন্য কোনও প্রয়োজন-সাধন-জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, নিঃস্নেহ নারীর নিধনকল্পে নির্ম্মিত হইবার কথা মীর খাঁর কল্পিত কাহিনী। প্রিয়-বিয়োগের দিন হইতে মৃত্যু-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যাহার অশ্রুজলের বিরাম ছিল না, যে বাদশাহের মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন, নিষ্প্রভ, ঊর্দ্ধ-তার লোচন প্রিয়দয়িতার সমাধি-মন্দিরের স্বর্ণশীর্ষ নিরীক্ষণ করিতে করিতে চিরদিনের জন্য নিমীলিত হইয়া গিয়াছে, চির-বিরহের দুঃসহ দুঃখে উচ্ছ্বসিত যাহার দীর্ঘশ্বাস আজও বুঝি তাজের মধ্যে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, একটি নারীর শেষ-শয়ন রচনা করিতে রাজকোষ শূন্য করিয়া যে প্রেমিক সপ্তসাগরের মণিমাণিক্য পরম যত্নে

আহরণ করিয়াছেন, নারীবধের অমানুষিক নির্ম্মম অনুষ্ঠান তাঁহার অনুজ্ঞায় অনুষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা আমার অন্তরাত্মা কিছুতেই মানিতে চাহিল না, এবং শাজাহানের উপরে আমার সাময়িক সন্দেহ সেদিনে ক্ষণকালের জন্যও যে গিয়া পড়িয়াছিল, সেজন্য আমি সেই লোকান্তরিত প্রেমসর্ব্বস্ব সম্রাটের উদ্দেশে যোড়করে বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম।

নিজ মনে এইরূপ কত কি চিন্তা কতক্ষণ ধরিয়া করিতেছিলাম তাহা ঠিক মনে নাই। এক সময়ে দেখিলাম আমাদের গাড়ী কতকগুলি পাথরের দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কোচ্‌বক্স হইতে মীর খাঁ নামিয়া আসিয়া সেলাম করিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দাঁড়াইল, এবং আমাকে উদ্দেশ করিয়া সসম্ভ্রমে কহিল, "হুজুর, গাড়ী তাজগঞ্জ পঁহুছ গেয়া।" আমি সুপ্তোত্থিতের মত চমকিয়া উঠিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম।

এ যে দিনের কথা বলিতেছি, সে দিনে ম্যাক্‌ডোনাল্ড পার্ক রচিত হয় নাই, পত্র-পুষ্প-পল্লব-সমাকুলিত বৃক্ষবল্লরী-সমাকীর্ণ উদ্যানের মধ্য দিয়া নতোন্নত প্রশস্ত রাজপথ তাজ-তোরণের সম্মুখে গিয়া শেষ হয় নাই। সে দিনে আগ্রা সহর হইতে যে পথে তাজের দ্বারদেশে পঁহুছিতে হইত সে পথ ধূলিমলিন, অমেধ্য-সমাকীর্ণ, সংস্কারবিহীন এক প্রকার দুর্গম পথই ছিল। তাজদর্শনার্থিগণ নানাবিধ যান-বাহনের সহায়তায় কোনমতে তাজের দ্বারদেশে গিয়া পঁহুছিত। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ তাজ-তোরণের সম্মুখে কতকগুলি প্রস্তর-বিক্রেতার দোকান থাকায় ক্রেতা-বিক্রেতার সমবেত সোর-হাঙ্গামায় সমাধি-মন্দিরের শব্দবিহীন স্তব্ধ-মহিমা এবং শান্তির সম্যক্ ব্যাঘাত জন্মাইত। গাড়ী হইতে যেমন

নামিয়াছি, মুহূর্ত্তের মধ্যে দেখিলাম প্রায় ত্রিশজন পাথরওয়ালা তাহাদের নানাবিধ কারুখচিত পাথরের থালা, রেকাবী, গেলাস, বাটি লইয়া আমার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে এবং কে কত সস্তায় সে সকল দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবে তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিবার প্রাণপাত চেষ্টায় লাগিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সম্রাটের প্রাণপ্রিয়তমা মহিষীর শ্মশানশয্যার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া ক্রয়-বিক্রয়ের এই কর্ণভেদী শব্দ আমার সমস্ত হৃদয়-মনকে যেন বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। আমি সে স্থান ত্যাগ করিয়া যথাসম্ভব সত্বরতার সহিত তাজসুন্দরীর তোরণদ্বারের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম।

তাজ-তোরণের বিরাট্ মহিমা এবং তাহার শিল্প-নৈপুণ্যের কথা বহু পুস্তকে পড়িয়াছিলাম এবং লোকমুখে সে কথা বহুবার শুনিয়াছি। কিন্তু সে দিকে আমার মন ছিল না এবং সেই তোরণদ্বারের দিকে দৃষ্টি দিয়া সময় নষ্ট করিবার ইচ্ছাও আমার ছিল না। ব্যথিত রাজরাজের বিয়োগবেদনা মন্থিত করিয়া ধরণীর যে অষ্টম বিস্ময়ের জন্ম সম্ভব হইয়াছে, সেই পাষাণসুন্দরীকে কখন দেখিব সেই আগ্রহে আমি পরিপূর্ণ হইয়া বসিয়াছিলাম।

তাজগঞ্জে পঁহুছিয়াই একেবারে তোরণদ্বার পার হইয়া গিয়া সেই অমল ধবল পাষাণনির্ম্মিত শোকমূর্ত্তির সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলাম। প্রথম দর্শনে মনের মধ্যে কোন ভাবের উদয় হইয়াছিল কি না এবং হইয়া থাকিলে কি ভাব তখন মনে আসিয়াছিল, কর্ণ যাহা শুনিয়াছিল চক্ষু তাহা দেখিল কি না, কিংবা যাহা দেখিল, কোটিকল্প ধরিয়া কীর্ত্তিত-মহিমা তাহার তুল্য হইতে পারিত কিনা, এ সকল কোন কথাই আজ বলিতে

পারিব না। কেবল এইমাত্র মনে আছে যে, পৃথিবীর সেই শ্রেষ্ঠতম বিস্ময়ের সম্মুখে বিস্মিত ও নিমেষহত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম এবং কেবলই মনে হইতেছিল যে ইহাকে না দেখিলে এবারের মানবজন্মটা নিতান্তই নিষ্ফল হইত।

এ ভাবে কতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলাম তাহা মনে নাই, বোধ হয় বহু ক্ষণই হইবে। এক সময়ে মীর খাঁ আমার নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "হুজুর চলিয়ে, ভিতর যাকে দেখিয়ে।" তাহার কথায় মন্ত্রচালিতের মত চলিলাম। তোরণ হইতে তাজের রক্তপাষাণ-নির্ম্মিত আসনপীঠ পর্য্যন্ত যে সকল ধারা-যন্ত্র সারি সারি সাজান রহিয়াছে, সে দিকে এবং চতুর্দ্দিকস্থ কুঞ্জবনের বৃক্ষবল্লরীর দিকে মীর খাঁ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, আমি নীরবে হস্তদ্বারা তাহাকে সে চেষ্টায় বিরত হইতে ইঙ্গিতে বলিয়া আমার নির্নিমেষ নয়ন তাজসুন্দরীর দিকে একাগ্রভাবে নিবদ্ধ রাখিয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই রক্তপাষাণ-বেদিকার নিম্নে গিয়া দাঁড়াইলাম এবং পাদুকা উন্মোচন করিয়া শ্বেত-প্রস্তরের সিঁড়ি বাহিয়া তাজ-যোগিনীর মর্ম্মর-যোগাসনের সন্নিহিত হইলাম। গঙ্গাস্নান উপলক্ষে তীরস্থ হইয়া ভক্ত যেমন পাদস্পর্শ-জনিত পাপের ক্ষয়-কামনায় সুরেশ্বরীর উদ্দেশে "অতঃ স্পৃশামি পাদাভ্যাং পাপং মে হর জাহ্নবি" বলিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করে, জানি না কেন সে দিনে সেই শুভ্র নিষ্কলঙ্ক শ্বেতমর্ম্মর-বেদিকার উপরে দাঁড়াইবার পূর্ব্বে আমারও অন্তরাত্মা পাদস্পর্শ-জনিত প্রত্যবায়ের ক্ষমার জন্য পরলোকবাসিনী সম্রাজ্ঞী বানু-বেগমের উদ্দেশে তদ্রূপ কোন মন্ত্রোচ্চারণের জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। যদিও যোড়করে অনুষ্টভ ছন্দের

কোন সংস্কৃত শ্লোক সশব্দে উচ্চারণ করি নাই, কিন্তু 'ময়ূর-সিংহাসনে' সমাসীন রাজাধিরাজের হৃদি-সিংহাসনের একাধিষ্ঠাত্রীর উদ্দেশে তাঁহার শেষ-শয়ন-সন্নিধানে উপনীত হইবার জন্য মর্ম্মরপীঠে অপরিহার্য্য পদস্পর্শ-পাপের অপরাধ-ভঞ্জনকল্পে অন্তরোত্থিত মন্ত্র যে অন্তরে-অন্তরেই উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা আজও আমি বিস্মৃত হই নাই।

গতপ্রায় বসন্ত-দিবসের অস্তমান সূর্য্যালোকে তাজের অভ্যন্তরের কারুশোভা যেখানে যাহা দেখিবার ছিল তাহা দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। গাইড মীর খাঁ কোন্ মূল্যবান্ প্রস্তর কোথা হইতে কত মূল্যে আসিয়াছে এবং কোন্ শিল্পী কোথা হইতে আসিয়া কত দিনে কতটুকু শিল্পচাতুর্য্য দেখাইয়া গিয়াছে, তাহার বিস্তৃত তালিকা আমাকে শুনাইতে লাগিল সত্য, কিন্তু সে দিকে আমার কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না। আমি আমার সকল মন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম দিয়া এই স্মৃতিমন্দিরের দেহহীন সৌন্দর্য্যটুকু ধরিবার প্রাণপাত চেষ্টা করিতেছিলাম। ইহার প্রতি প্রস্তর-সন্নিবেশের মধ্যে বিবিধ বর্ণানুরঞ্জিত-প্রস্তরখচিত ভিত্তিগাত্রের এবং শবাধারের আচ্ছাদন-শিলার শিল্পকৌশলের মধ্যে বাদশাহের বিপুল প্রেম এবং বিরহীর বিরাট্ বেদনা কেমন করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহাই বুঝিবার চেষ্টায় আমার সকল মন-প্রাণের শক্তি প্রয়োগ করিতেছিলাম। সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত জীবনে আমি শতাধিকবার তাজ দেখিয়াছি—যখনই পশ্চিমে গিয়াছি, টুণ্ডলা ষ্টেশনের নিকট দিয়া যাইতে হইলেই একবার তাজ দেখিয়া তবে আমার গন্তব্য স্থানে যাইতে মন অগ্রসর হইয়াছে।

স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে আগ্রায় আমি কিছুকাল বাস করিয়াছিলাম। সে সময়ে প্রতিদিন অপরাহ্ণে বায়ুসেবনের ছলে তাজ দেখিতে গিয়াছি; প্রথম যৌবনের প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত নানা বয়সে—কত সুখ কত দুঃখের দিনে, কত শোক ও আনন্দের মুহূর্ত্তে, কত মিলন ও বিরহের হর্ষ-বিষাদে, বারবার করিয়া দেখিতে দেখিতে তাজের সম্বন্ধে যে ভাব আমার হৃদয়ে আজ জাতমূল হইয়া গিয়াছে, প্রথম দর্শনের মুহূর্ত্তেই আমার হৃদয়ে সেই ভাব পরিপূর্ণরূপে আসিয়াছিল এ কথা বলিলে ঠিক বলা হইবে না; এবং তাজ সম্বন্ধে আজ যাহা বলিতেছি, তাহা ঠিক সেই প্রথম দর্শন-দিনের কথা ইহাও ঠিক নহে। প্রথম দর্শন-মুহূর্ত্তে মনে হইয়াছিল ইহা অপূর্ব্বদর্শন, ইহাকে না দেখিলে দর্শনেন্দ্রিয় সার্থক হয় না—এই মাত্র। তাই ইহাকে বারবার করিয়া দেখিয়াছি এবং বারংবার দেখিতে দেখিতে আজ বুঝিয়াছি যে পরিণত জীবনে বিশ্ব-ভুবনের সকল-বাড়া জীবনসর্ব্বস্ব ধনটিকে চক্ষুর সম্মুখ হইতে বিদায় দিয়া সেই অসহ্য বিরহের বিপুল দুঃখে উচ্ছলিত অশ্রুসমাকুল নয়নে তাজসুন্দরীর দিকে না চাহিলে শাজাহানের সুনিবিড় প্রেম ও সুদুঃসহ বেদনার কোন পরিমাপই পাওয়া যায় না।

তাজের অভ্যন্তরভাগ দেখিয়া যখন পুনরায় বাহিরে আসিলাম তখন গোধূলিলগ্ন প্রায় সমাগত। অস্তগমনোন্মুখ দিননায়ক পশ্চিম-শিখরীর উপর ঢলিয়া পড়িতেছেন। দিনশেষের ম্লানায়মান রবিরশ্মি কয়টি যাই যাই করিয়াও যেন যাইতে পারিতেছে না। শাজাহানের অফুরন্ত প্রেমের পরম ধনটি যেখানে তাহার শেষ-শয়ন বিছাইয়া চিরদিনের জন্ত চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছে, সেই

প্রেমমন্দিরের শুভ্রশীর্ষে এবং তাহার সুবর্ণচূড়ায় পরম স্নেহভরে কিয়ৎকাল অপেক্ষা না করিয়া তাহাদের যেন যাইবার উপায় নাই। স্নিগ্ধ সান্ধ্য রবির কিরণ কয়টি কবর-চূড়ায় পড়িয়া তাহাকে যে কি শোভাই দিয়াছিল তাহা না দেখিলে বলিয়া বুঝাইবার ভাষা কি আছে? নীল নির্ম্মল বসন্তাকাশের নিবিড় নীলিমার নিম্নে পদতলবাহিনী নৃত্যপরা নীল যমুনার উর্দ্ধে, কালিন্দীর তটসংলগ্ন নিকুঞ্জের শ্যাম মহোৎসবের মধ্যে শুভ্রমর্ম্মর-বিনির্ম্মিত গম্বুজের শ্বেতাম্বুজের উপরে রবিকিরণ-সম্পাতের শোভা যে স্বচক্ষে না দেখিয়াছে, কোন বর্ণনা দ্বারাই তাহাকে সে সৌন্দর্য্যের স্বরূপ বুঝান যায় কি না জানি না—বোধ হয়, না। সে দিনে পূর্ণিমা ছিল, কি প্রতিপদ, তাহা আজ ঠিক মনে নাই—ফলতঃ সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই সম্পূর্ণ গৌরবে পূর্ণপ্রায় চন্দ্রমার বিকাশের দিন তাহা মনে আছে। চন্দ্রকরস্নাতা তাজসুন্দরীর অপরূপ লাবণ্য দেখিবার জন্য উদ্যানমধ্যস্থ শ্বেতমর্ম্মরের 'চবুতরা'র উপরে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। হঠাৎ এক সময়ে মনে হইল, অপূর্ব্ব আলোকে তাজের মর্ম্মর-গম্বুজ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখি কোমল জ্যোৎস্নাধারা পাষাণসুন্দরীর অঙ্গ হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া চতুর্দ্দিকের কালো আকাশ আলো করিয়া দিয়াছে। মনে হইল যেন বিচ্ছুরিত চন্দ্ররশ্মিগুলি কোমল আলোকের রজ্জুরূপে চাঁদ এবং তাজকে এক গ্রন্থিবন্ধনে বাঁধিয়া দিয়াছে। প্রাণহীন কঠিন পাষাণের উপরে সূর্য্যচন্দ্রের কিরণসম্পাতে তাহাকে এমন কোমল করিয়া তুলিতে পারে, এত সৌন্দর্য্য তাহাকে দান করিতে পারে, ইহা আমি জীবনে এই প্রথম দেখিলাম; এবং ইহাই শেষ, কারণ

তাজ ব্যতীত অন্ত কোন মন্দির, মীনার, মস্‌জীদ, কবর, পুরী, প্রাসাদের কথা শুনি নাই বা পুস্তকে পড়ি নাই, যাহাকে অন্তরীক্ষ-চারী রবি-চন্দ্র-তারকা প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহের রশ্মিরেখা প্রতিদিন নব নব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া মানবের নয়ন-মনের সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইতে পারে। অস্তগমনোন্মুখ রক্তরবির রক্তিম রশ্মি-রেখায় মণ্ডিত তাজের সম্মুখে যখন দাঁড়াইলাম, তখন সেই দিনের কথা মনে আসিল, যে দিন সেলিম-নন্দন শাজাহান 'খুস্‌রোজের মীনাবাজারে' আসফ্‌নন্দিনী অনূঢ়া বান্থুর বিপণির সম্মুখে মুগ্ধনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পরিপূর্ণপ্রায় চন্দ্রালোকে পরিস্নাত তাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যখন তাহাকে অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছি, তখন এই মর্ম্মর-মন্দিরকে স্মৃতিসৌধ বলিয়া মনে হয় নাই। মনে হইয়াছে, রাজাধিরাজের পরিপূর্ণ প্রেমে পরম পরিতৃপ্তা প্রিয়রাণী তাঁহার অনিন্দ্য প্রৌঢ় সৌন্দর্য্যে রাজপুরী আলো করিয়া যেন অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। যে দিন বালসূর্য্যের অরুণিমায় পরি-ভূষিতাঙ্গী পাষাণসুন্দরীকে দেখিয়াছি, সে দিনে মনে হইয়াছে, যেন প্রাতঃস্নাতা পূজার্থিনী দেবমন্দিরে আত্মনিবেদনার্থ প্রস্তুত হইয়া মন্দিরপথ আলো করিয়া যাত্রা করিয়াছে; দিবা দ্বিপ্রহরের খর-রৌদ্রতাপ-স্তব্ধ বিমল যমুনার তীর-পুলিনে তাজসুন্দরীকে যে দিন বাক্যহীন মহামৌনতার মধ্যে সমাহিত দেখিয়াছি, সে দিন এই পাষাণসুন্দরী আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে প্রিয়-প্রেম-প্রার্থিনী পঞ্চতপা পার্ব্বতীর পরিপূর্ণ গৌরবে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

দুঃখ-শোক-বন্ধন-বেদনায় জর্জ্জরিত মানবজীবনে প্রেমের মত একান্ত প্রার্থনার সামগ্রী হয়ত দ্বিতীয় আর নাই। অসীম সম্পদের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিতই থাকুক, কিংবা দারিদ্র্যের সহিত

দৈনিক যুদ্ধে সর্ব্বাঙ্গে শ্রমজলের বন্যা বহিতেই থাকুক, একজনের একনিষ্ঠ প্রেমের সুনিবিড় বাহুবেষ্টনের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবার ইচ্ছা মানবহৃদয়ের একান্ত স্বাভাবিক ইচ্ছা। যাহার আগমন-প্রতীক্ষায় আকুল দুইটি আঁখি দিনান্তে দ্বারপ্রান্ত হইতে পথের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না, প্রজ্বলিত সান্ধ্য দীপালোকে রজনীর বিশ্রামার্থ শয্যারচনা যাহার জন্য হয় না, ব্যাধি-পীড়ার দিনে দুই-খানি শ্রান্তিহীন সেবাহস্তের সস্নেহ শুশ্রূষা দিতে এ সংসারে যাহার কেহ নাই, তাহার জীবনের সহিত তুলনায় আরবের বালুবেলা এবং সাহারার মরুক্ষেত্রকেও সরস বলিতে হইবে। শাজাহান যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা মানবজীবনে দুষ্প্রাপ্য এবং রাজজীবনে অপ্রাপ্য বলিলেও বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। সুন্দরী-প্রধানা নূরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্রী বানুবেগমের সৌন্দর্য্যের স্তবগান ইতিহাস চিরকাল ধরিয়া গাহিয়া আসিতেছে; যে দিল্লীর রঙমহলে দিল্লীশ্বরের বিলাস-বাসনা পরিতৃপ্তির নিমিত্ত পৃথিবীর নানা দিগ্দেশ হইতে সমাহৃত নারীসৌন্দর্য্যের লীলাতরঙ্গ নিয়ত উচ্ছলিত থাকিত, সেই শুদ্ধান্তের সম্রাজ্ঞী যে সুন্দরী হইবেন ইহা বিশেষ বড় কথা নহে। কিন্তু বহুবল্লভ নৃপতির হৃদিসিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহার প্রেমরাজ্যে একাধিপত্য বিস্তার করিতে পারা অতিবড় সৌভাগ্যের কথা, এবং মমতাজের অদৃষ্টে জীবনান্তের পরেও সে পরম সৌভাগ্য অটুট এবং অক্ষয় হইয়াই রহিয়াছিল। বাদশাহের সকলগুলি পুত্রকন্যার একমাত্র জননী হইবার সৌভাগ্য কেবল মমতাজের অদৃষ্টেই ঘটিয়াছিল এবং ইহা যে দিল্লীর রঙমহলের রাজ্ঞী-জীবনে কি অপার গৌরবের সামগ্রী তাহা তাঁহারাই জানিতেন, যাঁহারা সেই হত্যা-হলাহলে ভীষণ,

হিংসাদ্বেষে কলুষিত, একান্ত ভয়াবহ ঐশ্বর্য্য-নরকের মধ্যে নৃপতির নর্ম্মসহচরী হইয়া প্রবেশ করিতে বাধ্য হইতেন। কিশোরী বানুর সৌন্দর্য্যমুগ্ধ শাহজাদা শাজাহান যে দিন এই নারী-রত্নকে জীবনসঙ্গিনীরূপে অন্তঃপুরের একান্তে বরণ করিয়া লন, সেই দিন হৃদয়ের নিভৃত-নন্দনজাত প্রেমমন্দারদামে যে অমূল্য অর্ঘ্য তাঁহার জন্য রচিত হইয়াছিল, তাহার একটিমাত্র পরাগকেশরও জীবনে পরিম্লান বা ধূলিমলিন হইতে পারে নাই। নারী-জীবনে ইহার অধিক সৌভাগ্য আর কি আছে জানি না, এবং এ সৌভাগ্য বানু বেগম কেবল মাত্র তাঁহার জন্মকালীন গ্রহনক্ষত্রের সংস্থানবলে লাভ করেন নাই। তাঁহার রাজদয়িত তাঁহাকে যে অমূল্য, অপার্থিব, অনন্য-দুর্লভ, পরম বাঞ্ছনীয় প্রেমের পুষ্পাসনে রাজরাজেশ্বরীরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি কার্য্যে, প্রতি পাদক্ষেপের মধ্যে সেই প্রেমের প্রতিদান দিয়া আজ তিনি অমর হইয়া উভয়ের এই প্রেমকে অমরত্ব দান করিয়া গিয়াছেন। যৌবনারম্ভের প্রথম দর্শনের মাহেন্দ্র মুহূর্ত্ত হইতে যে প্রেম ইঁহাদিগকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল, কোন প্রতিকূল ঘটনাতেই সে প্রেমের সার্থকতা হইতে ইঁহাদিগকে বঞ্চিত হইতে হয় নাই; কোন অকরুণ আত্মীয় বা আত্মীয়ার অকারণ মনোরঞ্জনার্থ এই প্রেমিক যুগলকে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্যর্থজীবন যাপন করিবার দুঃসহ বেদনায় ইঁহাদিগকে জর্জ্জরিত হইতে হয় নাই। সৌভাগ্য বা সঙ্কটে, কিংবা রণে বনে দুর্গমে যখন যে অবস্থায় পড়িয়াছেন, এই রাজদম্পতীকে একদিনের জন্যও পরস্পরের বাহুবন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে কেহই পারে নাই। যখন

সর্ব্বগ্রাসী কাল আসিয়া সেই অখণ্ড মিলনের মধ্যে বিয়োগের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর রচনা করিয়া দিল, শাজাহানের সে দিনের বেদনা কেবল তিনিই জানিয়াছিলেন এবং তাঁহার সে দিনের সেই উচ্ছ্বসিত শোকের হাহাকার ধ্বনিতে আকাশতল নিত্যকাল ধ্বনিত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত এই মৌন মর্ম্মর-মন্দিরের প্রতি প্রস্তর-সন্নিবেশের মধ্যে যে নিদারুণ দীর্ঘশ্বাস রাখিয়া গিয়াছেন, প্রিয়-বিরহী আসিয়া এইখানে দাঁড়াইলে সে বক্ষোবিদারী দীর্ঘশ্বাস আজও শুনিতে পায়। তাই তাজকে সে আর কেবল প্রাণহীন স্মৃতিসৌধ বলিয়া মনেই করিতে পারে না।

জগদিন্দ্রনাথ রায়।

শুভ উৎসব

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংঘর্ষে আর যাহাই হউক, আমাদের পুরাতন বিচিত্র উৎসবকলা যে ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। দোল দুর্গোৎসবই কি, বার ব্রত অনুষ্ঠানাদিই কি, আর জাতকর্ম্ম অন্নপ্রাশন বিবাহাদি সংস্কারগুলিই বা কি, অল্প দিন-মধ্যে আমাদের সকল ক্রিয়া-কর্ম্মেই যেন কি একটি পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে—প্রাচীনকালে ইহার মধ্যে যে শুভ আনন্দটুকু ছিল তাহা বুঝি আর থাকেনা, ইহার ব্যাপক সার্ব্বজনীন ভাব সঙ্কুচিত হইয়া গিয়া ক্রমশঃ ইহা ব্যক্তিবিশেষের সমারোহময়ী তামসিকতামাত্রে আসিয়া না পরিণত হয়! কারণ, আমাদের দেশে, সমাজবন্ধনগুণেই হউক বা লোকের প্রকৃতিগুণেই হউক, উৎসবমাত্রেই চতুষ্পার্শ্বের সর্ব্বসাধারণের যেন একটি চিরন্তন অধিকার ছিল; আমার গৃহের পূজাপার্ব্বণে, আমার পারিবারিক সকল শুভকর্ম্মে কেবলমাত্র আমি এবং আমার গৃহিণীর নিকটসম্পর্কীয়গণ নহে, কিন্তু নিকটস্থ সমস্ত গ্রামের, চতুষ্পার্শ্বস্থ সমস্ত পল্লীর অন্তরে উৎসব ঘনীভূত হইয়া আসিত, এবং সকলেরই মনে হইত যেন তাহার নিজের বাড়ীর কাজ। এক্ষণে নবাগত সভ্যতা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যরক্ষাচ্ছলে আত্মপরের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃই দুরতিক্রমণীয় করিয়া তুলিতেছে—আমরা সকল অধিকার আইনের পাকা মাপকাঠির সাহায্যে নূতন করিয়া বুঝিতেছি; সুতরাং হৃদয়ের

কাঁচা সরস সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখা অনেক স্থলেই অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিতেছে। ফলে, যে সকল উৎসবকলা হৃদয়ের তাপে এতদিন সজীব ও নবীন ছিল, হৃৎপিণ্ডের রক্তপ্রবাহ হইতে বঞ্চিত হইয়া যেগুলি ক্রমশঃ মৃত্যুর মত হিমপাণ্ডু হইয়া আসিতেছে; এবং এই মৃত্যুহিম বিবর্ণতাটুকু ঢাকিবার জন্যই বাহিরের সাজসজ্জা ও সমারোহ-বাহুল্য অনিবার্য্য হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু মুখরাগলেপনে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের তপ্ত লাবণ্য-সঞ্চার-চেষ্টার মত উৎসব-শ্রীসম্পাদনে এই সমারোহাড়ম্বর সম্পূর্ণ নিষ্ফল। উৎসবের সহস্র চঞ্চল আলোকরশ্মি জনতার চিন্তাক্লিষ্ট ললাটে ও উৎসাহহীন ম্লানমুখে প্রতিফলিত হইয়া আমাদের শীর্ণ মূর্ত্তিখানিই ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ করিয়া দেয়। পূর্ব্বে হৃদয়ে সম্বন্ধাধিকারে যখন আইনের এত চুলচেরা সূক্ষ্ম বিভাগ ছিল না, একের উৎসব তখন দশের হইয়া উঠিত। উদ্যোগপর্ব্বের ভারও তখন পাঁচ-জনের মধ্যে স্বেচ্ছায় বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত এবং উত্তরা-কাণ্ডেও সকলের সমবেত যত্ন চেষ্টা উৎসাহ আনন্দে উৎসবকলা সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ হইয়া উঠিত। নব্যতন্ত্রের নাগরিক অধিকার অনধিকার বিধি তখনও হয় নাই—সুতরাং আমার কাজে খাটিয়া দিতে পাঁচজনের অনধিকার সঙ্কোচও বোধ হইত না এবং নিজের কাজের ভার পাঁচজনের উপর চালাইয়া দিতে এ পক্ষেরও কোনরূপ দ্বিধা মনে আসিত না। কেহ আটচালা নির্ম্মাণ কার্য্য পরিদর্শনে নিযুক্ত হইত, কেহ দীপ জ্বালাইবার ব্যবস্থা করিত, কেহ কদলীপত্র সংগ্রহ করিয়া আনিত, কেহ কটিবন্ধ দৃঢ়রূপে আঁটিয়া পরিবেশনে লাগিয়া যাইত, কেহ বা ক্রমাগত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত, কেহ বসিয়া বসিয়া কেবল পরামর্শ সরবরাহ

করিত, নিতান্ত কোন কাজ না পাইলে ডাকহাঁক ও মোড়লী করিয়া লোকে নিজের একটা কর্ম্ম গড়িয়াও লইত। এইরূপে নিশ্চেষ্ট ঔদাস্তভরে দেখিবার অবসর না পাওয়ায় এবং উৎসব-সৌষ্ঠব-সম্পাদন বিষয়ে কথঞ্চিৎ নিজহস্ত উপলব্ধি করিয়া সকলেই আপনাকে ইহার একটি অবিচ্ছেন্ত অঙ্গরূপে অনুভব করিতে পারিত; এবং ইহা হইতেই একের উৎসব সাধারণের হইয়া সমধিক সরস ও সজীব হইয়া উঠিত, এবং বৃহৎ সমাজের সর্ব্বাঙ্গে একটি অখণ্ড সৌষ্ঠবলাভে সমধিক মনোজ্ঞ সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হইত।

এখনকার উৎসবগুলি কিন্তু ক্রমশঃই যেন আপিসী ছাঁচে গঠিত হইয়া উঠিতেছে—তাহার মধ্যে দেনাপাওনা হিসাবপত্রের হাঙ্গাম যত অধিক, আনন্দ আর সে পরিমাণে নাই। পূর্ব্বে যে দেনাপাওনার সম্বন্ধ আদৌ ছিল না তাহা নহে, এবং হয়ত সূক্ষ্ম-রূপে বিচার করিয়া দেখিলে আর্থিক সম্বন্ধ তখনও এখনকার মত প্রবল ছিল, কিন্তু অন্যপ্রকার সম্বন্ধের আবরণে এই হিসাবী সম্বন্ধটা তখন কোথাও বড় প্রবল হইয়া আত্মপ্রকাশ করিবার অবসর পাইয়া উঠে নাই। ব্রাহ্মণ ফলাহারের পর দক্ষিণা না লইয়া বাড়ী ফিরিতেন না, কিন্তু দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে এমন একটি মধুর সম্বন্ধ ছিল যে, দক্ষিণার আর্থিকতা তাহার মধ্যে স্থান পাইত না। নাপিত ক্ষৌরকার্য্য সারিয়া যে রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিত তাহা নহে, সেকালে বরঞ্চ পাওনাগণ্ডা এখনকার অপেক্ষা অনেক বেশীই ছিল, কিন্তু নাপিতের সহিত সম্বন্ধ এমনি যেন সে বিনা অর্থেও ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদন করিয়া যাইত এবং উক্ত কার্য্য না করিলেও কর্ত্তা তাহাকে অর্থসাহায্য করিতেন। কুম্ভকার

শুভ কার্য্যের দিনে গুটিকতক চিত্রিত নূতন ভাণ্ড আনিয়া না দিলে যেন কর্ম্মই বন্ধ হইয়া থাকে, পয়সা দিয়া বাজার হইতে কিনিয়া আনিলে উৎসবের অঙ্গহানি হয়। সকলেরই সঙ্গে আমাদের এইরূপ একপ্রকার আত্মীয়তাবন্ধন—এবং উৎসবাদিতে এই আত্মীয়তাটুকু যেন সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভের অবসর পায়। সেই জন্যই মন্ত্রপাঠের ব্রাহ্মণ হইতে সুরু করিয়া কামার কুমোর ধোপা নাপিত হাড়ি ডোম পর্য্যন্ত যে যেখানে আছে সকলেরই নিজ নিজ মর্য্যাদানুসারে উৎসবাঙ্গে স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে—কাহাকেও বাদ দিলে চলে না।

কিন্তু এখন ইংরাজী পণ্যশালার অনুগ্রহে যান্ত্রিক ভাবেই অনেক কার্য্য নিঃশব্দে সমাধা হইয়া উঠে। এক কলমের আঁচড়ে হ্যারিসন হ্যাথাবে, হোয়াইট্যাওয়ে লেড্‌ল, অস্‌লর, ল্যাজারাসের ভবন হইতে যাহা কিছু আবশ্যক আনাইয়া লওয়া যায়, এমন কি, নাপিত, পাচক পরিবেশকাদিও সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু আমাদের পণ্যক্রিয়ার মধ্যে সজীব সহৃদয় মনুষ্যত্বের মধুর সংস্পর্শে যে একটি নিগূঢ় আনন্দ ছিল, ইহাতে সেটুকু দিতে পারে না স্বীকার করিতে হয়।—তখনকার দিনে বড়লোকের বাটীতে কোন ক্রিয়াকর্ম্মোপলক্ষে মাসেক কাল পূর্ব্ব হইতে নানাবিধ পণ্যভার লইয়া দোকানী-পসারীরা গতিবিধি সুরু করিত। শালওয়ালা ভাল ভাল কাশ্মীরী শাল ও রুমাল লইয়া আসিত, মুর্শিদাবাদ ও ঘাটাল অঞ্চলের বণিকেরা নানাবিধ গরদ তসর ও রেশমী বস্ত্র আমদানি করিত, ঢাকা শান্তিপুর ফরাসডাঙ্গা সিমলার বেপারীরা কত প্রকারের সূক্ষ্ম ও বিচিত্রপাড় কার্পাসবস্ত্র এবং পশ্চিমী ক্ষেত্রীরা বেণারসী ও

চেলির জোড় লইয়া উপস্থিত হইত। এতদ্ভিন্ন, স্বর্ণকার কর্ম্মকার মালাকার ময়রা গোয়ালা পাথরওয়ালা কাংস্য-পিত্তল-বিক্রেতা নানান্ জনে নানাবিধ ফরমাসে নিত্য গতায়াত করিত। এমন কি, বেদানার বস্তা লইয়া বিদেশী কাবুলীওয়ালা পর্য্যন্ত বাদ যাইত না। কিন্তু এ গতিবিধি নিতান্তই বাহিরের লোকের মত ছিল না; এবং এই খরিদ-বিক্রয়টুকুর মধ্যেই তাহাদের সমস্ত সম্বন্ধ শেষ হইয়া যাইত না। সকলেই উৎসাহসহকারে উৎসবের নানাবিধ অনুষ্ঠান-বিষয়ে পাঁচটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিত, মন্তব্য দিত, প্রশ্ন করিত, কোথায় কি হইবে না হইবে দেখিয়া শুনিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, কাজের দিনে বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেপুলেগুলিকে লইয়া উৎসব দেখিতে আসিত, এবং পুরাতন কাবুলীওয়ালা তাহার সখের জরীর কোর্ত্তা গায়ে দিয়া প্রসন্নমুখে দ্বারদেশে আসিয়া প্রহরী হইয়া দাঁড়াইত। নিতান্ত জড় বিনিময় মাত্র না হইয়া আমরা তাহাদের পণ্যসামগ্রীর সহিত অন্তরের শুভ প্রীতিও অনেকখানি করিয়া লাভ করিতাম, এবং মুদ্রাখণ্ডের সহিত উৎসবের ভাগও কতক পরিমাণে দিতাম। এই যে অন্তরে অন্তরে "ফাউ" আদান-প্রদানটুকু ইহাতেই বিশেষ আনন্দ; এবং এইটুকুর জন্তই আমাদের মধ্যে আর্থিক সম্বন্ধে হীনতা সহজে দেখা যায় না।

কেবলি যে বাহিরে বাহিরে এইরূপ গতিবিধি ও আদান-প্রদান ছিল তাহাও নহে। অন্তঃপুরে কুম্ভকারপত্নী নূতন বরণডালা সাজাইয়া আনিয়া দিত, মালিনী নিত্য নবনব ফুলভার যোগাইত এবং ফুলসজ্জার জন্য নূতন নূতন ফুলের গহনা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিত, নাপিতানী দিদিঠাকুরাণী ও বধূঠাকুরাণীদিগের কোমল পদপল্লবে ঝামা ঘষিয়া আল্‌তা পরাইয়া দিয়া যাইত, তাঁতিনী

নূতন নূতন পাড়ের মনোহারিণী নীলাম্বরী ও বিচিত্র বর্ণের শাটিকা লইয়া আসিত। গোয়ালিনী মধ্যাহ্নভোজনান্তে, আর কিছু না হউক, গোয়ালাপাড়ার দুইটা মন্তব্য শুনাইয়া যাইত, এবং পাড়ার বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ-ঠাকুরাণী স্বহস্তকর্ত্তিত কয়গাছি পৈতার সূতা আনিয়া দিয়া পা ছড়াইয়া গল্প করিতে বসিতেন। এই এতগুলি বর্ষীয়সী ও যুবতী-সমাগম যে নিতান্ত যান্ত্রিকভাবে সাধিত হইত না, সে কথা বলাই বাহুল্য। হাস্যপরিহাস গল্পগুজন সমালোচনা বিধিব্যবস্থা-নির্দ্ধারণ ও নানা অনাবশ্যক উপদেশ পরামর্শ ও বিচার-প্রসঙ্গে বয়স ও অবস্থার তারতম্য ঘুচিয়া গিয়া সকলের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও সরস হইয়া উঠিত—দেনা-পাওনার সম্বন্ধটুকু আদৌ প্রকাশ পাইত না। সকলেই যেন আত্মীয়-পরিজনবর্গের মধ্যে —যেন একটি বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারের নানা অঙ্গ।

এইরূপে আমাদের প্রত্যেকের কোন শুভানুষ্ঠানের মধ্যে অলক্ষিতে এই এতগুলি লোকের শুভ কামনা কার্য্য করে; এবং ইহাতেই আমাদের সামান্য ক্রিয়াকর্ম্মও বৃহৎ উৎসবে পরিণত হয়। নব্যতন্ত্র রজতচক্রকে যেরূপ সকল সম্বন্ধের মধ্য-বিন্দু করিয়া তুলিতে চাহে, তখন তাহা ছিল না। ধনের পদমর্য্যাদা যথেষ্ট থাকিলেও কুলের গৌরবকে প্রীতির সম্বন্ধকে সে লঙ্ঘন করিতে পারিত না। এমন কি, বেতনভুক্ সামান্য দাসদাসীদিগকেও সংসারের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে দেখা হইত, এবং সুগৃহিণী ইহাদের কেহ ক্ষুধিত থাকিতে নিজের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেন। এই যে হৃদ্যতাটুকু— এই যে ব্যথার ব্যথী ভাব—ইহা আর কিছুতেই থাকে না। পরিজনবর্গের সহিত পূর্ব্বের মত এক-সংসারভুক্ত অবশ্য পোষ্য-সম্বন্ধ

ঘুচিয়া গিয়া বিদেশী ইংরাজের দৃষ্টান্তে কেবলমাত্র কাজ আদায় ও বেতনদানের সম্বন্ধই দিনে দিনে বদ্ধমূল হইয়া উঠিতেছে। এমন কি, পাকা নব্যতন্ত্রিগণের নিকট সেকালের মাঠাকুরাণী দিদিঠাকুরাণী প্রভৃতি সম্বন্ধসূচক সম্বোধনগুলি পর্য্যন্ত বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে।

এই সকল সামান্য পরিবর্ত্তন হয়ত আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অতি তুচ্ছ ঘটনা, এবং উৎসবপ্রসঙ্গে এসকল তুচ্ছ বিষয়ের উত্থাপন না করিলেও চলিত, কিন্তু ইহাতে এইটুকু অন্ততঃ বুঝা যায় যে, পূর্ব্বে যেখানে প্রীতিসূচক আত্মীয়তাই স্বাভাবিক ছিল, এক্ষণে সেখানে নিকট-সম্বন্ধস্থাপনই অনেক সময় অত্যন্ত অশোভন ও অসঙ্গত বলিয়া ঠেকে। আশ্রিতজন এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় হৃদয়ের আশ্রয় আর বড় পায় না, এবং আশ্রয়দাতাও তাহাদের হৃদয়ের অধীশ্বরত্ব হইতে বঞ্চিত হয়েন। অন্তরে অন্তরে কাহারও সহিত কাহারও কোনরূপ অনিবার্য্য যোগ নাই।

আমাদের উৎসবে এই অন্তরেরই প্রথম প্রতিষ্ঠা। সমারোহ-সহকারে আমোদ-প্রমোদ করায় আমাদের উৎসবকলা কিছুমাত্র চরিতার্থ হয় না, কিন্তু তাহার মধ্যে সর্ব্বজনের আন্তরিক প্রসন্নতা ও শুভ ইচ্ছাটুকু না থাকিলে নয়। উৎসবপ্রাঙ্গণ হইতে সামান্য ভিক্ষুকও যদি ম্লানমুখে ফিরিয়া যায়, শুভ উৎসব যেন একান্ত ক্ষুণ্ণ হয়। যাত্রা হউক, কথা হউক, রামায়ণগান হউক বা চণ্ডীপাঠ হউক, যখন যাহা হয় উন্মুক্ত গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া সর্ব্বসাধারণে তাহাতে অকাতরে যোগদান করে, এবং সকলের সহিত একত্র হইয়া গৃহকর্ত্তা তাহা উপভোগ করেন।

কেবলি যে বড় বড় পূজাপার্ব্বণে এই বিধি তাহা নহে, ছোটখাট বার ব্রত, যে কোন অনুষ্ঠানেই এই শুভ ভাবটি রক্ষণীয়;

এবং অনুষ্ঠানের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। আজ পূজা, কাল ব্রত, পরশ্বঃ গঙ্গাস্নানের যোগ, অন্যদিন কোন শুভতিথি বা বার-মাহাত্ম্য, কখনও নবান্ন, কখনও পৌষপার্ব্বণ, কোনদিন বা অরন্ধন, জ্যৈষ্ঠে জামাতৃ-পূজন, কার্ত্তিকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, মধ্যে রাখিবন্ধন, কোন মাসে পুত্রের বিবাহ, কোনদিন পৌত্রের জাতকর্ম্ম, তাহার পর জন্মতিথি, হাতেখড়ি, সাধ, সীমন্তোন্নয়ন, পঞ্চামৃত—যেন একটির পর একটি শুভ অনুষ্ঠান ও আনন্দ-প্রবাহের অন্ত নাই, প্রচলিত প্রবচনে বারো মাসে তের পার্ব্বণ মাত্র স্থান পাইয়াছে, কিন্তু গণনায় বোধ করি প্রতিমাসে ত্রয়োদশ সংখ্যা দাঁড়াইয়া যায় ; এবং ধর্ম্ম-কার্য্যের সহিত জড়িত হইয়া সকলগুলিই আমাদের শুভকর্ম্ম। দান, ধ্যান, সদনুষ্ঠান ও দশজনের সহিত আত্মীয়তা-প্রকাশ ও সকলের আনন্দবর্দ্ধন করাই উদ্দেশ্য, একটা উপলক্ষ পাইলেই হয়।

এবং যাহাতে আমার নিজের কিছুমাত্র আনন্দ আছে, সেই আনন্দটুকু যখন দশজনের মধ্যে বিতরণ করিতে চাহি তখন উপলক্ষের অভাব ঘটিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। আমার আনন্দে সকলের আনন্দ হউক, আমার শুভে সকলের শুভ হউক, আমি যাহা পাই তাহা পাঁচজনের সহিত মিলিত হইয়া উপভোগ করি—এই কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ। অনেক ছোটখাট বিষয়েও আমি হয়ত এতটুকু আনন্দ পাই, নিজের বাড়ীখানি হইলে সুখী হই, পুষ্করিণীটি থাকিলে লাগে ভাল, গোরুগুলির কল্যাণকামনা করি—গৃহপ্রবেশ, জলাশয়-প্রতিষ্ঠা, গোষ্ঠাষ্টমী এইরূপ এক একটি উৎসব উপলক্ষে পাঁচজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত, আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী, পোষ্যপরিজন, দীন-দুঃখীকে আহ্বান করিয়া যথাসাধ্য সৎকারে আমার সুখের ভাগী

করিতে চাহি। আমি যে আজ একজন গৃহহীনকে আশ্রয় দিতে পারি, তৃষ্ণার্ত্তের পিপাসা নিবারণ করিতে পারি, অবোলা জীবের কিছুমাত্র সুখবিধান করিতে সমর্থ হই, আমার এ সৌভাগ্য অন্তর যেন সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিতে চাহে। সাবিত্রীব্রত, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, জামাতৃষষ্ঠী উপলক্ষে আপন প্রিয়জন ও স্নেহাস্পদগণকে যথাযোগ্য সৎকার করিয়া নিজেকে ধন্য মনে হয়, বিধাতা আমাকে যে এত সৌভাগ্যসুখ দিয়াছেন, ইহা সকলের সহিত বণ্টন করিয়া না লইলে ইহার সফলতা কোথায়? উৎসব ইহারই উপলক্ষ। সেইজন্য আমাদের উৎসবে ভাবেরই প্রাধান্য—বাহিরের সমারোহ তাহার প্রধান অঙ্গ নহে। পতিব্রতা স্ত্রীর হাতের সামান্য লোহা ও মাথার সিন্দূর যেমন আমাদের মনে একটি অনির্ব্বচনীয় লক্ষ্মীশ্রী সূচিত করিয়া দেয়, নেত্রঝলসী অলঙ্কাররাজি তাহা পারে না, প্রীতি-বিকশিত উৎসবের সামান্য মঙ্গলঘট ও চূত-পল্লবগুচ্ছ সেইরূপ আমাদের অন্তরে একটি শিব-সুন্দর ভাব সঞ্চারিত করিয়া তুলে, সহস্র তাড়িতালোক ও বিলাস-উৎসে সে শুভ কমনীয়তা সঞ্চার করিতে পারে না। বিলাসের মণিমুক্তা আমাদের বাহিরের ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক মাত্র, কিন্তু উৎসবের ধান্যদূর্ব্বামুষ্টি অন্তরের অকৃত্রিম শুভ কামনার বাহ্য চিহ্ন। ইহার সহিত ধনীর রত্নভাণ্ডারেরও তুলনা সম্ভব নহে। ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতের মত ইহার মধ্যে যেন কেমন একটি অক্ষুণ্ণ শুচিতা আছে—বাহ্যাড়ম্বর-বাহুল্যের সহিত তাহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বদেশী সমাজ

"সুজলা সুফলা" বঙ্গভূমি তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে চাতকপক্ষীর মত উর্দ্ধের দিকে তাকাইয়া আছে—কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা জলবর্ষণের ব্যবস্থা না করিলে তাহার আর গতি নাই।

গুরুগুরু মেঘগর্জ্জন সুরু হইয়াছে—গবর্মেণ্ট সাড়া দিয়াছেন—তৃষ্ণানিবারণের যা-হয়-একটা উপায় হয় ত হইবে—অতএব আপাতত আমরা সেজন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিতে বসি নাই।

আমাদের চিন্তার বিষয় এই যে, পূর্ব্বে আমাদের যে একটি ব্যবস্থা ছিল,—যাহাতে সমাজ অত্যন্ত সহজ নিয়মে আপনার সমস্ত অভাব আপনিই মিটাইয়া লইত—দেশে তাহার কি লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না?

আমাদের যে সকল অভাব বিদেশীরা গড়িয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে, সেইগুলাই না হয় বিদেশী পূরণ করুক। অন্নক্লিষ্ট ভারতবর্ষের চায়ের তৃষ্ণা জন্মাইয়া দিবার জন্য কর্জ্জন্‌সাহেব উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন, আচ্ছা, না হয় আণ্ড্রুয়ুল্‌-সম্প্রদায় আমাদের চায়ের বাটি ভর্ত্তি করিতে থাকুন্; এবং এই চায়ের চেয়েও যে জ্বালাময় তরলরসের তৃষ্ণা—যাহা প্রলয়কালের সূর্য্যাস্তচ্ছটার ন্যায় বিচিত্র উজ্জ্বল দীপ্তিতে উত্তরোত্তর আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিতেছে—তাহা পশ্চিমের সামগ্রী এবং পশ্চিম-দিগ্দেবী তাহার পরিবেষণের ভার লইলে অসঙ্গত হয় না—কিন্তু জলের তৃষ্ণা ত স্বদেশের খাঁটি সনাতন জিনিষ!—ব্রিটিশ

গবর্মেণ্ট আসিবার পূর্ব্বে আমাদের জলপিপাসা ছিল এবং এতকাল তাহার নিবৃত্তির উপায় বেশ ভালরূপেই হইয়া আসিয়াছে—এজন্য শাসনকর্ত্তাদের রাজদণ্ডকে কোনোদিন ত চঞ্চল হইয়া উঠিতে হয় নাই।

আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্য্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মত বহিয়া গেল, তবু আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পশুর মত করিতে পারে নাই, সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই। রাজায় রাজায় লড়াইয়ের অন্ত নাই—কিন্তু আমাদের মর্ম্মরায়মাণ বেণুকুঞ্জে, আমাদের আমকাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণী-খনন চলিতেছে, গুরুমশায় শুভঙ্করী কসাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র-অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণপাঠ হইতেছে এবং কীর্ত্তনের আরাবে পল্লীর প্রাঙ্গণ মুখরিত। সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।

দেশে এই যে সমস্ত লোকহিতকর মঙ্গলকর্ম্ম ও আনন্দ-উৎসব এতকাল অব্যাহতভাবে সমস্ত ধনিদরিদ্রকে ধন্য করিয়া আসিয়াছে, এজন্য কি চাঁদার খাতা কুক্ষিগত করিয়া উৎসাহী লোকদিগকে দ্বারে দ্বারে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে হইতেছে, না, রাজপুরুষদিগকে সুদীর্ঘ মন্তব্যসহ পরোয়ানা বাহির করিতে হইয়াছে! নিশ্বাস লইতে যেমন আমাদের কাহাকেও হাতে-পা'য়ে ধরিতে

হয় না, রক্ত-চলাচলের জন্য যেমন টৌন্‌হল্‌মীটিং অনাবশ্যক—সমাজের সমস্ত অত্যাবশ্যক হিতকর ব্যাপার সমাজে তেম্‌নি অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে ঘটিয়া আসিয়াছে।

আজ আমাদের দেশে জল নাই বলিয়া যে আমরা আক্ষেপ করিতেছি, সেটা সামান্য কথা। সকলের চেয়ে গুরুতর শোকের বিষয় হইয়াছে—তাহার মূল কারণটা। আজ সমাজের মনটা সমাজের মধ্যে নাই। আমাদের সমস্ত মনোযোগ বাহিরের দিকে গিয়াছে।

কোনো নদী যে গ্রামের পার্শ্ব দিয়া বরাবর বহিয়া আসিয়াছে, সে যদি একদিন সে গ্রামকে ছাড়িয়া অন্যত্র তাহার স্রোতের পথ লইয়া যায়, তবে সে গ্রামের জল নষ্ট হয়, ফল নষ্ট হয়, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, বাণিজ্য নষ্ট হয়, তাহার বাগান জঙ্গল হইয়া পড়ে, তাহার পূর্ব্বসমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষ আপন দীর্ণভিত্তির ফাটলে ফাটলে বট-অশ্বত্থকে প্রশ্রয় দিয়া পেচকবাদুড়ের বিহারস্থল হইয়া উঠে।

মানুষের চিত্তস্রোত নদীর চেয়ে সামান্য জিনিষ নহে। সেই চিত্তপ্রবাহ চিরকাল বাংলার ছায়াশীতল গ্রামগুলিকে অনাময় ও আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছিল—এখন বাংলার সেই পল্লীক্রোড় হইতে বাঙালির চিত্তধারা বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাই তাহার দেবালয় জীর্ণপ্রায়—সংস্কার করিয়া দিবার কেহ নাই, তাহার জলাশয়গুলি দূষিত—পঙ্কোদ্ধার করিবার কেহ নাই, সমৃদ্ধঘরের অট্টালিকাগুলি পরিত্যক্ত—সেখানে উৎসবের আনন্দধ্বনি উঠে না। কাজেই এখন জলদানের কর্ত্তা সরকারবাহাদুর, স্বাস্থ্যদানের কর্ত্তা সরকারবাহাদুর, বিদ্যাদানের ব্যবস্থার জন্যও সরকার-

বাহাদুরের দ্বারে গলবস্ত্র হইয়া ফিরিতে হয়। যে গাছ আপনার ফুল আপনি ফুটাইত, সে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টির জন্য তাহার সমস্ত শীর্ণ শাখাপ্রশাখা উপরে তুলিয়া দরখাস্ত জারি করিতেছে। না হয়, তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর হইল, কিন্তু এই সমস্ত আকাশ-কুসুম লইয়া তাহার সার্থকতা কি?

ইংরাজিতে যাহাকে ষ্টেট্ বলে, আমাদের দেশে আধুনিক ভাষায় তাহাকে বলে সরকার। এই সরকার প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজশক্তি-আকারে ছিল। কিন্তু বিলাতের ষ্টেটের সঙ্গে আমাদের রাজশক্তির প্রভেদ আছে। বিলাত, দেশের সমস্ত কল্যাণকর্ম্মের ভার ষ্টেটের হাতে সমর্পণ করিয়াছে—ভারতবর্ষ তাহা আংশিক-ভাবে মাত্র করিয়াছিল।

দেশের যাঁহারা গুরুস্থানীয় ছিলেন, যাঁহারা সমস্ত দেশকে বিনা বেতনে বিদ্যাশিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পালন করা, পুরস্কৃত করা যে রাজার কর্ত্তব্য ছিল না, তাহা নহে—কিন্তু কেবল আংশিকভাবে বস্তুত সাধারণত সে কর্ত্তব্য প্রত্যেক গৃহীর। রাজা যদি সাহায্য বন্ধ করেন, হঠাৎ যদি দেশ অরাজক হইয়া আসে, তথাপি সমাজের বিদ্যাশিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা একান্ত ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয় না। রাজা যে প্রজাদের জন্য দীর্ঘিকা খনন করিয়া দিতেন না, তাহা নহে—কিন্তু সমাজের সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই যেমন দিত, তিনিও তেমনি দিতেন। রাজা অমনোযোগী হইলেই দেশের জলপাত্র রিক্ত হইয়া যাইত না।

বিলাতে প্রত্যেকে আপন আরাম-আমোদ ও স্বার্থসাধনে স্বাধীন—তাহারা কর্ত্তব্যভারে আক্রান্ত নহে—তাহাদের সমস্ত

বড় বড় কর্ত্তব্যভার রাজশক্তির উপর স্থাপিত। আমাদের দেশে রাজশক্তি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন—প্রজাসাধারণ সামাজিক কর্ত্তব্যদ্বারা আবদ্ধ। রাজা যুদ্ধ করিতে যান, শিকার করিতে যান, রাজকার্য্য করুন বা আমোদ করিয়া দিন কাটান, সেজন্য ধর্ম্মের বিচারে তিনি দায়ী হইবেন,—কিন্তু জনসাধারণ নিজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার উপরে নিতান্ত নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে না—সমাজের কাজ সমাজের প্রত্যেকের উপরেই আশ্চর্য্যরূপে, বিচিত্ররূপে ভাগ করা রহিয়াছে।

এইরূপ থাকাতে আমরা ধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝি, তাহা সমাজের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়া আছে। আমাদের প্রত্যেককেই স্বার্থ-সংযম ও আত্মত্যাগ চর্চ্চা করিতে হইয়াছে। আমরা প্রত্যেকেই ধর্ম্মপালন করিতে বাধ্য।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রাণশক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণের কল্যাণভার যেখানেই পুঞ্জিত হয়, সেইখানেই দেশের মর্ম্মস্থান। সেইখানে আঘাত করিলেই সমস্ত দেশ সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্য্যস্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়—এইজন্যই য়ুরোপে পলিটিক্স্ এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সঙ্কটাবস্থা উপস্থিত হয়। এইজন্য আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করি নাই, কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্ব্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি। নিঃস্বকে ভিক্ষাদান হইতে সাধারণকে ধর্ম্মশিক্ষাদান, এ সমস্ত বিষয়েই বিলাতে ষ্টেটের উপর নির্ভর—আমাদের দেশে ইহা জনসাধারণের ধর্ম্মব্যবস্থার

উপরে প্রতিষ্ঠিত—এইজন্য ইংরাজ ষ্টেট্‌কে বাঁচাইলেই বাঁচে, আমরা ধর্ম্মব্যবস্থাকে বাঁচাইলেই বাঁচিয়া যাই।

ইংলণ্ডে স্বভাবতই ষ্টেট্‌কে জাগ্রত রাখিতে, সচেষ্ট রাখিতে জনসাধারণ সর্ব্বদাই নিযুক্ত। সম্প্রতি আমরা ইংরাজের পাঠ-শালায় পড়িয়া স্থির করিয়াছি, অবস্থানির্ব্বিচারে গবর্মেণ্টকে খোঁচা মারিয়া মনোযোগী করাই জনসাধারণের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। ইহা বুঝিলাম না যে, পরের শরীরে নিয়তই বেলেস্ত্রা লাগাইতে থাকিলে নিজের ব্যাধির চিকিৎসা করা হয় না।

আমরা তর্ক করিতে ভালবাসি, অতএব এ তর্ক এখানে ওঠা অসম্ভব নহে যে, সাধারণের কর্ম্মভার সাধারণের সর্ব্বাঙ্গেই সঞ্চারিত হইয়া থাকা ভাল, না তাহা বিশেষভাবে সরকারনামক একটা জায়গায় নির্দ্দিষ্ট হওয়া ভাল। আমার বক্তব্য এই যে, এ তর্ক বিদ্যালয়ের ডিবেটিংক্লাবে করা যাইতে পারে, কিন্তু আপাতত এ তর্ক আমাদের কোনো কাজে লাগিবে না।

কারণ এ কথা আমাদিগকে বুঝিতেই হইবে—বিলাতরাজ্যের ষ্টেট্ সমস্ত সমাজের সম্মতির উপরে অবিচ্ছিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত—তাহা সেখানকার স্বাভাবিক নিয়মেই অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। শুদ্ধমাত্র তর্কের দ্বারা আমরা তাহা লাভ করিতে পারিব না—অত্যন্ত ভাল হইলেও তাহা আমাদের অনধিগম্য।

আমাদের দেশে সরকারবাহাদুর সমাজের কেহই নন্, সরকার সমাজের বাহিরে। অতএব যে কোনো বিষয় তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহা স্বাধীনতার মূল্য দিয়া লাভ করিতে হইবে। যে কর্ম্ম সমাজ সরকারের দ্বারা করাইয়া লইবে, সেই কর্ম্মসম্বন্ধে সমাজ নিজেকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিবে। অথচ এই অকর্ম্মণ্যতা

আমাদের দেশের স্বভাবসিদ্ধ ছিল না। আমরা নানা জাতির, নানা রাজার অধীনতাপাশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সমাজ চিরদিন আপনার সমস্ত কাজ আপনি নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছে, ক্ষুদ্রবৃহৎ কোনো বিষয়েই বাহিরের অন্য কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দেয় নাই। সেইজন্য রাজশ্রী যখন দেশ হইতে নির্ব্বাসিত, সমাজলক্ষ্মী তখনো বিদায়গ্রহণ করেন নাই, সেইজন্যই আজও আমাদের মাথা একেবারে মাটিতে গিয়া ঠেকিতে পায় নাই।

আজ আমরা সমাজের সমস্ত কর্ত্তব্য নিজের চেষ্টায় একে একে সমাজবহির্ভূক্ত ষ্টেটের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। এমন কি, আমাদের সামাজিক প্রথাকেও ইংরাজের আইনের দ্বারাই আমরা অপরিবর্ত্তনীয়রূপে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিতে দিয়াছি—কোনো আপত্তি করি নাই। এ পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজের ভিতরে থাকিয়া নব নব সম্প্রদায় আপনাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আচারবিচারের প্রবর্ত্তন করিয়াছে, হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে তিরস্কৃত করে নাই। আজ হইতে সমস্তই ইংরাজের আইনে বাঁধিয়া গেছে,—পরিবর্ত্তনমাত্রই আজ নিজেকে অহিন্দু বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যেখানে আমাদের মর্ম্মস্থান—যে মর্ম্মস্থানকে আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে সযত্নে রক্ষা করিয়া এতদিন বাঁচিয়া আসিয়াছি, সেই আমাদের অন্তরতম মর্ম্মস্থান আজ অনাবৃত-অবারিত হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে আজ বিকলতা আক্রমণ করিয়াছে। ইহাই বিপদ্, জলকষ্ট বিপদ্ নহে।

পূর্ব্বে যাঁহারা বাদ্শাহের দরবারে রায়রায়াঁ হইয়াছেন, নবাবেরা যাঁহাদের মন্ত্রণা ও সহায়তার জন্য অপেক্ষা করিতেন,

তাঁহারা এই রাজপ্রসাদকে যথেষ্ট জ্ঞান করিতেন না—সমাজের প্রসাদ রাজপ্রসাদের চেয়ে তাঁহাদের কাছে উচ্চে ছিল। তাঁহারা প্রতিপত্তি-লাভের জন্য নিজের সমাজের দিকে তাকাইতেন। রাজরাজেশ্বরের রাজধানী দিল্লি তাঁহাদিগকে যে সম্মান দিতে পারে নাই, সেই চরম সম্মানের জন্য তাঁহাদিগকে অখ্যাত জন্ম-পল্লীর কুটীরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতে হইত। দেশের সামান্য লোকেও বলিবে মহদাশয় ব্যক্তি, ইহা সরকারদত্ত রাজা মহারাজা উপাধির চেয়ে তাঁহাদের কাছে বড় ছিল। জন্মভূমির সম্মান ইঁহারা অন্তরের সহিত বুঝিয়াছিলেন—রাজধানীর মাহাত্ম্য, রাজসভার গৌরব ইঁহাদের চিত্তকে নিজের পল্লী হইতে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে নাই। এইজন্য দেশের গণ্ডগ্রামেও কোনোদিন জলের কষ্ট হয় নাই, এবং মনুষ্যত্বচর্চ্চার সমস্ত ব্যবস্থা পল্লীতে পল্লীতে সর্ব্বত্রই রক্ষিত হইত।

দেশের লোক ধন্য বলিবে, ইহাতে আজ আমাদের সুখ নাই, কাজেই দেশের দিকে আমাদের চেষ্টার স্বাভাবিক গতি নহে। সুস্থ অবস্থায় শারীরিক ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক অব্যবহিত উত্তেজনা শরীরের মধ্যেই থাকে—যখন মৃগনাভি, অ্যামোনিয়া, সাপের বিষ দিয়া শরীরকে সক্রিয় করিতে হয়, তখন অবস্থাটা নিতান্ত সংশয়াপন্ন। আজকাল আমাদের সমাজ-শরীরের আভ্যন্তরিক উত্তেজনা ইহাকে কোনো কাজেই প্রবৃত্ত করিতে পারিতেছে না—বৈদ্যমহাশয়ের বড়ি না হইলে একেবারে অচল। এখন সরকারের নিকট হইতে হয় ভিক্ষা, নয় তাগিদ দরকার হইয়া পড়িয়াছে। এখন দেশের জলকষ্টনিবারণের জন্য গবর্মেণ্ট দেশের লোককে তাগিদ দিতেছেন—স্বাভাবিক তাগিদগুলা সব

বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দেশের লোকের নিকটে খ্যাতি, তাহাও রোচে না। আমাদের হৃদয় যে গোরার কাছে দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছে, আমাদের রুচি যে সাহেবের দোকানে বিকাইয়া গেল!

কে বলে, জলকষ্টনিবারণের সামর্থ্য আমাদের নাই? একদা দেশের যে অর্থ দেশের কল্যাণকর্ম্ম সাধন করিয়া চরম সার্থকতা লাভ করিত, আজ সেই অর্থ অজস্রধারায় মিল্‌টনের আড্‌গড়া, ডাইকের গাড়িখানা, ল্যাজারসের আস্‌বাব্‌শালা, হার্ম্মান্‌কোম্পানির দর্জ্জির দোকানকে অভিষিক্ত করিয়া দিতেছে। স্বদেশের শুষ্ক তালুতে জলবিন্দু দিবার বেলায় টানাটানি না পড়িবে কেন?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাজা রামমোহন রায়

ধন্য রামমোহন রায়! যে সময়ে ভারতবর্ষ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল বলিলে হয়, সেই সময়ে তোমার সতেজ বুদ্ধিজ্যোতিঃ যে ঘোরতর অজ্ঞানরূপ নিবিড় জলদ-রাশি বিদীর্ণ করিয়া এতদূর বিকীর্ণ হইয়াছিল এবং তৎসহকারে তোমার সুবিমল স্বচ্ছ চিত্ত যে নিজ দেশে ও নিজ সময়ে প্রচলিত সকল প্রকার কুসংস্কার নির্ব্বাচন করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল, ইহা সামান্য আশ্চর্য্য ও সামান্য সাধুবাদের বিষয় নয়। তখন তোমার জ্ঞান ও ধর্ম্মোৎসাহে উৎসাহিত হৃদয় জঙ্গলময় পঙ্কিলভূমি-পরিবেষ্টিত একটী অগ্নিময় আগ্নেয়গিরি ছিল; তাহা হইতে পুণ্য পবিত্র প্রচুর জ্ঞানাগ্নি সতেজে উৎক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকিত। তুমি বিজ্ঞানের অনুকূল-পক্ষে যে সুগভীর রণবাদ্য বাদন করিয়া গিয়াছ, তাহাতে যেন এখনও আমাদের কর্ণকুহর ধ্বনিত করিতেছে। সেই অত্যুন্নত গম্ভীর তূর্য্যধ্বনি অদ্যাপি বার বার প্রতিধ্বনিত হইয়া এই অযোগ্য দেশেও জয়-সাধন করিয়া আসিতেছে। তুমি স্বদেশ ও বিদেশ-ব্যাপী ভ্রম ও কুসংস্কার সংহার-উদ্দেশ্যে আততায়ি-স্বরূপে রণ-দুর্ম্মদ বীর পুরুষের বিক্রম প্রকাশ করিয়াছ, এবং বিচার-যুদ্ধে সকল বিপক্ষ পরাস্ত করিয়া নিঃসংশয়ে সম্যক্‌রূপে জয়ী হইয়াছ। তোমার উপাধি রাজা। জড়ময় ভূমিখণ্ড তোমার রাজ্য নয়। তুমি একটী সুবিস্তর মনোরাজ্য অধিকার করিয়া রাখিয়াছ। তোমার সমকালীন ও বিশেষতঃ উত্তরকালীন

সুমার্জ্জিত-বুদ্ধি শিক্ষিত সম্প্রদায়ে তোমাকে রাজ-মুকুট প্রদান করিয়া তোমার জয়ধ্বনি করিয়া আসিতেছে। যাঁহারা আবহমান কাল হিন্দুজাতির মনোরাজ্যে নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকে * পরাজয় করিয়াছ। অতএব তুমি রাজার রাজা। তোমার জয়-পতাকা তাঁহাদেরই স্বাধিকার মধ্যে সেই যে উত্তোলিত হইয়াছে, আর পতিত হইল না, হইবেও না, নিয়তই একভাবেই উড্ডীয়মান রহিয়াছে। পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষীয়েরা তোমাকে পরম শত্রু বলিয়া জানিতেন, তদীয় সন্তানেরা অনেকেই এখন তোমাকে পরম বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কেবল ভারতবর্ষীয়দের বন্ধু কেন, তুমি জগতের বন্ধু। †

এক দিকে জ্ঞান- ও ধর্ম্ম-ভূষণে ভূষিত করিয়া জন্মভূমিকে উজ্জ্বল করিবার যত্ন করিয়াছ, অপর দিকে সঙ্কটময় সুগভীর সমুদ্রসমূহ উত্তরণপূর্ব্বক বৃটিশ রাজ্যের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া নানা বিষয়ে রাজশাসনপ্রণালীর সংশোধন ও শুভ-সাধনার্থ প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছ। ‡ সে সময়ের পক্ষে এ কি কাণ্ড! কি ব্যাপার!

* প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম-ব্যবস্থাপকদিগকে।

† "The promotion of human welfare and specially the improvement of his own countrymen, was the habit of his life."—Rev. Carpenter.

"An ardent well-wisher to the cause of freedom and improvement everywhere."—Miss Lucy Aikin's letter to Dr. Channing.

‡ স্বদেশের কল্যাণসাধন ও বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় রাজ্য-শাসন-প্রণালীর সংশোধনই রামমোহন রায়ের ইংলণ্ড গমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম-পক্ষপাতী ব্যক্তিরা সহমরণ-নিবারণ-বিষয়ক রাজনিয়মের প্রতিকূল-পক্ষে ইংলণ্ডে আবেদনপত্র প্রেরণ করেন, সেই বিষয়ের সুবিচার-সম্পাদন-উদ্দেশ্যে,

স্বাভাবিক শক্তির এতই মহিমা! তুমি ইংলণ্ডে গিয়া অধিষ্ঠান করিলে, তথাকার সুপণ্ডিত সাধু লোকে তোমার অসাধারণ গুণগ্রাম দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া যায়। তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, একবার তথাকার কোন সজ্জন-সমাজে চমৎকার-সম্বলিত এইরূপ একটী অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়,

ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চার্‌টার্‌ পরিবর্ত্তন-সময়ে তৎসংক্রান্ত বিচারে লিপ্ত হইয়া যদি ভারতবর্ষীয়দের হিতসাধন করিতে সমর্থ হন—এই অভিপ্রায়ে, এবং বিশেষতঃ ইয়ুরোপীয় বিভিন্ন জাতির আচার ব্যবহার ধর্ম্মাদি বিষয়ের অনুসন্ধানার্থ তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন। দিল্লীর বাদসাহ একটী মোকদ্দমার ভারার্পণ করিয়া তাঁহাকে তথায় পাঠাইয়া দেন; ইহাতেই তাঁহার মনোরথ পূরণের সুবিধা ও সদুপায় ঘটিয়া উঠে। তিনি যত দিন তথায় অবস্থিতি করেন তত দিনই ঐ সকল মহৎ ব্যাপার সাধনার্থই ব্যস্ত ও চিন্তিত ছিলেন। তিনি রাজস্ব ও বিচার-প্রণালী-সংক্রান্ত অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া বোর্ড অব্‌ কণ্ট্রোল নামক রাজকীয় কার্য্যালয়ে অর্পণ করেন এবং সেই কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষেরা হৌস অব্‌ কমন্স নামক সভায় সেই সমস্ত পাঠাইয়া দেন। তদ্ভিন্ন তিনি রাজপুরুষদের অনুরোধক্রমে পার্লিএমেণ্ট ভবনে নিজে বারংবার উপস্থিত হইয়া শাসন-প্রণালী-সংক্রান্ত আপন অভিপ্রায় প্রকাশ ও সৎপরামর্শ প্রদান করেন এবং ভারতবর্ষীয় রাজকীয় ব্যাপারের গুণাগুণ বিচার ও উত্তরকালীন শাসন-পদ্ধতি-বিষয়ক নানাবিধ প্রস্তাব, যুক্তি ও পরামর্শ লিখিয়া বিভাগাদির নক্‌সা-সম্বলিত একখানি পুস্তক প্রস্তুত করেন। ঐ সমুদয় ব্যতিরেকে, হিন্দুদের দায়াধিকার ও ভারতবর্ষীয় বিচার-প্রণালী-সংক্রান্ত অন্যান্য পুস্তকও রচনা করেন।

তিনি উল্লিখিত সমুদয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির মধ্যে ভারতবর্ষীয় লোকের পদবৃদ্ধির জন্য অনুরোধ ও ব্যাকুল চিত্তে কৃষিজীবীদের দুঃখ-হরণার্থ প্রার্থনা করেন।

সেই সময়ে পার্লিএমেণ্টে ভারতবর্ষের শাসন-সংক্রান্ত নূতন নিয়মাবলী প্রস্তাবিত হয়; তিনি তদর্থে এত চিন্তিত থাকিতেন যে, অনেকে স্বার্থ-সাধন-বিষয়েও তত চিন্তিত থাকে কি না সন্দেহ।

যেন সাক্ষাৎ প্লেটো, সক্রেটিস্ বা নিউটন্ ধরণী-মণ্ডলে পুনরায় উপস্থিত হইলেন। * তুমি আপন সময়ের অতীত বস্তু। কেবল সময়েরই কেন? আপন দেশেরও অতীত। ভারতবর্ষ তোমার যোগ্য নিবাস নয়। এক ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন, এরূপ দেশে এরূপ লোকের জন্ম-গ্রহণ অবনী-মণ্ডলে আর কখনও ঘটিয়াছিল বোধ হয় না। †

তাঁহার ঐ পুস্তক ও প্রবন্ধগুলি অল্প উপকারী হয় নাই। বৃটিশ রাজ-পুরুষেরা তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে ক্রমে ক্রমে অনেক কার্য্য করিয়াছেন ও তদ্দ্বারা বিশেষ উপকারও দর্শিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

"They" (Ram Mohun Roy's Communications to British Legislature) "show him to be at once the philosopher and the patriot. They are full of practical wisdom: and there is reason to believe that they were highly valued by our Government, and that they aided in the formation of the new system."—Dr. Carpenter.

* "Monthly Repository of June, 1831.

† যে সময় গুরুপাঠশালায় শুভঙ্করী অঙ্ক ও কচিৎ পার্সী কায়্দা (১) শিক্ষাবধি সর্ব্বসাধারণ বিষয়ী লোকের বিদ্যাশিক্ষার চরম সীমা ছিল, সেই সময়ে যিনি পৃথিবীর প্রাচীন ও অপ্রাচীন বহুতর প্রধান প্রধান ভাষা প্রভৃতি দশ ভাষায় ও বিবিধ বিজ্ঞানে স্বীয় অধিকার বিস্তার করেন (২); যিনি ভিন্ন ভিন্ন নানা ভাষায় স্বদেশের কল্যাণকর বিবিধ পুস্তক প্রস্তুত করেন, আপনার দেশ-ভাষায় রীতিমত গদ্য-গ্রন্থ-রচনার পথপ্রদর্শন করেন, সেই ভাষায় ব্যাকরণ-রচনাদি-দ্বারা

(১) পার্সী ব্যাকরণ।

(২) "The wide field over which his acquirements spread comprising sciences and languages, which individual knowledge rarely associates together."—W. J. Fox.

সহমরণ-নিবারণ, ব্রাহ্মধর্ম্ম-সংস্থাপন, দেশীয় লোকের পদোন্নতি-সাধন ইত্যাদি তোমার কত জয়স্তম্ভ ও কীর্ত্তিস্তম্ভ জাজ্বল্যমান

তাহার শিক্ষা-প্রচলনের উপায়ানুষ্ঠান করেন (৩) এবং যেরূপ শিক্ষায় লোকের বুদ্ধি মার্জ্জিত ও কুসংস্কার বিনষ্ট হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানপথে প্রবৃত্তি জন্মে, ইংরাজী বিদ্যালয়-সংস্থাপনাদি-দ্বারা স্বদেশে সেইরূপ শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত করিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা পান, যে সময়ে তাহারা ঘোরতর অজ্ঞান ও অশেষ প্রকার কুসংস্কারে অন্ধ হইয়াছিল, সেই সময়ে যিনি আপনার বুদ্ধি, বিদ্যা ও তেজস্বিতা-প্রভাবে সমুদয় কুসংস্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্মাদি-সংশোধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, ও সে বিষয়ে সুনিপুণ ও কৃতকার্য্য হইবার উদ্দেশে স্থল-পথে ও সমুদ্র-পথে কত কত অতিদূর-স্থিত দুর্গম দেশ পরিভ্রমণ করিয়া নানা জাতির ধর্ম্ম, কর্ম্ম, রীতিনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান করেন (৪); যিনি স্বদেশীয় স্ত্রীলোকের ব্যথায় ব্যথিত ও কারুণ্য-রসে অভিষিক্ত হইয়া তদীয় শিক্ষা-বিষয়ে সমুচিত যুক্তি প্রদর্শন ও নিতান্ত সানুকূল ভাব প্রকাশ করেন, বহুবিবাহ-রীতি ও বর্ত্তমান দায়াধিকার-বিষয়ক ব্যবস্থা তাহাদের অশেষ ক্লেশের মূল ও অনেক অনর্থের কারণ বলিয়া প্রচার করেন, অসঙ্গত নিগ্রহ সহ্য করিয়াও প্রাণপণে সহমরণরূপ বিষময় প্রথা নিবারণ করেন এবং দেশময় এই জন-প্রবাদ প্রচলিত হয় যে, ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বিধবা-বিবাহ প্রচলনের উদ্যোগ পাইবেন এইরূপ ইচ্ছা ব্যক্ত করেন; যে সময়ে স্বদেশীয় লোকে সাধারণ হিতানুষ্ঠান-ধর্ম্মের মর্ম্ম-গ্রহণ করিতেই পারিত

(৩) রামমোহন রায় বাঙ্গালা ভাষায় গৌড়ীয় ব্যাকরণ ব্যতিরেকে খগোল ও জ্যাগ্রাফী নামে জ্যোতিষ ও ভূগোল বিদ্যা-বিষয়ক অপর দুইখানি শিক্ষা-পুস্তক প্রস্তুত করেন।

(৪) ভোট দেশে তিন বৎসর ও ইয়ুরোপে সার্দ্ধ দুই বৎসর অবস্থিতি করেন। সে সময়ে নানাবিধ দুর্গম দেশে পরিভ্রমণপূর্ব্বক ভোট দেশ পর্য্যন্ত গমন করা সহজ ব্যাপার ছিল না।

রহিয়াছে। না জানি কি কল্যাণময়ী মহীয়সী কীর্ত্তি-সংস্থাপন-উদ্দেশে অর্দ্ধ-ভূমণ্ডল অতিক্রম করিতে * কৃতসঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলে। তাদৃশ সুদূরস্থিত ভূখণ্ডবাসী সুপ্রতিষ্ঠিত সাধু লোকেও তোমার অসামান্য মহিমা জানিতে পারিয়া প্রত্যুদ্গমন-পূর্ব্বক তোমাকে সমাদর করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র ছিল। মনে মনে কতই শুভ সঙ্কল্প সঞ্চারিত ও কতই দয়াস্রোত প্রবাহিত

* আমেরিকা গমন করিতে।

না, সেই সময়ে যিনি ঐ ধর্ম্মটী আপনার চিরজীবনের একমাত্র নিত্যব্রত-স্বরূপ অবলম্বন করেন ও তাহাদের বিষম বিদ্বেষ ও ঘোরতর প্রতিকূলতা অতিক্রম করিয়া তাহাদেরই দুঃখ-হরণ, সুখ-বর্দ্ধন ও সর্ব্বপ্রকার উন্নতি-সাধন করিতে নিরন্তর প্রতিজ্ঞারূঢ় থাকেন ; কেবল স্বজাতির শুভান্বেষণ নয়, যিনি ভূমণ্ডলের অন্যান্য প্রধান প্রধান ধর্ম্ম-সংশোধন ও অন্য দেশীয় লোকের হিতানুষ্ঠান-বিষয়েও উৎসাহ ও যত্ন প্রকাশ করেন ; কেবল ধর্ম্মাদির পরিবর্ত্তন নয় যিনি স্বয়ং স্বাধীন দেশের অধিবাসী ও রাজপুরুষের মধ্যে পরিগণিত না হইলেও নিজের বুদ্ধিবিদ্যা ও ক্ষমতা-প্রভাবে রাজ্যশাসন-প্রণালীর সংশোধন ও উন্নতি-সাধন করিয়া স্বদেশীয় লোকের দুঃখহরণ ও শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদনার্থ অতিশয় সাহসিকতা প্রদর্শনপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে চেষ্টা পান, অসাধারণ বুদ্ধি-গৌরব, রাজ-নীতিজ্ঞতা, অধ্যবসায় ও উপচিকীর্ষা-প্রকাশপূর্ব্বক ঐ সমস্ত অসামান্য বিষয়ে চিরজীবন অনুরক্ত থাকিয়া সে সময়েও আপনার জীবিত-কাল-মধ্যে যতদূর সম্ভব কৃতকার্য্য হন, এবং যিনি উল্লিখিত রূপ মহৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান, সর্ব্বহিতৈষিতা, সদাশয়তা, শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপগুণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুসভ্য জাতীয় বিশিষ্টলোকের প্রীতি-পাত্র ও ভক্তি-ভাজন হইয়া যান, তাঁহার সদৃশ উক্তরূপ অসাধারণ বহুতর গুণালঙ্কারে অলঙ্কৃত ব্যক্তি ভূমণ্ডলে এবং বিশেষতঃ এইরূপ অযোগ্য দেশে আর কখনও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এ প্রকার দেখিতে পাওয়া যায় না। একাধারে এরূপ অশেষ প্রকার অসামান্য-বিষয়িণী অলোক-সামান্য বুদ্ধি, ক্ষমতা ও হিতৈষিতার একত্র সংযোগ আর কখনও ঘটে নাই বোধ হয়।

করিয়াছিলে। কিন্তু ভারতের কপাল মন্দ! সে সমুদয় কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আসিয়া আবির্ভূত হইল না। বৃস্টল!—বৃস্টল! * তুমি কি সর্ব্বনাশই করিয়াছ! আমাদিগকে একেবারেই অনাথ ও অবসন্ন করিয়া রাখিয়াছ! যাহাতে অশেষরূপ অমৃত-স্বাদ ফল-রাশি উৎপৎস্যমান হইয়াছিল, সেই অলোকসামান্য বৃক্ষমূলে সাঙ্ঘাতিক কুঠার প্রহার করিয়াছ! সেই বিপদের দিন কি ভয়ঙ্কর দিনই গিয়াছে! আমাদের সেই দিনের মৃতাশৌচ অদ্যাপি চলিতেছে ও চিরকালই চলিবে! সেই দিন ভারত-রাজ্যের কল্যাণ-শিরে বজ্রাঘাত হইয়াছে! এদেশীয় নব্য সম্প্রদায়! সেই দিন তোমরা নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় হইয়া রণজিৎ-শূন্য শিক্ সৈন্যের অবস্থায় পতিত হইয়াছ! দুঃখজীবী কৃষিজীবিগণ! যে সময়ে তোমরা স্বদেশ ও বিদেশের জন্য অপর্য্যাপ্ত অন্ন প্রস্তুত করিয়াও নিজে স্বচ্ছন্দমনে ও নিরশ্রুনয়নে অত্যপকৃষ্ট তণ্ডুল-গ্রাসও গ্রহণ করিতে পাও নাই, সেই সময়ে যিনি এই দুঃসহ দুঃখ-রাশি পরিহার করিয়া তোমাদের সন্তপ্ত হৃদয় শীতল করিবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন, এবং তজ্জন্য বৃটিশ রাজ্যের রাজধানীতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক তোমাদের অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক রাজপুরুষের নিকট স্বহস্তে লিখিয়া বিশেষরূপ কাতরতা প্রকাশ

"Strange is it that such a man should have been given by India to the world. * * * Strange it is—but he was not of India, so much as for India."—Rev. W. J. Fox's Sermon.

"Such an instance is probably unparalleled in the history of the world."—Mary Carpenter.

* ইংলণ্ডের অন্তর্গত বৃস্টল নামক স্থানে রামমোহন রায়ের মৃত্যু ও সমাধি হয়।

করেন, * সেই দিনে তোমরা সেই করুণাময় আশ্রয়ভূমির আশ্রয়-লাভে চিরদিনের মত বঞ্চিত হইয়াছ! ভারতবর্ষীয় চির-নিগ্রহ-ভাজন অবলাগণ! তোমাদের অশেষরূপ দুঃখ-বিমোচন ও বিশেষ-রূপ উন্নতি-সাধন যাঁহার অন্তঃকরণের একটী প্রধান সঙ্কল্প ছিল, এবং যে হৃদয়-বিদীর্ণ-কারী ব্যাপার স্মরণ হইলে শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, যিনি নিতান্ত অযাচিত ও অশেষরূপ নিগৃহীত হইয়াও তোমাদের সেই নিদারুণ আত্মঘাত-ব্যবস্থা † ও তন্নিবন্ধন স্বজনবর্গের শোক-সন্তাপ, আর্ত্তনাদ ও অশ্রুবর্ষণ সমস্তই নিবারণপূর্ব্বক ভারতমণ্ডলের মাতৃহীন অনাথ বালকের সংখ্যা হ্রাস করিয়া যান, সেই দিনে তোমরা সেই দয়াময় পরম বন্ধুকে হারা হইয়াছ। বিবিধ পীড়ায় প্রপীড়িত জননী ভারত-ভূমি! যে আশা নরলোকের জীবন-স্বরূপ সেই দিন তোমার সেই আশাবল্লী বুঝি নির্মূল হইয়াছে!

পূর্ব্বতন শোক-সংবাদ নবীভূত হইয়া উঠিল! অশ্রুধারা-নিবারণে একেবারেই অসমর্থ হইয়া পড়িতেছি। এ সময়ে বিষয়ান্তর স্মরণ করিয়া উহা বিস্মৃত হওয়া আবশ্যক। একটী প্রবোধের বিষয়ও আছে। আমাদের রাজা একেবারে নির্ব্বাণ হইবার বস্তু নন। তিনি ভূ-লোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন তথাচ চিরাবলম্বিত হিত-ব্রত উদযাপন করিয়া যান নাই। তদীয় সমাধি-ক্ষেত্র হইতে কত বার কত পরম শ্রদ্ধেয় সুপবিত্র মহানাদ বিনির্গত ও প্রতিধ্বনিত

* Appendix to the Report from the Select Committee of the House of Commons on the affairs of the East India Company, published in 1831.

† সহমরণ-প্রথা।

হইয়া কতই হিতোৎসাহ-উদ্দীপন ও কতই শুভ সঙ্কল্প-সম্পাদন করিয়া আসিয়াছে! অতএব তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াও আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই; জীবৎকালের সদভিপ্রায়-বলে ও নিজ চরিত্রের দৃষ্টান্ত-প্রভাবে মৃত্যুর পরেও উপকার-সাধন ও উপদেশ-প্রদানপূর্ব্বক আমাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়া র'হয়াছেন। কেবল আমাদের নয়, ইয়ুরোপ ও আমেরিকাও ভক্তিশ্রদ্ধা-সহকারে তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।*

অক্ষয়কুমার দত্ত।

---

* "'Being dead, he yet speaketh' with a voice to which not only India but Europe and America will listen for generations."
—Fox's Sermon.

"'Though dead, he yet speaketh;' and the voice will be heard impressively from the tomb, which in his life, may have excited only the passing emotions of admiration or respect."—Dr. Carpenter's Sermon.

স্বপ্ন-দর্শন,—ন্যায়-বিষয়ক

আমি বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, কনখল প্রভৃতি পশ্চিমোত্তর-প্রদেশীয় বহুতর স্থান পর্য্যটন করিয়া, শীত-ঋতুর উপক্রমেই বিন্ধ্যাচলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এ প্রদেশে শীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। প্রাতঃকালে চতুর্দ্দিক্ মেঘাবৃতবৎ ঘনতর কুজ্মটিকাতে আচ্ছন্ন থাকে; অতি শীতল পশ্চিম-বায়ু প্রবাহিত হইয়া কলেবর কম্পমান করে ও বৃক্ষপত্রের শিশির-বিন্দু-সমুদায় ঝরঝর শব্দে পতিত হইয়া, তলস্থ ভূমিকে অল্প অল্প আর্দ্র করিতে থাকে। সূর্য্য-বিম্ব সর্ব্বদা ম্লানমূর্ত্তি; গগন-মণ্ডলে বহু দূর উত্থিত হইলেও নীহার-প্রভাবে চন্দ্র-বিম্বের ন্যায় অতি মৃদুভাবে প্রকাশ পায়, এবং মধ্যাহ্ন কালেও তদীয় কিরণ-জাল পরম-সুখ-সেব্য বলিয়া অনুভূত হয়। সায়ংকালে ও রজনীতে গৃহের বহির্ভূত হওয়া, অত্যন্ত দুষ্কর; তৎকালে দ্বাররোধ করিয়া অগ্নিসেবন করাই পরম প্রীতিকর বোধ হয়। গত দিবস যামিনী-যোগে যোগমায়ার মন্দিরের সমীপবর্ত্তী গৃহে কতকগুলি উদাসীনের সহিত একত্র উপবেশনপূর্ব্বক অগ্নি-সেবন ও পরস্পর কথোপকথনে মহাসুখে কালযাপন করিতে-ছিলাম। আমার বামপার্শ্বে এক বিমর্ষ-ভাবাপন্ন মৃদু-ভাষী তরুণ-বয়স্ক সন্ন্যাসী উপবিষ্ট ছিলেন; কথা-প্রসঙ্গে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম, তিনি বাঙ্গালাদেশীয় এক ব্রাহ্মণের পুত্র। তাঁহার পিতার পরলোক-যাত্রার পরে তাঁহার পিতৃব্য-পুত্রেরা প্রতারণা করিয়া, তাঁহাকে পৈতৃক বিষয়ে বঞ্চিত করিয়াছে। তিনি অতি নির্ব্বিরোধ মনুষ্য; বিবাদ-বিসংবাদে কোন ক্রমে প্রবৃত্ত হইতে

চাহেন না; তথাপি আত্মীয়-স্বজনের পরামর্শক্রমে রাজদ্বারেও ইহার প্রতীকার-চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রতিপক্ষের সহায়-সম্পত্তি-বল অধিক ছিল, একারণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; অবশেষে মনোদুঃখে সংসার-বিরক্ত হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন।

তাঁহার বাক্যাবসান না হইতেই আমার সম্মুখবর্ত্তী আর এক সুশীল শান্ত-স্বভাব ধর্ম্মপরায়ণ উদাসীন, "হা নারায়ণ!" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কহিলেন,—"ভাই! তোমার দারুণ দুঃখের কথা শুনিয়া, আমি মহা-খেদান্বিত হইলাম; এক্ষণে আমার দুর্দ্দশার বিষয় কিছু শ্রবণ কর। আমি কোন রাজ-সংক্রান্ত সম্ভ্রান্ত পদে নিযুক্ত ছিলাম এবং নির্ব্বিঘ্নে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া, যশোভাজন হইয়াছিলাম; ইতিমধ্যে আমার উপরিতন অধ্যক্ষের মৃত্যু-ঘটনা হইলে, অন্য এক ব্যক্তি তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন। প্রথমাবধি তাঁহার আচরণ দেখিয়া বোধ হইল, রাজ-কোষের সর্ব্বস্ব হরণ-সঙ্কল্প করিয়াই তিনি এ কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আমাকে তাঁহার অনুগামী করিবার নিমিত্ত বিস্তর কৌশল করিলেন; কিন্তু কোন ক্রমেই মানস পূর্ণ করিতে না পারিয়া, অবশেষে আমাকে পদ-চ্যুত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং ক্রমাগত তিন বৎসর শঠতা মিথ্যাকথন ও নানা প্রকার প্রতারণার অনুষ্ঠান-দ্বারা চরিতার্থ হইয়া আপনার কোন প্রিয়-পাত্রকে আমার পদে নিযুক্ত করিলেন। প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরা অনেকেই তাঁহার দুষ্ট ব্যবহার ও আমার নির্দ্দোষ চরিত্র জ্ঞাত ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা কেহই মনোযোগ করিলেন না। এ সকল বিষয়ের যেরূপ চরম ফলাফল দেখিয়া

আসিতেছি, তাহাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইল, ইহার প্রতীকার করা এক প্রকার অসাধ্য। অতএব নিতান্ত অনুপায় ভাবিয়া সংসারাশ্রমে ধিক্কার দিয়া, এই পথের পথিক হইয়াছি।"

এই সমুদায় শোচনীয় ব্যাপার শ্রবণ করিয়া, আমি বিষাদ-সমুদ্রে মগ্ন হইলাম এবং দয়া, ক্ষোভ ও ক্রোধ পর্য্যায়ক্রমে আমার অন্তঃকরণকে ব্যাকুলিত করিতে লাগিল। সাংসারিক লোকের এই সকল অন্যায়াচরণ ভাবিতে ভাবিতে, সে রজনীতে আমার সুন্দররূপ নিদ্রা হইল না; কারণ, চিন্তাকুল-চিত্তে সুচারু সুষুপ্তি-সমাগম সম্ভব নয়। পরে রাত্রিশেষে কিঞ্চিৎ নিদ্রাকর্ষণ হইতেই আমি কি অপূর্ব্ব ব্যাপার সকলই দর্শন করিলাম! সে সমুদায় আমার এরূপ হৃদয়ঙ্গম হইয়া রহিয়াছে যে, স্বপ্ন কি বাস্তবিক, সহসা অনুভব করা যায় না। আমি জন-সমাজের যে প্রকার বিপর্য্যয় দেখিয়াছি, তাহা সবিশেষ বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তবে তাহার স্থূল তাৎপর্য্য ও স্বদেশসম্বন্ধীয় যৎকিঞ্চিৎ যাহা দৃষ্টি করিয়াছি, তাহাই যথার্থবৎ বর্ণন করি। কিন্তু স্বপ্নের সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য না থাকিলেও না থাকিতে পারে।

আমার বোধ হইল, যেন কোন তিমিরাবৃত রজনীতে ভ্রমণ করিতে করিতে, অকস্মাৎ আকাশ-মণ্ডলের পশ্চিমাংশ দাব-দাহ-তুল্য অসামান্য জ্যোতিঃপূর্ণ দেখিয়া, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম। সেই আশ্চর্য্য তেজোরাশি দ্রুতবেগে অধোদিকে আগমন করিতে লাগিল। অনুভব হইল, যেন সূর্য্য-মণ্ডল কোন অনির্দ্দেশ্য অনির্ব্বচনীয় কারণবশতঃ স্থান-ভ্রষ্ট হইয়া, পতিত হইতেছে। কিঞ্চিৎ সমীপস্থ হইলে, তাহার অভ্যন্তরে এক পুরুষচ্ছায়া প্রত্যক্ষবৎ আভাসমান হইল। তাহার কিছুকাল পরে, স্পষ্ট

দেখিলাম—শুভ্রকান্তি, শুভ্রমাল্যাদি-বিশিষ্ট শুভ্রালঙ্কার-ভূষিত কোন তেজঃপুঞ্জ পুরুষ এক মণিময় দণ্ডহস্তে * পৃথিবীতে অবতরণ করিতেছেন। সেই দণ্ডের শিরোভাগে 'ন্যায়' এই অক্ষরদ্বয় অঙ্কিত ছিল এবং দিবসে যেমন বিদ্যুৎ প্রকাশ পায়, সেই তেজোমণ্ডল-মধ্যে ন্যায়-দণ্ডের প্রভা সেইরূপ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ফলতঃ সেই পুরুষের সমস্ত লক্ষণ দৃষ্টি করিয়া, আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইল, ইনি ধর্ম্ম-পুরুষ; ন্যায়দণ্ড হস্তে করিয়া ভূ-লোক শাসনার্থ আগমন করিতেছেন। অনেকেই তাঁহার প্রখর প্রভা সহ্য করিতে না পারিয়া, ভীত-চিত্ত হইল; আর যিনি সহিষ্ণুতা-প্রভাবে তাঁহাকে সুন্দররূপ নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন, তাঁহার নিকটে তিনি পরম রমণীয় রূপে প্রকাশিত হইলেন। এক কালেই তিনি ভয়ঙ্কর ভ্রূভঙ্গি-দ্বারা কাহাকেও ভয়ে কম্পমান করিলেন, কাহাকেও বা প্রসন্ন-বদনে সুমধুর-হাস্য-প্রকাশ-দ্বারা পরমানন্দ-নীরে নিমগ্ন করিতে লাগিলেন। যখন তিনি ভূ-মণ্ডলের সমীপবর্ত্তী হইয়া, মনুষ্যের দৃষ্টিপথের অন্তর্গত হইলেন, তখন চতুর্দ্দিকে কতকগুলি মেঘাবলি বিস্তার-দ্বারা আপনার মহামহিমান্বিত জ্যোতিঃপূর্ণ মূর্ত্তি আবৃত করিয়া, তৎপরিবেশ-স্বরূপ আলোক-ঘটা নানাবর্ণভূষিত ও সর্ব্বলোকের সুখ-দৃশ্য করিয়া, বিকীর্ণ করিলেন। ইতিমধ্যে যাবতীয় লোক বিস্ময়াপন্ন ও শঙ্কাকুল হইয়া, এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সমাগত হইল। বোধ হইল, যেন সমুদায় মনুষ্য একত্র উপস্থিত হইয়াছে। অকস্মাৎ "সত্যের জয়! সত্যের জয়!" বলিয়া ঘন ঘন আকাশ-বাণী হইতে লাগিল। পরে সেই মহামহিমান্বিত পুরুষ মেঘাভ্যন্তর হইতে

* পুরাণে ধর্ম্মের এইরূপ মূর্ত্তি আছে।

কহিতে লাগিলেন,—"মানবগণ! রাজ্যের অবিচার-নিবারণার্থে আমার আগমন হইয়াছে; তোমরা আপন আপন প্রাপ্য বিষয় প্রাপ্ত্যর্থে প্রস্তুত হও।" এই আকস্মিক দৈবধ্বনি শ্রবণ করিয়া, জন-সমাজ ভয়, আশা, হর্ষ ও খেদে যে প্রকার বিচলিত হইল, তাহা বর্ণন করা যায় না।

তদনন্তর ধর্ম্ম অনুমতি করিলেন,—"প্রথমতঃ বিষয়াধিকারের বিষয় সমাধা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যে ধনে যাহার স্বত্ব আছে, তিনি তাহা এই দণ্ডেই প্রাপ্ত হইবেন। অতএব যাহার যত লেখ্যপত্র আছে, সমস্ত উপস্থিত কর।" ইহা শুনিয়া যাবতীয় লোক স্ব স্ব স্বত্বাধিকার সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত বিবিধ-প্রকার লেখ্যপত্র আহরণ করিলেন। কি আশ্চর্য্য! তাহাদের উপর ন্যায়দণ্ডের জ্যোতিঃ পতিত হইবামাত্র, তাহাদের যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশিত হইল। সেই দণ্ডের এ প্রকার আশ্চর্য্য গুণ যে, তদীয় কিরণ-স্পর্শমাত্র যাবতীয় কৃত্রিম পত্র দগ্ধ হইয়া গেল। দহ্যমান পত্রের প্রজ্বলিত অগ্নি, সমুদায় লাক্ষাদ্রব ও অনর্গল ধূমোদ্গম-দ্বারা সে স্থান অতি ভয়ানক ও পরম বিস্ময়কর হইয়া উঠিল। কোন কোন পত্রের দুই চারি পঙ্‌ক্তি ও কোন কোন পত্রের কেবল কতিপয় প্রক্ষিপ্ত অক্ষর নষ্ট হইয়া, তাহার অগ্নি-নির্ব্বাণ হইয়া গেল। কিন্তু শত শত মুদ্রার ষ্ট্যাম্পপত্র সকল দাবানল-দগ্ধ মহারণ্যের ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া, পর্ব্বতাকার হইল। সেই লক্ষ-লক্ষ-মণিময় দণ্ডের জ্যোতিঃ কত কত পরম গুহ্য স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া, অলক্ষিত, অপহৃত ও সংগোপিত লেখ্য-পত্র প্রকাশ করিয়া ফেলিল। ইতিমধ্যে আর এক অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলাম। প্রধান প্রধান বিচারাগারের সহস্র সহস্র অনুজ্ঞা-পত্র দগ্ধ হইল, ইন্‌সালবেণ্ট্ কোর্টের প্রায় সমস্ত নিষ্কৃতি-পত্র

ভস্মীভূত হইয়া গেল, ও যে সকল সম্ভ্রমশালী ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, নির্ম্মুক্ত পুরুষের ন্যায় বিহার ও ব্যবহার করিতেছিলেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বন্দী হইয়া, দণ্ডায়মান হইলেন। ইতিমধ্যে উৎকোচ, অপহরণ, প্রতারণা ও বলপ্রয়োগ-দ্বারা যাবতীয় ধন উপার্জ্জিত হইয়াছিল, তৎসমুদায় পর্ব্বত-প্রমাণ রাশীকৃত হইয়া মেঘমণ্ডল স্পর্শ করিল। তখন ধর্ম্মপুরুষ ঘোষণা করিয়া দিলেন,—"এই ধনরাশি হইতে যাহার যত ন্যায্য ধন আছে, গ্রহণ কর।"

উহাতে লোক-সমাজের কি বিষম বিপর্য্যয় ঘটিয়া উঠিল! সহস্র সহস্র ব্যক্তি অপূর্ব্ব-বেশভূষণ ধারণপূর্ব্বক পরম-রমণীয় রথারোহণ করিয়া, মহাবেগে গমন করিতেছিলেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ অবতরণ-পুরঃসর গাত্র হইতে সমস্ত বস্ত্রাভরণ উন্মোচন করিয়া, এক সামান্য বসন পরিধান-পূর্ব্বক পদব্রজে চলিলেন। কোন স্থানে দেখিলাম, লক্ষপতি বা কোটিপতি ধনাঢ্য ব্যক্তি পরমশোভাকর অট্টালিকায় বহুমূল্য অত্যুত্তম আসনে উপবিষ্ট হইয়া, বন্ধু-বান্ধব-দিগের সহিত আমোদ-প্রমোদে পরমসুখে কাল-হরণ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে একজন সামান্য গৃহস্থ অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে আসনচ্যুত করিয়া দিল, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে নির্গত হইয়া, অতি পুরাতন বৃক্ষ-মূল-বিদ্ধ ভগ্ন গৃহে গিয়া বাস করিলেন। কুত্রচ দৃষ্টি করিলাম, যে সকল ধনাসক্ত, মহামান্য মনুষ্য সমধিক ধনাগম করিয়া, অতি উদার-ভাবে ব্যয়-ব্যসন করিয়া আসিতে-ছিলেন, ও অতিশয় আড়ম্বর-সহকারে নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিয়া বিপুল কীর্ত্তি-লাভ করিতেছিলেন, সহসা তাঁহাদের সামান্যরূপ উদরান্ন আহরণ করাও কঠিন হইল এবং কতকগুলি

নিরন্ন-নির্ব্বিষয় ব্যক্তি আসিয়া, তাঁহাদের সমুদায় সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইল। তদ্ভিন্ন ধনাধিকার-বিষয়ে যে সকল অল্প অল্প পরিবর্ত্তন হইল, তাহার বিবরণ করিয়া শেষ করা যায় না। জাগরিত হইয়া যাহা দেখিতেছি, তখন তাহার বিস্তর অন্যথাভাব দৃষ্টি করিয়াছিলাম।

এবম্ভূত অদ্ভুত কাণ্ড সমুদায় অবলোকন করিয়া, বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইতেছিলাম, ইতিমধ্যে অপর এক পরম কৌতূহল-জনক অত্যাশ্চর্য্য মহোপকারী ব্যাপার উপস্থিত হইল। ধর্ম্মপুরুষ মেঘান্তরে অবস্থানপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত তাবৎ কার্য্য সমাধা করিয়া, আদেশ করিলেন,—"অবনী-মণ্ডলে কেহ অন্যায় মানসম্ভ্রম লাভে সমর্থ হইবে না, অদ্যাবধি সকলেই নিজ নিজ গুণানুসারে পদ প্রাপ্ত হইবে।" এই অতুল হিতকর অনুমতি শ্রবণ করিয়া লোক সকল যৎপরোনাস্তি উৎকণ্ঠা-পর্য্যাকুল হইল। রূপবান্, বলবান্ ও ধনবান্ মনুষ্যেরা সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মদেবের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার ন্যায়-দণ্ড-জ্যোতিঃ সহ্য করিতে না পারিয়া, অবিলম্বে পরাঙ্মুখ হইলেন। তিনি কেবল তাঁহার সর্ব্বগুণময় ন্যায়-দণ্ডের কিরণ বিকীর্ণ করিয়া, সকলকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। উহাতে যাহাদের বিশিষ্টরূপ ধর্ম্ম, বিদ্যা বা বিষয়-বুদ্ধি আছে, তদ্ভিন্ন আর তাবতেই দণ্ড-জ্যোতিঃ দর্শনমাত্র বিমুখ ও শঙ্কাতুর হইয়া রহিলেন। সেই সকল মহাত্মারা পর্য্যায়ক্রমে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। পরম হিতৈষী পুণ্যবান্ লোকেরা প্রথম শ্রেণীতে, বিদ্যাবান্ লোকেরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ও বিষয়-নিপুণ ব্যক্তি সকল তৃতীয় শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইলেন। প্রথম শ্রেণীর শোভা দেখিয়া

মন মোহিত হইল। তাঁহাদের কি প্রফুল্ল বদন, করুণ নয়ন ও সুমধুর বচন! কি সৌজন্য, কি কারুণ্য-স্বভাব! তাঁহাদিগের পরম পবিত্র জ্যোতিঃ-পূর্ণ মুখশ্রী অবলোকন করিলে, অন্তঃকরণ প্রেমামৃত-রসে আর্দ্র হইতে থাকে। কতকগুলি হীন-জাতীয় এবং অজ্ঞাত-কুলশীল মনুষ্যকেও এই শ্রেণীভুক্ত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। জাগ্রৎকালে যাহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া, আপনাকে অশুচি বোধ করিয়াছিলাম, তখন দেখিলাম, তাহারা কত শত সদ্‌বংশজ ভদ্র-সন্তানের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদ লাভ করিয়াছে, এবং যাঁহাদিগকে পরম তপস্বী ঋষিতুল্য বোধ করিতাম তাঁহারা এই শ্রেণীতে যৎকিঞ্চিৎ স্থানও প্রাপ্ত হইলেন না। কত কত দীর্ঘ-পুণ্ড্র ধারী দাম্ভিক ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের শত শত আত্মাভিমানী বহুভাষী ছাত্র, এই শ্রেণীতে ভুক্ত হইবার নিমিত্ত বিস্তর বাগ্‌বিতণ্ডা করিলেন। অবশেষে যখন দর্পহারী ধর্ম্মপুরুষ তাঁহাদের মুখমণ্ডলোপরি ন্যায়-দণ্ড চালনা করিয়া, তদীয় প্রচণ্ড জ্যোতি বিস্তীর্ণ করিলেন, তখন তাঁহারা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া লজ্জায় অধোমুখ হইয়া, তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সংস্থাপনের সময় বিষম বিবাদ উপস্থিত হইল। যত লোক সে শ্রেণীর অধিকারী, সকলেই নিজ নিজ গুণাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদ প্রাপ্তির নিমিত্ত সাতিশয় ব্যগ্র হইলেন। তাঁহাদিগের এইরূপ অবিহিত অনুচিত জিগীষা দেখিয়া ধর্ম্মপুরুষ দণ্ডহস্তে স্বয়ং অগ্রসর হইয়া, সকলের স্ব স্ব গুণোচিত সম্মান প্রদান করিলেন এবং সর্ব্বোত্তম ধী-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি-সমুদায়কে সর্ব্বাগ্রে স্থাপিত করিলেন। যাহাদের তাদৃশ স্বকীয় শক্তি নাই, যাহারা কেবল

পরিচিত গ্রন্থ-পাঠ-দ্বারা বিদ্যাবিষয়ে পারদর্শী হইয়াছে, তাহাদিগকে তৎপরে স্থাপিত করিলেন। যাহাদিগের অনেকানেক গ্রন্থ পাঠ হইয়াছে, কিন্তু তাদৃশ বিচারশক্তি নাই, তাহারা সর্ব্বশেষে থাকিল। এইরূপে আধুনিক যুগের প্রত্যেক বিদ্যাবান্ ব্যক্তি ইহার কোন না কোন স্থানে নিবিষ্ট হইলেন, ফলতঃ কি বিপর্য্যয়ই দেখিলাম। যাঁহাদের বিদ্যাবিষয়ে বিলক্ষণ খ্যাতি আছে, তন্মধ্যেও অনেকানেক ব্যক্তি অধম স্থানে সংস্থাপিত হইলেন। কতকগুলি বাঙ্গালা-গ্রন্থকর্ত্তা এই শ্রেণী-ভুক্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; কিন্তু আক্ষেপের কথা কি কহিব, ধর্ম্মপুরুষ তাঁহাদিগকে নিতান্ত অনধিকারী বিবেচনা করিয়া, তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। সে শ্রেণীতে কোন স্থানে তাঁহাদের স্থান হইল না। তাঁহাদের এই দারুণ দুরবস্থা দর্শন করিয়া, আমার অন্তঃকরণ দুঃসহ দুঃখ-তাপে তাপিত হইতে লাগিল। ভাবিলাম, এই সকল অবোধ মনুষ্য যে বিষয়ে যশঃ-সৌরভ লাভের বাসনা করে, অধিকারী না হইয়া, তাহাতে কেন প্রবৃত্ত হয়? তবে প্রবোধের বিষয় এই যে, তিনি তাহাদিগকে শ্রেণী-বহির্ভূত করিয়া কহিলেন,—"তোমরা প্রতিপত্তি-লাভ ও স্বদেশোপকারের উৎকৃষ্ট পথ অবলম্বন করিয়াছ। স্বদেশীয় ভাষার অনুশীলন ব্যতিরেকে কখন কোন দেশে জ্ঞানের প্রচার ও প্রাদুর্ভাব হইতে পারে না। তোমরা কিছুকাল পঠদ্দশায় থাক, পরে মনোরথ পূর্ণ হইলেও হইতে পারে। তোমরা যে সকল প্রস্তাব লিখিয়া থাক, তাহার পূর্ব্বাপর ঐক্য থাকে না, ভাবের প্রগাঢ়তা থাকে না এবং রচনাও পরিপাটি-শুদ্ধ হয় না, বিশেষতঃ যিনি যে বিষয় রচনা করেন, তিনি তাহা নিয়মিতরূপে শিক্ষা ও

তদ্‌বিষয়ে সবিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়াই তাহাতে প্রবৃত্ত হন। আর অনেকে যৎকুৎসিত অনুপ্রাসের অনুরোধে তাৎপর্য্যের ব্যাঘাত করেন। ইত্যাকার সমস্ত দোষ সংশোধন-পূর্ব্বক অভীষ্ট বিষয়ে পারদর্শী হইতে পারিলে, অবশ্য কৃতকার্য্য হইবে।" যাহারা ভাষান্তরে সামান্যরূপ কথোপকথন শিক্ষা করিয়া, বিদ্যাভিমান প্রকাশ করে, যাহাদের কোন বিজ্ঞান-শাস্ত্রে কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি হয় নাই, তাহাদের অপমান দেখিয়া, হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তাহারা ধর্ম্মপুরুষের বিস্তর সাধ্য-সাধনা করিয়া তথায় যৎকিঞ্চিৎ স্থান প্রাপ্ত হইল না। আর কতকগুলি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের দুরবস্থার বিষয় কি বলিব। তাঁহারা নিরুপবীত হীনজাতীয় শত শত ব্যক্তিকে আপনার অপেক্ষা উচ্চপদাভিষিক্ত দেখিয়া, অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। আহা! কত কত গুরুদেব ঐ শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হইয়া, লজ্জায় অধোমুখ হইলেন, এবং তাঁহাদের শিষ্যেরা তাঁহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থানে অবস্থিতি করিয়া, তাঁহাদের দারুণ দুর্দ্দশা দর্শন করিতে লাগিলেন।

এই শ্রেণীর লোক-সংস্থাপন সমাপ্ত হইলে, ধর্ম্মপুরুষ বিষয়ী-দিগকে আহ্বান করিলেন। তাহা শুনিয়া, চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রতাপান্বিত মানগর্ব্বিত শত শত ব্যক্তি সবিশেষ-উৎসাহ-সহকারে সদর্প পাদবিক্ষেপ-পূর্ব্বক আগমন করিলেন। ধর্ম্মদেব ন্যায়-দণ্ডের সুবিমল প্রভায় তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ অবলোকন করিয়া কহিলেন,—"তোমরা এ বিষয়ে উপযুক্ত বটে; তোমরা উদ্যোগী, পরিশ্রমী ও কর্ম্মদক্ষ; তোমাদের বিলক্ষণ বিষয়জ্ঞান আছে, কিন্তু ধর্ম্মরক্ষায় যত্ন নাই; তোমরা স্বার্থ-পরবশ হইয়া, পরপীড়াদায়ক উৎকোচাদি গ্রহণ কর, এবং স্বীয় প্রভুর অপচয় কর। এ সকল

কুব্যবহার পরিত্যাগ না করিলে, কোন প্রকারে তোমাদের সম্ভ্রম-জনক পদলাভে অধিকার জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।" এই কথা বলিয়া, তাহাদের মধ্যে শতকে এক বা দুই জনকে গ্রহণ করিয়া, অপরাপর সকলের আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। তদনন্তর তিনি সংসারের বিষয়কার্য্য-সম্পাদনার্থে পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর কতক লোককে আহ্বান করিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যেমন জ্ঞানসম্পন্ন ও ধর্ম্মশীল, বিষয়কার্য্যে সেরূপ অভিজ্ঞ ও অনুরক্ত নহেন। তবে যে কয়জন ত্রি-গুণ-সম্পন্ন, সুতরাং তিন শ্রেণীতে উপযুক্ত ও পদগ্রহণে সম্মত ও অভিলাষী হইলেন, তাঁহাদিগকে অত্যুৎকৃষ্ট সম্ভ্রান্ত পদসমুদায় সমর্পণ করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করিয়া দিলেন, ভূ-মণ্ডলে ইহারাই সর্ব্বমান্য, পরম পূজ্য প্রধান মনুষ্য। তৎপরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, যাহারা দুই-গুণ-সম্পন্ন তাহাদিগকে তদপেক্ষা অপকৃষ্ট পদে স্থাপন করিলেন এবং অবশেষে যাহাদের কেবল বিষয়-কার্য্যে নৈপুণ্য আছে, তাহাদিগকে অতি অপকৃষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদে নিযুক্ত করিলেন, আর উৎকোচগ্রাহী পরপীড়ক পাপাত্মা অপহারী-দিগকে তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তন্মধ্যে দেখিলাম, পূর্ব্বে যাঁহারা রাজ-সংক্রান্ত উন্নত পদে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের অনেকে এইরূপ মানচ্যুত ও তিরস্কৃত হইয়া, সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। পূর্ব্বে তাঁহারা যাহাদিগকে মনুষ্য বলিয়া গণ্য করিতেন না, তাহারা পদস্থ হইয়া, তাঁহাদের এইরূপ বিষম দুর্দ্দশা দর্শন করিতে লাগিল। কতিপয় ইংরেজ-জাতীয় রাজকর্ম্মচারীর অপমানের কথা কি কহিব! তাঁহারা ক্রমাগত নানা দুষ্টাচরণ করিয়াও একাল পর্য্যন্ত কেবল সহায়-বলে ও বুদ্ধি-কৌশলে সমুদায় প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে ধর্ম্মপুরুষের ন্যায়রূপ

দণ্ডজ্যোতি সহ্য করিতে না পারিয়া, লজ্জিত ও অপমানিত হইলেন, এবং কতিপয় বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহাদের পদে অভিষিক্ত হইয়া যশস্বী হইতে লাগিলেন।

কিন্তু ইহাতেও বিস্তর মান্য পদ শূন্য থাকিল দেখিয়া, ধর্ম্মপুরুষ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কতকগুলি জ্ঞানবান্ শান্ত-স্বভাব পরিশ্রম-বিমুখ ব্যক্তিকে যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিয়া মৃদুভাবে মধুরস্বরে কহিতে লাগিলেন,—"তোমরা বিদ্যাবান্ ও ধর্ম্মশীল বটে; কিন্তু এ প্রকার গুণসম্পন্ন হইয়া, আলস্যের বশীভূত থাকা উচিত নয়। কতকগুলি পুস্তক-সমভিব্যাহারে বিরলে কাল-যাপনার্থে বিদ্যার সৃষ্টি হয় নাই, এবং সংসারের শুভাশুভ তাবৎ বিষয়ে উপেক্ষা করিয়া, অনুৎসাহে কালক্ষেপণ করাও ধর্ম্মের উদ্দেশ্য নয়। ভূ-মণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি সংসারের কার্য্যই না করিলে, তবে জীবন-ধারণের ফল কি? অর্জ্জিত বিদ্যাকে যদি জগতের উপকারার্থে নিয়োগ না করিলে, তবে সে বিদ্যার প্রয়োজন কি? যদি সকলেই তোমাদের ন্যায় বৃথা কাল হরণ করে, তবে এক দিবসেই লোক-যাত্রার উচ্ছেদ-দশা উপস্থিত হয়। তোমরা বলিয়া থাক, আমরা আকাঙ্ক্ষার হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, সন্তোষ অবলম্বন করিয়াছি; কিন্তু তোমাদের যে প্রকার হীন অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে এরূপ নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নয়। তোমরা কোনক্রমে প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছ; সমুচিত অন্ন-বস্ত্রাদি আহরণেও সমর্থ নহ। যথেষ্ট উপাদেয় অন্ন, স্বচ্ছন্দ-পরিধেয় পবিত্র বস্ত্র, প্রশস্ত পরিষ্কৃত বাটী এবং অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাভাবে তোমাদের পরিবারেরা ক্লিষ্ট ও পীড়িত হইয়া অশেষপ্রকার দুঃখ পাইতেছে; তাহাদের রোগ হইলে ব্যয়সাধ্য-প্রযুক্ত তাহার

যথোচিত চিকিৎসা হয় না, স্বচ্ছন্দভাবে তোমাদের সন্তানদিগের শরীরপুষ্টি ও মনঃস্ফূর্ত্তি হয় না এবং ধনাভাবে তাহারা উৎকৃষ্ট শিক্ষাও প্রাপ্ত হয় না। ইহাতে তোমাদের দ্বারা বিবিধ-মতে পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করা হইতেছে। ক্ষমতা সত্ত্বে এ প্রকার অবস্থায় তৃপ্ত থাকিয়া, এই সমস্ত দুঃখ-নিরাকরণে যত্ন না করা, অবশ্যই দূষণীয় বলিতে হয়। আমার অঙ্গ-স্বরূপ যে সন্তোষ, তাহার এরূপ স্বভাব নয়। আপন আপন ক্ষমতানুযায়ী অবস্থাতে তৃপ্ত থাকা এবং যে দুঃখ নিবারণের উপায় নাই, তাহাতে ব্যাকুলিত না হইয়া, ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক প্রসন্ন-ভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করাই প্রকৃত সন্তোষের লক্ষণ। এইরূপ সন্তোষে পুণ্য ও প্রতিষ্ঠা দুই-ই আছে। অতএব তোমাদের আত্ম-হিত ও সংসারের উপকারার্থে সচেষ্ট হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; তাহা হইলে, তোমরাই এই সকল সম্ভ্রান্ত পদের অধিকারী হইতে পার।”

ধর্ম্মের এই সকল মধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া, আমি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম, এবং সাতিশয় শ্রদ্ধাবিষ্ট হইয়া মনে মনে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। এমন সময়ে উদাসীন-দিগের স্থানান্তর-যাত্রার্থ উদ্যোগ-ধ্বনি শুনিয়া, আমার স্বপ্ন-ভঙ্গ হইল। তখন আমি সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া উঠিলাম এবং এই পরম-রমণীয় স্বপ্নব্যাপার সম্পূর্ণ সফল হউক বলিয়া, বার বার প্রার্থনা করিলাম।

অক্ষয়কুমার দত্ত।

সীতার বনবাস

(ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

রাজা রামচন্দ্র, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কৃতসংকল্প হইয়া বশিষ্ঠ, জাবালি, কাশ্যপ, বামদেব প্রভৃতি মহর্ষিবর্গের নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বশিষ্ঠদেব শ্রবণমাত্র সাধুবাদ প্রদান-পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! উত্তম সংকল্প করিয়াছেন। আপনি সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি, অখণ্ড ভূমণ্ডলে যেরূপ একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী কোন নরপতি সেরূপ করিতে পারেন নাই। রামরাজ্যে প্রজালোকে যেরূপ সুখে ও স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছে, তাহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব। রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া যে যে বিষয় অনুষ্ঠান করিতে হয়, আপনি তাহার কিছুই অসম্পাদিত রাখেন নাই; রাজকর্ত্তব্যের মধ্যে অশ্বমেধমাত্র অবশিষ্ট আছে, এক্ষণে তাহা সম্পন্ন হইলেই আপনার রাজ্যাধিকার আর কোন অংশে হীন থাকে না। আমরা ইতিপূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম, এ বিষয়ে মহারাজকে অনুরোধ করিব। যাহা হউক, মহারাজ যখন স্বয়ং সেই অভিলষিত বিষয়ের অনুষ্ঠানে উদ্যুক্ত হইয়াছেন, তখন আর তদ্বিষয়ে বিলম্ব করা বিধেয় নহে; অবিলম্বে তদুপযোগী আয়োজনের অনুমতি প্রদান করুন।

বশিষ্ঠদেব বিরত হইবামাত্র, রামচন্দ্র পার্শ্বোপবিষ্ট অনুজদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, বৎসগণ! ইনি যাহা কহিলেন, শ্রবণ করিলে; এক্ষণে তোমাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইলেই

কর্ত্তব্য নিরূপণ করি। আজ্ঞানুবর্ত্তী অনুজেরা তৎক্ষণাৎ আন্তরিক অনুমোদন প্রদর্শন করিলেন। তখন রাম, কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ-দেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যখন আমার অভিলাষ আপনাদিগের অভিমত ও অনুজদিগের অনুমোদিত হইতেছে, তখন আর তদনুযায়ী অনুষ্ঠানের কর্ত্তব্যতা-বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। এক্ষণে আমার বাসনা এই, নৈমিশারণ্যে অভিপ্রেত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। নৈমিশারণ্য পরম পবিত্র যজ্ঞক্ষেত্র। এ বিষয়ে আপনার কি অনুমতি হয়? বশিষ্ঠদেব তদ্বিষয়ে তৎক্ষণাৎ সম্মতি প্রদান করিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র অনুজদিগকে কহিলেন, দেখ অনর্থক কালহরণ করা বিধেয় নহে; অতএব তোমরা সত্বর সমুদয় আয়োজন কর। অনুগত, শরণাগত ও মিত্রভাবাপন্ন নৃপতিদিগকে নিমন্ত্রণ কর; সময়-নির্দ্ধারণ-পূর্ব্বক যাবতীয় নগরে ও জনপদে এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া দাও; লঙ্কাসমরসহায় সুহৃদ্বর্গকে পরম সমাদরে আহ্বান কর; তাঁহারা আমাদের যথার্থ বন্ধু, আমাদের জন্য অকাতরে কতই ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন; তাঁহারা আসিলে আমি পরম সুখী হইব। তদ্ব্যতিরিক্ত, যাবতীয় ঋষিদিগকেও নিমন্ত্রণ কর; তাঁহারা যজ্ঞদর্শনে আগমন করিলে, আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব। ভরত! তুমি অবিলম্বে নৈমিশক্ষেত্রে গমন করিয়া, যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণের উদ্যোগ কর। লক্ষ্মণ! তুমি অন্যান্য সমস্ত আয়োজন করিয়া সত্বর তথায় প্রেরণ কর। দেখ, যজ্ঞদর্শনের নিমিত্ত নৈমিশে অসংখ্য লোকের সমাগম হইবেক; অতএব যত্নপূর্ব্বক যাবতীয় বিষয়ের এরূপ আয়োজন করিবে, যেন কোন বিষয়ের অসঙ্গতি-নিবন্ধন কাহারও কোন ক্লেশ বা অসুবিধা ঘটে

না। তুমি সকল বিষয়ে পারদর্শী, তোমায় অধিক উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই।

এই বলিয়া রাম বিরত হইলে, বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! সকল বিষয়েরই উচিতাধিক আয়োজন হইবেক, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি এক বিষয়েরই একান্ত অসঙ্গতি দেখিতেছি। তখন রাম কহিলেন, আপনি কোন্ বিষয়ে অসঙ্গতি আশঙ্কা করিতেছেন, বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ! শাস্ত্রকারেরা কহেন, সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। অতএব জিজ্ঞাসা করি, সে বিষয়ের কি উপায় ভাবিয়া রাখিয়াছেন? শ্রবণমাত্র রামের মুখকমল ম্লান ও নয়নযুগল অশ্রু-জলে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ অবনত বদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, নয়নের অশ্রু মার্জ্জন ও উচ্ছলিত শোকাবেগ সংবরণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! ইতিপূর্ব্বে এ বিষয়ে আমার উদ্বোধমাত্র হয় নাই; এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, উপদেশ করুন। বশিষ্ঠদেব অনেকক্ষণ একাগ্র চিত্তে চিন্তা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! ভার্য্যান্তরপরিগ্রহ-ব্যতিরেকে উপায়ান্তর দেখিতেছি না।

বশিষ্ঠবাক্য শ্রবণ করিয়া, সকলেই এক কালে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। রাম নিতান্ত সীতাগতপ্রাণ, লোকবিরাগ-সংগ্রহ ভয়ে সীতাকে বনবাসে প্রেরণ করিয়া জীবন্মৃত হইয়া ছিলেন। তাঁহার প্রতি রামের যে অবিচলিত স্নেহ ও ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল, এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। সীতার মোহন মূর্ত্তি অহোরাত্র তাঁহার অন্তঃকরণে জাগরূক ছিল। তিনি যে উপস্থিত কার্য্যানুরোধে ভার্য্যান্তরপরিগ্রহে সম্মত হইবেন,

তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। যাহা হউক, বশিষ্ঠদেব দার-পরিগ্রহ-বিষয়ে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু রাম তদ্বিষয়ে ঐকান্তিকী অনিচ্ছা প্রদর্শন করিয়া মৌনভাবে অবনত-বদনে অবস্থিত রহিলেন। অনন্তর, বহুবিধ বাদানুবাদের পর হিরণ্ময়ী সীতাপ্রতিকৃতি-সমভিব্যাহারে যজ্ঞানুষ্ঠান করাই সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া মীমাংসিত হইল।

এইরূপে সমুদয় স্থিরীকৃত হইলে, ভরত সর্ব্বাগ্রে নৈমিশে প্রস্থান করিলেন, এবং সমুচিত স্থানে যজ্ঞভূমি নিরূপণ করিয়া, অনুরূপ অন্তরে পৃথক্ পৃথক্ প্রদেশে এক এক শ্রেণীর লোকের নিমিত্ত, তাহাদের অবস্থোচিত বাসশ্রেণী নির্ম্মাণ করাইলেন। লক্ষ্মণও অনতিবিলম্বে অশেষবিধ অপর্য্যাপ্ত আহারসামগ্রী ও শয্যাসনাদি সংগ্রহ করিয়া যজ্ঞক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র, লক্ষ্মণকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া, যথাবিধানে যজ্ঞিয় অশ্ব মোচন-পূর্ব্বক, মাতৃগণ ও অপরাপর পরিবারবর্গ-সমভিব্যাহারে সসৈন্যে নৈমিশারণ্যে প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎ দিন পরেই, নিমন্ত্রিতগণের সমাগম হইতে আরম্ভ হইল। শত শত নৃপতি, বহুবিধ মহামূল্য উপহার লইয়া, অনুচরগণ ও পরিচারকবর্গ-সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইতে লাগিলেন; সহস্র সহস্র ঋষি, যজ্ঞদর্শনমানসে, ক্রমে ক্রমে নৈমিশে আগমন করিতে লাগিলেন; অসংখ্য নগরবাসী ও জনপদবাসীরাও সমাগত হইলেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন, নরপতিগণের পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিলেন; বিভীষণ, ঋষিগণের কিঙ্করকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন; সুগ্রীব অপরাপর যাবতীয় নিমন্ত্রিতবর্গের তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত রহিলেন।

এদিকে, মহর্ষি বাল্মীকি, সীতার অবস্থা অবলোকন করিয়া, এবং কুশ ও লবের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ দেখিয়া, মনে মনে সর্ব্বদা এই আন্দোলন করেন যে, সীতার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে তিনি অধিক দিন জীবিত থাকিবেন, এরূপ বোধ হয় না; আর কুশ ও লব, রাজাধিরাজতনয় হইয়া যাবজ্জীবন তপোবনে কালযাপন করিবেক, ইহাও কোনক্রমে উচিত নহে; তাহাদের ধনুর্ব্বেদ ও রাজধর্ম্ম শিক্ষার সময় বহিয়া যাইতেছে। অতএব, যাহাতে সপুত্রা সীতা অবিলম্বে রামচন্দ্র-পরিগৃহীতা হন, আশু তাহার কোন উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক। অথবা, উপায়ান্তর উদ্ভাবনে প্রয়োজন কি? শিষ্য-দ্বারা সংবাদ দিয়া রামচন্দ্রকে আমার আশ্রমে আনাই, অথবা স্বয়ং রাজধানীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, সপুত্রা সীতার পরিগ্রহ প্রার্থনা করি। রামচন্দ্র অবশ্যই আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন। এইরূপ ভাবিয়া ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া মহর্ষি পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত লোকানুরাগপ্রিয়; কেবল লোকবিরাগসংগ্রহ-ভয়ে পূর্ণগর্ভ অবস্থায়, নিতান্ত নিরপরাধে জানকীরে পরিত্যাগ করিয়াছেন; এখন আমার কথায়, তাঁহারে সহজে গ্রহণ করিবেন, তাহাও সম্পূর্ণ সন্দেহস্থল। যাহা হউক, কোন সংবাদ না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত হইতেছে না। এই দুই বালক উত্তরকালে অবশ্যই কোশলসিংহাসনে অধিরোহণ করিবেক। এই সময়ে পিতৃসমীপে নীত হইয়া, নীতিশাস্ত্রাদি বিষয়ে বিধিপূর্ব্বক উপদিষ্ট না হইলে, ইহারা রাজকার্য্য-নির্ব্বাহে একান্ত অপটু ও রাজমর্য্যাদা-রক্ষণে নিতান্ত অক্ষম হইবেক। বিশেষতঃ রাজা রামচন্দ্র আমাকে কোশলরাজ্যের হিতসাধনে যত্নবিহীন বলিয়া অনুযোগ করিতে

পারেন। অতএব এ বিষয়ে আর উপেক্ষা প্রদর্শন করা বিধেয় নহে। এক্ষণে রামচন্দ্রের নিকট সকল বিষয়ের সবিশেষ সংবাদ প্রেরণ করা উচিত। অথবা, একবারেই তাঁহার নিকট সংবাদ না পাঠাইয়া, বশিষ্ঠ বা লক্ষ্মণের সহিত পরামর্শ করা কর্ত্তব্য; তাঁহারাই বা কিরূপ বলেন, দেখা আবশ্যক।

একদিন মহর্ষি সায়ংসন্ধ্যা ও সন্ধ্যাকালীন হোমবিধি সমাধান করিয়া, আসনে উপবেশন-পূর্ব্বক একাকী এই চিন্তায় মগ্ন আছেন, এমন সময়ে এক রাজভৃত্য আসিয়া রামনামাঙ্কিত অশ্বমেধনিমন্ত্রণ-পত্র তদীয় হস্তে সমর্পণ করিল। মহর্ষি, পত্র পাঠ করিয়া, পরম-প্রীতি-প্রদর্শন-পূর্ব্বক, সেই লোককে বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত বিদায় দিলেন, এবং শিষ্যদিগকে তাহার আহারাদির সমবধানে আদেশ প্রদান করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি যে বিষয়ের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, দৈব অনুকূল হইয়া তৎসিদ্ধির বিলক্ষণ উপায় করিয়া দিলেন। এক্ষণে বিনা প্রার্থনায় কার্য্যসাধন করিতে পারিব। কুশ ও লবকে শিষ্যভাবে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইব। রামের ও ইহাদের আকারগত যেরূপ সৌসাদৃশ্য, দেখিলেই সকলে ইহাদিগকে রামের তনয় বলিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারিবেক, আর অবলোকনমাত্র রামেরও হৃদয় নিঃসন্দেহ দ্রবীভূত হইবেক; এবং তাহা হইলেই আমার অভিপ্রেতসিদ্ধির পথ স্বতঃ পরিষ্কৃত লইয়া আসিবেক।

মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, মহর্ষি জানকীর কুটীরে উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন, বৎসে! রাজা রামচন্দ্র, অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছেন; কল্য প্রত্যূষে প্রস্থান করিব, মানস করিয়াছি, অপরাপর শিষ্যের ন্যায়,

তোমার পুত্রদ্বয়কেও যজ্ঞদর্শনে লইয়া যাইব। সীতা তৎক্ষণাৎ সম্মতি প্রদান করিলেন। মহর্ষি, আশ্রমকুটীরে প্রতিগমন করিয়া, শিষ্যদিগকে আহ্বান-পূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়া থাকিতে কহিয়া দিলেন, এবং কুশ ও লবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেখ, এ পর্য্যন্ত তোমরা জনপদের কোন ব্যাপার অবলোকন কর নাই; রামায়ণ-নায়ক রাজা রামচন্দ্র অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন; ইচ্ছা করিয়াছি, তোমাদিগকে. যজ্ঞদর্শনে লইয়া যাইব। তোমাদের যজ্ঞদর্শন ও আনুষঙ্গিক রাজদর্শন সম্পন্ন হইবে, এবং তথায় যে অসংখ্য জনপদবাসী লোক সমবেত হইবেক, তাহাদিগকে দেখিয়া তোমরা অনেক অংশে লৌকিক বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবে। তাহারা দুই সহোদরে, রামায়ণে রামের অলৌকিক কীর্ত্তি পাঠ করিয়া, তাঁহাকে সর্ব্বাংশে অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, তাঁহাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিব, এই ভাবিয়া তাহাদের আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। তদ্ব্যতিরিক্ত, যজ্ঞানুষ্ঠানসংক্রান্ত সমারোহ ও নানাদেশীয় বিভিন্নপ্রকার অসংখ্য লোকের একত্র সমাগম অবলোকন করিব, এই কৌতূহলও বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিল।

বাল্মীকিমুখে রামের নাম শ্রবণ করিয়া, সীতার শোকানল প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল নির্গলিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহার অন্তঃকরণে সহসা ভাবান্তর উপস্থিত হইল। রাম সীতাগত-প্রাণ বলিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল; আর তিনি ইহাও স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, নিতান্ত অনায়ত্ত হওয়াতেই রাম তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানবার্ত্তা শ্রবণে,

রাম অবশ্যই ভার্য্যান্তর পরিগ্রহ করিয়াছেন, এই ভাবিয়া তিনি একবারে ম্রিয়মাণ হইলেন। যে সীতা অকাতরে পরিত্যাগদুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন, রাম পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, এই শোক সেই সীতার পক্ষে একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে তিনি মনে ভাবিতেন, যদিও নিতান্ত নিরপরাধে নির্ব্বাসিত হইয়াছি, কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার যেরূপ অবিচলিত স্নেহ ও ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল, তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এক্ষণে স্থির করিলেন, যখন পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই সেই স্নেহের ও অনুরাগের অন্যথাভাব ঘটিয়াছে।

সীতা নিতান্ত আকুল চিত্তে এই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে কুশ ও লব সহসা তদীয় কুটীরে প্রবিষ্ট হইয়া কহিল, মা! মহর্ষি কহিলেন, কল্য আমাদিগকে রাজা রামচন্দ্রের অশ্বমেধদর্শনে লইয়া যাইবেন। যে লোক নিমন্ত্রণপত্র আনিয়াছিল, আমরা কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাহার নিকটে গিয়া রাজা রামচন্দ্রের বিষয়ে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। দেখিলাম, রাজা রামচন্দ্রের সকলই অলৌকিক কাণ্ড! কিন্তু মা! এক বিষয়ে আমরা মোহিত ও চমৎকৃত হইয়াছি। রামায়ণ পাঠ করিয়া তাঁহার উপর আমাদের যে প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল, এক্ষণে সেই ভক্তি সহস্র গুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কথায় কথায় শুনিলাম, রাজা প্রজারঞ্জনানুরোধে নিজ প্রেয়সী মহিষীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তখন, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে বুঝি রাজা পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, নতুবা যজ্ঞানুষ্ঠানকালে সহধর্ম্মিণী কে হইবেক। সে কহিল, যজ্ঞসমাধানার্থ বশিষ্ঠদেব রাজাকে পুনরায় দারপরিগ্রহের জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজা তাহাতে কোন

ক্রমেই সম্মত হন নাই। হিরণ্ময়ী সীতাপ্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, সেই প্রতিকৃতি সহধর্ম্মিণীকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেক। দেখ মা! এমন মহাপুরুষ কোনকালে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। রামচন্দ্র রাজধর্ম্ম-প্রতিপালনে যেমন তৎপর, দাম্পত্যধর্ম্ম-প্রতিপালনেও তদনুরূপ যত্নশীল। আমরা ইতিহাস-গ্রন্থে অনেকানেক রাজার ও অনেকানেক মহাপুরুষের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছি, কিন্তু কেহই কোন অংশে রাজা রামচন্দ্রের সমকক্ষ নহেন। প্রজারঞ্জনানুরোধে প্রেয়সী পরিত্যাগ ও সেই প্রেয়সীর স্নেহে যাবজ্জীবন ভার্য্যান্তরপরিগ্রহে বিমুখ হইয়া কালহরণ করা, এ উভয়ই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। যাহা হউক, মা! রামায়ণ পাঠ করিয়া অবধি আমাদের একান্ত বাসনা ছিল, একবার রাজা রামচন্দ্রকে দর্শন করিব; এক্ষণে সেই বাসনা পূর্ণ করিবার এই বিলক্ষণ সুযোগ ঘটিয়াছে; অনুমতি কর, আমরা মহর্ষির সহিত রামদর্শনে যাই। সীতা অনুমতি প্রদান করিলেন, তাহারাও দুই সহোদরে সাতিশয় হর্ষিত হইয়া মহর্ষি-সমীপে গমন করিল।

রামচন্দ্র পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, এই আশঙ্কা জন্মিবার যে অতি বিষম বিষাদবিষে সীতার সর্ব্বশরীর আচ্ছন্ন হইয়াছিল, হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির কথা শ্রবণ করিয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত এবং তদীয় চিরপ্রদীপ্ত শোকানল অনেক অংশে নির্ব্বাপিত হইল। তখন, তাঁহার নয়নযুগল হইতে আনন্দবাষ্প বিগলিত হইতে লাগিল এবং নির্ব্বাসনক্ষোভ তিরোহিত হইয়া তদীয় হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব সৌভাগ্যগর্ব্ব আবির্ভূত হইল।

পরদিন প্রভাত হইবামাত্র, মহর্ষি বাল্মীকি কুশ, লব ও শিষ্যবর্গ-সমভিব্যাহারে নৈমিশে প্রস্থান করিলেন। দ্বিতীয় দিবস অপরাহ্ণ

সময়ে তথায় উপস্থিত হইলে, বশিষ্ঠদেব পরম সমাদর-প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাঁহাকে ও তাঁহার শিষ্যদিগকে নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে লইয়া গেলেন। কুশ ও লব দূর হইতে রাম দর্শন করিয়া পুলকিত হইল, এবং পরস্পর কহিতে লাগিল, দেখ ভাই! রামায়ণে রাজা রামচন্দ্রের যে সমস্ত অলৌকিক গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা ইঁহার আকারে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে; দেখিলেই অলৌকিক গুণসমুদয়ের একাধার বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে। ইনি যেমন সৌম্যমূর্ত্তি, তেমনই গম্ভীরাকৃতি। আমাদের গুরুদেব যেরূপ অলৌকিক-কবিত্ব-শক্তিসম্পন্ন, রাজা রামচন্দ্র তেমনই অলৌকিক-গুণসমুদয়-সম্পন্ন। বলিতে কি, এরূপ মহাপুরুষ নায়কস্থলে পরিগৃহীত না হইলে, ভগবৎপ্রণীত মহাকাব্যের এত গৌরব হইত না। রাজা রামচন্দ্রের অলৌকিক গুণকীর্ত্তনে নিয়োজিত হওয়াতেই, মহর্ষির অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ সার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছে। যাহা হউক, এত দিনে আমাদের নয়নের চরিতার্থতা লাভ লইল।

ক্রমে ক্রমে যাবতীয় নিমন্ত্রিতগণ সমবেত হইলে, নিরূপিত দিবসে মহাসমারোহে সংকল্পিত মহাযজ্ঞের আরম্ভ হইল। অসংখ্য অসংখ্য দীন দরিদ্র অনাথগণ পৃথক্ পৃথক্ প্রার্থনায় যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে লাগিল। অন্নার্থী অপর্য্যাপ্ত অন্নলাভ, অর্থাভিলাষী প্রার্থনাধিক অর্থলাভ, ভূমিকাঙ্ক্ষী অভিলষিত ভূমিলাভ করিতে লাগিল। ফলতঃ, যে ব্যক্তি যে অভিলাষে আগমন করিতে লাগিল, আগমনমাত্র তাহার সেই অভিলাষ পূর্ণ হইতে লাগিল। অনবরত চতুর্দ্দিকে নৃত্য গীত বাদ্যক্রিয়া হইতে লাগিল। সকলেই মনোহর বেশ ভূষা ধারণ করিল। সকলেরই মুখে আমোদ ও আহ্লাদের সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল; কাহারও

অন্তঃকরণে কোনপ্রকার দুঃখ বা ক্ষোভের সঞ্চার আছে, এরূপ বোধ হইল না। যে সকল দীর্ঘজীবী রাজা, ঋষি বা অস্মাদৃশ লোক যজ্ঞদর্শনে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, আমরা কখন এরূপ যজ্ঞ দর্শন করি নাই; অতীতবেদী ব্যক্তিরাও কহিতে লাগিলেন, কোন কালে কোন রাজা ঈদৃশ সমৃদ্ধি ও সমারোহ-সহকারে যজ্ঞ করিতে পারেন নাই, রাজা রামচন্দ্রের সকলই অদ্ভুত কাণ্ড।

এইরূপে প্রত্যহ মহাসমারোহে যজ্ঞক্রিয়া হইতে লাগিল, এবং যাবতীয় নিমন্ত্রিতগণ, সভায় সমবেত হইয়া, যজ্ঞসংক্রান্ত সমৃদ্ধি ও সমারোহ দর্শন করিতে লাগিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

জাতীয় ভাব—উপক্রমণিকা

কয়েক বৎসর হইল, বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন একটী ইউরোপীয়ের সহিত আমার নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন হইয়াছিল।

তিনি বলিলেন, স্বাধীনতা হারাইয়া জাতীয় ভাব পরিবর্দ্ধনের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

আমি বলিলাম, কোন জিনিস হারাইলে তাহা ত পাইবার জন্য খুঁজিতে হয়—জাতীয় ভাব পরিবর্দ্ধনের যে চেষ্টা, তাহাই কি ঐ হারান জিনিসটীর অনুসন্ধান নয়?

তিনি। কথাটী বেশ সূক্ষ্ম করিয়াই বলিলে বটে। ও-কথার কোন সাক্ষাৎ উত্তর নাই—কিন্তু যাহা অতল জলে পড়িয়া গিয়াছে, অথবা যাহা কখনই হাতে ছিল না, তাহা খুঁজিতে যাওয়া কি বৃথা পরিশ্রম এবং সময় নষ্ট করা নয়? ওরূপে আয়াস করা অপেক্ষা অন্যরূপ চেষ্টা করা ভাল বলিয়াই বোধ হয়।

আমি। অন্য কোন্ দ্রব্যের জন্য অথবা অন্য কোন্ প্রকার চেষ্টা করিতে বলেন, তাহা বলুন, শ্রদ্ধান্বিত হইয়াই শুনিব। কিন্তু আমরা যাহা খুঁজিতেছি, তাহা যে অতল জলে পড়িয়াছে, তাহা ত জলে নামিয়া না দেখিলে নিশ্চয় হইতে পারে না। আর যে জিনিসটা হারাইয়া গিয়াছে মনে করিতেছি, তাহা যে পূর্ব্বে হাতে ছিল না, তাহাই বা কেমন করিয়া মনে করিব। ও-জিনিসটা এমন যে, উহা হারাইয়াছে, মনে করিলেই, উহা যে হাতে ছিল, তাহার প্রমাণ হয়।

তিনি। তোমায় আমায় আর ওরূপ ছেঁদো কথায় কাজ নাই। আমি নিজ জীবনবৃত্তের কিঞ্চিৎ বলিতেছি, তাহা শুনিলেই আমার মনের সকল ভাব বুঝিতে পারিবে। আমার জন্মস্থান আয়র্লণ্ড দ্বীপ—আমার পিতা রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন—আমি ডব্‌লিন নগরে একটী কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম—১৮৪৮ অব্দে সমুদয় ইউরোপ ব্যাপক যে রাষ্ট্র-বিপ্লব হইয়াছিল, সেই বিপ্লবের একটা ঢেউ আয়র্লণ্ডে আসিয়া লাগে এবং তথায় উপদ্রব জন্মায়। আমি কয়েকজন সমাধ্যায়ীর সহিত ঐ উপদ্রবে যোগ দিয়াছিলাম। আমাদের মনে জাতীয় ভাবের অত্যধিক উদ্রেক হইয়াছিল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ঐ উপদ্রব শান্ত করিলেন। আমি জেলে গেলাম। পরে জেল হইতে পলাইয়া ফরাসিদিগের দেশে আশ্রয় লাভ করিয়া বহু বৎসর ঐ দেশে বাস করিয়াছিলাম। অনন্তর ইংলণ্ডে আসিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হই, এবং বয়োবৃদ্ধি-সহকারে আমার এই প্রতীতি জন্মে যে, আমার হৃদয়স্থিত সংকীর্ণ আইরিস জাতীয় ভাবটী, সুবিস্তীর্ণ ব্রিটিস জাতীয় ভাবে পর্য্যবসিত হওয়াই উচিত। এখন তাহাই হইয়াছে, এবং তাহা হইয়াছে বলিয়াই বলিতেছি যে, তোমাদিগেরও এই উত্থানোন্মুখ ভারতবর্ষীয় ভাব ব্রিটিস জাতীয় ভাবে পর্য্যবসিত হওয়া বিধেয়!

আমি। আপনার জীবনবৃত্তের যে ব্যাপারগুলি শুনিলাম, তাহাতে দুইটী তথ্য উপলব্ধ হইল। এক তথ্য এই যে, আপনি আমাদিগের মনের ভাব অনেকটা বুঝিতে পারিবেন। দ্বিতীয় তথ্য এই যে, অনেকটাই বুঝিতে পারিবেন না। বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাই, একেবারে ইংরাজের জিনিস হইয়া

যাইতে চাহি না। বুঝিতে পারিবেন না যে, আমরা ইংলণ্ড হইতে স্বাতন্ত্রিকতা চাহি না, অন্ততঃ বহুকালের জন্য তাহা চাহি না। আপনাদের মনে যেমন জাতীয় ভাবের উদ্রেক হয়, অমনি আপনারা ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বসেন। আমাদের মনে জাতীয় ভাবের উদ্রেকে আমরা রাজবিদ্রোহ করিতে চাই না।—আমরা বেশী করিয়া ইংরাজী শিখি, বেশী করিয়া সংস্কৃতের সমাদর করি, কাজকর্ম্ম এমন যত্ন এবং শ্রম-সহকারে নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করি, যাহাতে ইংরাজ রাজপুরুষেরাও আমাদিগের দ্বারা পরাস্ত হয়েন। স্বজাতীয় কোন মনিবের অধীনে থাকিয়া যদি চাকুরি করিতে হয়, তাহা বিশেষ যত্ন এবং পরিশ্রম-সহকারে নির্ব্বাহ করি। মুসলমানকে নেড়ে বলিয়া পশ্চিমে লোককে মেড়ুয়া বলিয়া দক্ষিণাঞ্চলবাসীদিগকে কদাকার বলিয়া অশ্রদ্ধা করা অতিশয় দুষ্য মনে করি—আর সন্তান-সন্ততিকে দৃঢ়কায়, পরিশ্রমী, বিদ্বান্ এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও স্বজাতির মুখাপেক্ষী করিবার নিমিত্ত নিরন্তর প্রাণপণ যত্ন করি।

তিনি। ঐগুলি ত অতি সাধারণ কাজ বলিয়াই বোধ হয়। স্বজাতিবৎসল না হইলে কেহ স্বদেশবৎসল হইতে পারেন না। ঐ সকল কাজে জাতীয় ভাব বর্দ্ধনের উপায় হয় বটে, কিন্তু জাতীয় ভাব উৎপাদনে উহাদিগের তেমন বিশেষ উপযোগিতা নাই। রাজনীতিক বিষয়ে বিচার করিবার জন্য সভা স্থাপন করা—প্রকাশ্যে বক্তৃতা করা—পুস্তিকা বিরচন করা, এই সকল কার্য্যের প্রতি তুমি কি আস্থাশূন্য ?

আমি। ও-সকল কাজে আমার আস্থা নাই, এমত নহে, তবে ওগুলির প্রতি আপনাদিগের যতটা আস্থা আছে বলিয়া

মনে করি, আমার আস্থা, বোধ হয় তত অধিক নয়। ওগুলি ইংরাজাধিকারে ইংরাজী শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল, এবং নিরবচ্ছিন্ন অনুচিকীর্ষা-প্রসূত, এই জন্য কিয়ৎ পরিমাণে অবশ্যই অন্তঃসারশূন্য। আমি দুইটী দৃষ্টান্ত-দ্বারা দেখাইতেছি, বক্তৃতাদি-দ্বারা আন্দোলনের ফল কিরূপ হয়। প্রথমটী সফল আন্দোলনের দৃষ্টান্ত। কোন সময়ে ইংরাজ-ভূম্যধিকারিগণের পক্ষপাতী ব্যবস্থার বলে ইংলণ্ডে বৈদেশিক শস্যের আমদানী বন্ধ ছিল। সেই ব্যবস্থা রহিত করিলে ইংলণ্ডের প্রজাসাধারণের উপকার হইবে, এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য কব্‌ডেন সাহেব সভা সংস্থাপন, প্রকাশ্যে বক্তৃতা প্রদান, এবং পুস্তিকা রচনাদি ক ৎপরোনাস্তি প্রয়াস পাইয়াছিলেন। পরিশেষে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে মন্ত্রিদল অগত্যা তাঁহার মতানুবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এ স্থলে ইংরাজে ইংরাজে কথা, অর্থাৎ লাভের ভাগীও ইংরাজ, আর লোকসানের ভাগীও ইংরাজ—আবার তাহাতে একটী দুর্ভিক্ষের সমাগম। যদি এরূপ মণিকাঞ্চনযোগ উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে কি কব্‌ডেন াহেবের কৃত আন্দোলনের কোন ফল দর্শিত? দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটী একটী বিফল আন্দোলনের। এই আন্দোলনের ক্ষেত্র আপনারই জন্মভূমি আয়র্লণ্ড। এই আন্দোলনের কর্ত্তা কব্‌ডেনের অপেক্ষাও শতগুণে শ্রেষ্ঠ—বাগ্মিবর ওকোনেল সাহেব। আয়র্লণ্ডের কাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত আবালবৃদ্ধবনিতা যাবতীয় ব্যক্তি ওকোনেলকে দেবতুল্য ভক্তি করিত—দুই দিন, চারি দিন, দশ দিনের পথ হইতে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসিত; তিনি হুকুম করিয়া পাঠাইলেই কাথলিক যাজকগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া সমভিব্যাহারে আনিত, ও লইয়া যাইত। তাঁহার

অনুচরের এবং পারিষদের কোন অভাব ছিল না।—তিনি সমস্ত আয়র্লণ্ডের একাধিপতির স্বরূপ হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎকৃত রাজনীতিক আন্দোলনের ফল কি হইল? পুলিশ হইতে যেমন পরওয়ানা বাহির হইল, অমনি লোকসমাগম থামিল—রাজ্যের উপদ্রাবক বলিয়া মহাত্মা ওকোনেল আদালতে অভিযুক্ত হইলেন—তিনি জেলে গেলেন—কয়েক বর্ষ সেইখানে থাকিতে থাকিতেই তাঁহার বল, বুদ্ধি, স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, বাগ্মিতা সকলই বিলুপ্ত হইয়া গেল—তিনি পরে দেশত্যাগী হইয়া বন্ধুবান্ধববিহীন পররাজ্যে দেহত্যাগ করিলেন।

তিনি। ওকোনেল নিজের দোষেই সকল হারাইয়াছিলেন। তিনি যেমন বাগ্মিপ্রধান যদি তেমনি কার্য্যকুশল হইতেন, তবে আর দেশের লোকেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিত না। আয়র্লণ্ড অবশ্য স্বাধীনতা লাভ করিত।

এই কথাগুলি বন্ধুবর কিছু ব্যগ্রতা-সহকারে এবং একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু কথাগুলি তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইবামাত্র বুঝিতে পারিলেন যে, এখনও তাঁহার নিজের মন হইতে জাতীয় ভাবটী অপনীত হয় নাই। সেই যৌবনাবস্থার—সেই ৪৮ অব্দের অগ্নি এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই—উহা এত দিনের পর ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

সেকাল আর একাল

অদ্যকার বক্তৃতার বিষয় "সেকাল আর একাল।" ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকালেজ এই মহানগরে সংস্থাপিত হয়। ১৮৩০ সালে ঐ বিদ্যালয়ের প্রথম ফল ফলে। ঐ বৎসরে কতকগুলি যুবক ইংরাজীতে কৃতবিদ্য হইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। তাঁহারা সেই সময়ে ইউরোপীয় বিদ্যার আলোক লাভ করিয়া সমাজসংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। সেই সময়ে একটি নূতন ভাব হিন্দুসমাজে প্রবিষ্ট হয়। ইংরাজী আমলের প্রথম হইতে হিন্দুকালেজ সংস্থাপন পর্য্যন্ত যে সময় তাহা "সেকাল" এবং তাহার পরের কাল "একাল" শব্দে নির্দ্ধারণ করিলাম।

সেকালের বিষয় বলিতে হইলে সেকালের সাহেবদের বিষয় অগ্রে বলিতে হয়। আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বাঙ্গালীদের বিষয়ে বলিতে গিয়া সাহেবদের কথা প্রথমে বলা হয় কেন? তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে। সাহেবেরা আমাদিগের শাসনকর্ত্তা ও তাঁহাদের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সাহেবদের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা জন্য, সেকালের সাহেবেরা কি প্রকৃতির লোক ছিলেন ও সেকালের বাঙ্গালীদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা না জানিলে সেকালের বাঙ্গালীদের অবস্থা ভাল জানা যাইতে পারে না, অতএব সেকালের সাহেবদিগের বর্ণনা করা কর্ত্তব্য। সেকালের সাহেবদিগের সর্ব্বাগ্রে বর্ণনা করা কর্ত্তব্য। সাহেবেরা আমাদিগের

রাজা। রাজার সম্মান অগ্রে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। সেকালে সাহেবেরা অর্দ্ধেক হিন্দু ছিলেন। পূর্ব্বে মুসলমানেরা এই ভারতবর্ষকে আপনাদের গৃহস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের অনুরাগ এইখানেই বদ্ধ থাকিত। ইংরাজের আমলের প্রথম সাহেবেরা অনেক পরিমাণে ঐরূপ ছিলেন। তাহার এক কারণ এই, তখন বিলাতে যাতায়াতের এমন সুবিধা ছিল না। যাঁহারা এখানে আসিতেন, তাঁহাদের সর্ব্বদা বাটী যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। আর এক কারণ এই, তাঁহারা অতি অল্প লোকই এখানে থাকিতেন; সুতরাং এখানকার লোকদিগের সহিত তাঁহারা অনেক পরিমাণে এ দেশীয়দের আচার ব্যবহার পালন করিতেন। তখন সকাল বিকাল কাছারী হইত, মধ্যাহ্নকালে সকলে বিশ্রাম করিত। মধ্যাহ্নকালে কলিকাতা দ্বিপ্রহরা রজনীর ন্যায় নিস্তব্ধ হইত। তখনকার সাহেবেরা পান খেতেন, আল্‌বোলা ফুঁকৃতেন, বাইনাচ দিতেন ও হুলি খেল্‌তেন। ষ্টুয়ার্ট নামে একজন প্রধান সৈনিক সাহেব ছিলেন, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ছিল। তজ্জন্য অন্যান্য সাহেবেরা তাঁহাকে হিন্দু ষ্টুয়ার্ট বলিয়া ডাকিত। তাঁহার বাটীতে শালগ্রামশিলা ছিল। তিনি প্রত্যহ পূজারী ব্রাহ্মণের দ্বারা তাঁহার পূজা করাইতেন। বাল্যকালে শুনিতাম, কালীঘাটের কালীর মন্দিরে প্রথমে কোম্পানীর পূজা হইয়া, তৎপরে অন্যান্য লোকের পূজা হইত। ইহা সত্য না হইতে পারে, কিন্তু ইহা-দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, তৎকালের সাহেবেরা বাঙ্গালীদের সহিত এতদূর ঘনিষ্ঠতা করিতেন যে, তাঁহাদিগের ধর্ম্মের পর্য্যন্ত অনুমোদন করিতেন। একালেও গবর্ণর জেনেরল লর্ড এলেনবরা সাহেব বাহাদুর আফগানিস্থানের

যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি স্থানের প্রধান প্রধান দেবালয়ে দান করিয়া আসিয়াছিলেন। সেকালের সাহেবেরা আমলাদের উপর এমন সদয় ছিলেন যে, শুনা গিয়াছে, তাঁহারা তাঁহাদের দেওয়ানদের বাটীতে গিয়া তাঁহাদের ছেলেদিগকে হাঁটুর উপর বসাইয়া আদর করিতেন ও চন্দ্রপুলি খাইতেন। তাঁহারা অন্যান্য আমলাদের বাসায়ও যাইয়া, কে কেমন আছে, জিজ্ঞাসা করিতেন। এখন সে কাল গিয়াছে। এখনকার সাহেবদিগকে দেখিলে, তাঁহাদিগকে সেই সকল সাহেবদের হইতে এক স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া বোধ হয়। ইঁহাদের আর এদেশীয়দের সহিত সেরূপ ব্যথার ব্যথিত্ব নাই, তাঁহাদের প্রতি তাঁহাদিগের সেরূপ স্নেহ নাই, সেরূপ মমতা নাই। অবশ্য অনেক সদাশয় ইংরাজ আছেন, যাঁহারা এই কথার ব্যভিচারস্থল-স্বরূপ। কিন্তু আমি যেরূপ বর্ণনা করিলাম, এরূপ সাহেবই অধিক। পূর্ব্বে যে সকল ইংরাজ মহাপুরুষেরা এখানে আসিয়া এদেশের যথেষ্ট উন্নতি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নাম এদেশীয়দের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। কোন উদ্ভট-কবিতাকার হিন্দুদিগের প্রাতঃস্মরণীয় স্ত্রীলোকদিগের নাম যে শ্লোকে উল্লিখিত আছে, তাহার পরিবর্ত্তে সে কালের কতিপয় ইংরাজ মহাত্মার নাম উল্লেখ করিয়া একটি শ্লোক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আদর্শ ও নকল দুইটি শ্লোকই নিম্নে লিখিত হইল।

আদর্শ

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চ কন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্॥

নকল

হেয়ার্ কল্বিন্ পামরশ্চ কেরি মার্শমেনস্তথা।
পঞ্চ গোরাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥

এই সকল মহাপুরুষদিগের বিষয় মহাশয়েরা অনেকেই অবগত আছেন। ডেবিড হেয়ার এই দেশে ঘড়ীর ব্যবসায়-দ্বারা লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার স্বদেশ স্কট্‌লণ্ডে ফিরিয়া না গিয়া সেই সমস্ত অর্থ এতদ্দেশীয় লোকের হিতসাধনে ব্যয় করিয়া পরিশেষে দরিদ্রদশায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে এতদ্দেশীয়দের ইংরাজী শিক্ষার প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি হেয়ার-স্কুল সংস্থাপন করেন ও হিন্দু-কালেজ সংস্থাপনের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। আমি একজন তাঁহার ছাত্র ছিলাম। আমি যেন দেখিতেছি, তিনি ঔষধ হস্তে লইয়া পীড়িত বালকের শয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, অথবা যেখানে যাত্রা হইতেছে, তথায় হঠাৎ আসিয়া অভিনেতা বালককে নীচ আমোদক্ষেত্র হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছেন। কল্বিন্ সাহেব এই কলিকাতা নগরের একজন প্রধান সওদাগর ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরোপকারী ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পুত্র উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লেফ্‌টেনণ্ট গবর্ণর হইয়াছিলেন। তিনি সিপাইদের বিদ্রোহের সময় অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। তিনিও একজন অতি দয়াশীল ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। এতদ্দেশীয়দের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ স্নেহ ছিল। জন পামরকে লোকে "Prince of Merchants" অর্থাৎ সওদাগরদের রাজা বলিয়া ডাকিত। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার গোরের উপরে

"Here lies John Palmer, friend of the poor."—"এখানে দরিদ্র-জন-বন্ধু জন পামর আছেন," কেবল এই বাক্যটি লিখিত হইয়াছিল। কেরি ও মার্শমেন সাহেব খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন। তাঁহারা শ্রীরামপুরে বাস করিতেন। তাঁহারা বাঙ্গালা অভিধান, বাঙ্গালা সংবাদপত্র ও উন্নত প্রণালীর বাঙ্গালা পাঠশালার সৃষ্টিকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারা অনেক প্রকারে বঙ্গদেশের মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। সেকালের এই সকল মহান্তঃকরণ সাহেবেরা চিরকাল বাঙ্গালীদিগের স্মৃতিক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকিবেন তাহার সন্দেহ নাই।

অতঃপর সেকালের বাঙ্গালীদের বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। সে কালের বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লোকদিগের বর্ণনা করিতে গেলে আমাদের দৃষ্টি গুরুমহাশয়ের উপর প্রথম পতিত হয়। গুরুমহাশয়দিগের শিক্ষাপ্রণালী উন্নত ছিল না এবং তাঁহাদের অবলম্বিত ছাত্রদিগের দণ্ডের বিধানটি বড় কঠোর ছিল। নাড়ুগোপাল অর্থাৎ হাঁটু গাড়িয়া বসাইয়া হাতে প্রকাণ্ড ইষ্টক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রাখানো, বিছুটি গায়ে দেওয়া ইত্যাদি অনেক প্রকার নির্দ্দয় দণ্ড প্রদানের রীতি প্রচলিত ছিল। পাঁচ বৎসর বয়স হইতে দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তালপাতে; তারপর পনর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কলার পাতে; তারপর কুড়ি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কাগজে লেখা হইত। সামান্য অঙ্ক কষিতে, সামান্য পত্র লিখিতে আর গুরুদক্ষিণা ও দাতাকর্ণ নামক পুস্তক পড়িতে সমর্থ করা, গুরুমহাশয়দিগের শিক্ষার শেষ সীমা ছিল। গুরুমহাশয় অতি ভীষণ পদার্থ ছিলেন। আমার স্মরণ হয়, আমি যখন গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পাঠ করিতাম, তখন

রামনারায়ণ নামে আমার একজন সহাধ্যায়ী ছিলেন। তিনি কোন দোষ করিলে, গুরুমহাশয় যখন রামনারায়ণ! বলিয়া ডাকিতেন, তখন তাঁহার ভয়সূচক একটি শারীরিক ক্রিয়া হইত।

গুরুমহাশয়ের পর আখন্‌জীর বর্ণনা করা কর্ত্তব্য। আখন্‌জী অতি অদ্ভুত পদার্থ ছিলেন। মনে করুন হিন্দুর বাটীর একটি ঘরে মুসলমানের বাসা। তিনি তথায় বৃহদাকার বদ্‌না ও স্তূপাকার পেঁয়াজ লইয়া বসিয়া আছেন। সাগ্‌রেদ্‌রা নিয়ত বশবর্ত্তী। চাকর-দ্বারা জল আনয়ন কার্য্য করিয়া লওয়া আখন্‌জীর মনঃপূত হইত না। তাঁহার সাগ্‌রেদ্‌দিগকে কলসী লইয়া জল আনিয়া দিতে হইত। তখন পারশী পড়ার বড় ধূম। তখন পারশী পড়াই এতদ্দেশীয়দিগের উচ্চতম শিক্ষা বলিয়া পরিগণিত হইত। এই পারশী ভাষা সকল আদালতে চলিত ছিল। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তাহার ব্যবহার আদালতে রহিত হয়। পন্দ-নামা, গোলেস্তা, বোস্তা, জেলেখা, আল্লামী প্রভৃতি পুস্তক সাধারণ পাঠ্য পুস্তক ছিল। কেহ কেহ আরবী ব্যাকরণ একটু একটু পাঠ করিতেন। আখন্‌জীরা পারশীর উচ্চারণ অতি বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

অতঃপর সেকালের ভট্টাচার্য্যগণ আমাদিগের বর্ণনার বিষয় হইতেছেন। তখনকার ভট্টাচার্য্যগণ অতি সরলস্বভাব ছিলেন। এখনকার ভট্টাচার্য্যগণ যেমন বিষয়বুদ্ধিতে বিষয়ী লোকের ঘাড়ে যান, সেকালের ভট্টাচার্য্যেরা সেরূপ ছিলেন না। তাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্র অতি প্রগাঢ় রূপে জানিতেন এবং অতি সরল ও সদাশয় ছিলেন। সেকালের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমকালবর্ত্তী রামনাথ নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি

নবদ্বীপের নিকটস্থ একটি গ্রামে বাস করিতেন। তিনি রাজ-সভাবিচরণকারী চাটুকার ভট্টাচার্য্যদিগের ন্যায় সভ্যতার নিয়ম পরিজ্ঞাত ছিলেন না। এই জন্য লোকে তাঁহাকে বুনো রামনাথ বলিয়া ডাকিত। একদিন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অমাত্য-সমভি-ব্যাহারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। রাজা তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে কিছু অর্থ সাহায্য করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু তাঁহার কি প্রয়োজন তাহা জানিতে হইবে, এজন্য ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের কিছু অনুপপত্তি আছে?" এখন, ন্যায়শাস্ত্রে অনুপপত্তির অর্থ, যাহার কোন সিদ্ধান্ত হয় না। ভট্টাচার্য্য তাহাই বুঝিয়া লইলেন এবং বলিলেন, "কৈ না, আমার কিছুই অনুপপত্তি নাই।" রাজা তাহা বুঝিতে পারিয়া অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের কিছু অসঙ্গতি আছে?" এখন, অসঙ্গতি শব্দের ন্যায়শাস্ত্রোল্লিখিত অর্থ অসমন্বয়। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "না, কিছুই অসঙ্গতি নাই, সকলই সমন্বয় করিতে সমর্থ হইয়াছি।" রাজা দেখিলেন, মহা মুস্কিল। তখন তিনি স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাংসারিক বিষয়ে আপনার কোন অনটন আছে?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "না, কিছুই অনটন নাই; আমার কয়েক বিঘা ভূমি আছে, তাহাতে যথেষ্ট ধান্য উৎপন্ন হয়, আর সম্মুখে এই তিন্তিড়ী বৃক্ষ দেখিতেছেন, ইহার পত্র আমার গৃহিণী দিব্য পাক করেন, অতি সুন্দর লাগে, আমি স্বচ্ছন্দে তাহা দিয়া অন্ন আহার করি।"

আমি আশ্চর্য্য বোধ করি যে, এমন সরল সাধু সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তিকে লোকে বুনো বলিত। ইনি যদি বুনো তবে সভ্য কে?

আর এক ভট্টাচার্য্য ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী ডাইল পাক করিতেছিলেন। তিনি স্বামীকে রন্ধনশালায় বসাইয়া পুষ্করিণীতে জল আনিতে গেলেন। এদিকে ডাইল উথলিয়া উঠিল। ভট্টাচার্য্য দেখিলেন, বিষম বিপদ্। ডাইল উথলিয়া পড়া কি প্রকারে নিবারণ করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া হাতে পইতা জড়াইয়া পতনোন্মুখ ডাইলের অব্যবহিত উপরিস্থ শূন্যে তাহা স্থাপন করিয়া চণ্ডীপাঠ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাহা নিবারিত হইল না। এমন সময় তাঁহার ব্রাহ্মণী পুষ্করিণী হইতে ফিরিয়া আইলেন। তিনি কহিলেন, "এ কি? ইহাতে একটু তেল ফেলিয়া দিতে পার নাই?" এই বলিয়া তিনি ডাইলে একটু তেল ফেলিয়া দিলেন। ডাইলের উথলিয়া পড়া নিবারিত হইল। এই ব্যাপার দেখিয়া ভট্টাচার্য্য গললগ্নবাস হইয়া করযোড়ে ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "তুমি কে আমার গৃহে অধিষ্ঠিতা বল; অবশ্য কোন দেবী হইবে, নতুবা এই অদ্ভুত ব্যাপার কি প্রকারে সাধন করিতে পারিলে?" যদ্যপি এই গল্পে বাহুল্য-বর্ণনার সুস্পষ্ট চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে, তথাপি উহা যে সে কালের ভট্টাচার্য্যদিগের অসামান্য সারল্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

ভট্টাচার্য্যদিগের অবৈষয়িকতার আর একটি সুন্দর গল্প আছে। এক জন ভট্টাচার্য্য পুথি পড়িতেছিলেন; পড়িতে পড়িতে অনেক রাত্রি হইলে তাঁহার তামাক খাইবার বড় ইচ্ছা হইল। তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় একখানি টিকা লইয়া বাটীর বাহির হইলেন। দেখিলেন দূরে একটা পাঁজা পুড়িতেছে। তিনি আস্তে আস্তে সেই স্থানে টিকা ধরাইতে উপস্থিত হইলেন,

কিন্তু ঘরে যে প্রদীপ জ্বলিতেছিল তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

অতঃপর সেকালের রাজকর্ম্মচারীদিগের বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইংরাজের আমলের প্রথমে আমলাদিগের বড় প্রাদুর্ভাব ছিল। এক এক জন আমলার উপর অনেক কর্ম্মের ভার থাকিত। তাঁহারা অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন। এক এক জন দেওয়ান বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ঢাকা নগরের এক জন দেওয়ানের কথা এইরূপ শুনা যায়, তিনি আহারের সময় একটি প্রকাণ্ড ঘণ্টা বাজাইয়া দিতেন, নগরের সমুদায় বাসাড়ে লোক সেই ঘণ্টার রব শুনিয়া তাঁহার বাসায় আসিয়া আহার করিত। তখন ঐ সকল পদ এক প্রকার বংশপরম্পরাগত ছিল। এক জন দেওয়ানের মৃত্যু হইলে প্রায়ই তাঁহার সন্তান অথবা অন্য কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয় লোক দেওয়ান হইত। শুনা আছে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামবাসী এক দেওয়ানের মৃত্যুর পর তাঁহার সপ্তদশ-বৎসর-বয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাণের মাকড়ী ও হাতের বালা খুলিয়া দেওয়ানী করিতে গেলেন। সাহেবেরা তাঁহাদিগের দেওয়ানদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সে সময়ে উৎকোচ লইবার বাড়াবাড়ি ছিল। শুদ্ধ বাঙ্গালীরা যে উৎকোচ লইতেন এমন নহে, বড় বড় সাহেবেরাও উৎকোচ লইতেন। এখন সেরূপ নহে। এ বিষয়ে অবশ্যই উন্নতি দেখিতেছি।

পরিশেষে সেকালের ধনী লোকদিগের বর্ণনা করা হইতেছে। ইঁহারা অত্যন্ত বদান্য ছিলেন। পুষ্করিণী খননাদি পূর্ত্তকর্ম্মে

তাঁহারা বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তাঁহারা সন্ন্যাসী ও দরিদ্রদিগকে বিলক্ষণ দান করিতেন। তাঁহারা অতিথিসেবায় তৎপর ছিলেন। তাঁহারা গুণী লোকদিগকে বিলক্ষণরূপে পালন করিতেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ গায়কদিগকে বিশিষ্ট অর্থানুকূল্য করিতেন। কোন কোন স্থলে উপযুক্ত পাত্রে তাঁহাদিগের দানশীলতা প্রযোজিত হইত না বটে, কিন্তু তাঁহারা যে অত্যন্ত বদান্য ছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

রাজনারায়ণ বসু।

আমার দুর্গোৎসব

(শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর উক্তি)

সপ্তমী পূজার দিন কে আমাকে এত আফিঙ্গ চড়াইতে বলিল! আমি কেন আফিঙ্গ খাইলাম! আমি কেন প্রতিমা দেখিতে গেলাম! যাহা কখন দেখিব না, তাহা কেন দেখিলাম! এ কুহক কে দেখাইল!

দেখিলাম—অকস্মাৎ কালের স্রোত দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে—আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। দেখিলাম—অনন্ত, অকূল, অন্ধকারে, বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোত—মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে—আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—'মা! মা!' করিয়া ডাকিতেছি। আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা? কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা? হাঁ, এই মা! চিনিলাম, এই আমার জননী—জন্মভূমি—এই—মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা—

এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত—পদাশ্রিত বীরজন-কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না—কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা-প্রহরণপ্রহারিণী শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ-বিহারিণী,—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞান-মূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।

কোথায় ফুল পাইলাম, বলিতে পারি না—কিন্তু সেই প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম,—ডাকিলাম, সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে, আমার সর্ব্বার্থসাধিকে! অসংখ্যসন্তানকুল-পালিকে! ধর্ম্ম-অর্থ-সুখ-দুঃখ-দায়িকে! আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর। এই ভক্তি-প্রীতি-বৃত্তি-শক্তি করে লইয়া তোমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি, তুমি এই অনন্তজলমণ্ডল ত্যাগ করিয়া এই বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি একবার জগৎসমীপে প্রকাশ কর। এসো মা! নবরাগরঙ্গিণি, নববলধারিণি, নবদর্পে দর্পিণি, নবস্বপ্নদর্শিনি!—এসো মা, গৃহে এসো—ছয় কোটি সন্তানে একত্রে এককালে, দ্বাদশ কোটি কর যোড় করিয়া তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয় কোটি মুখে ডাকিব,—মা প্রসূতি অম্বিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্যদায়িকে! নগাঙ্ক-শোভিনি নগেন্দ্রবালিকে! শরৎসুন্দরি চারুপূর্ণচন্দ্রভালিকে! ডাকিব,—সিন্ধু-সেবিতে সিন্ধু-পূজিতে সিন্ধু-মথনকারিণি! শত্রুবধে দশভুজে দশপ্রহরণধারিণি অনন্তশ্রী অনন্তকাল-স্থায়িনি! শক্তি দাও সন্তানে, অনন্তশক্তি-প্রদায়িনি! তোমায় কি বলিয়া ডাকিব

মা? এই ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব—এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এসো মা, গৃহে এসো—যাঁহার ছয় কোটি সন্তান, তাঁহার ভাবনা কি?

দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—সেই অনন্ত কাল-সমুদ্রে সেই প্রতিমা ডুবিল! অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল, জলকল্লোলে বিশ্বসংসার পূরিল! তখন যুক্তকরে সজল-নয়নে ডাকিতে লাগিলাম, উঠ মা হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবি দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা, একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা!

উঠ উঠ মা! উঠ বঙ্গজননি! মা উঠিলেন না। উঠিবেন না কি?

এসো ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই! এসো আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি। এসো, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্র মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে —চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে এই কাল-সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব, মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি? আইস, প্রতিমা তুলিয়া আনি, বড় পূজার ধূম বাধিবে। দ্বেষক-ছাগকে হাড়িকাঠে ফেলিয়া সৎকীর্ত্তি-খড়্গে

মায়ের কাছে বলি দিব—কত পুরাবৃত্তকার-ঢাকী ঢাক ঘাড়ে করিয়া বঙ্গের বাজনা বাজাইয়া আকাশ ফাটাইবে—কত ঢোল, কাঁসি, কাড়ানাগরায় বঙ্গের জয় বাদিত হইবে। কত সানাই পোঁ ধরিয়া গাইবে, "কত নাচ গো।"—বড় পূজার ধূম বাধিবে। কত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত লুচি-মণ্ডার লোভে বঙ্গপূজায় আসিয়া পাতড়া মারিবে—কত দেশ-বিদেশী ভদ্রাভদ্র আসিয়া মায়ের চরণে প্রণামি দিবে—কত দীন-দুঃখী প্রসাদ খাইয়া উদর পূরিবে! কত নর্ত্তকী নাচিবে, কত গায়কে মঙ্গল গায়িবে, কত কোটি ভক্তে ডাকিবে, মা! মা! মা!

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কপালকুণ্ডলা

স্তূপশিখরে

যখন নবকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন রজনী গভীরা। এখনও যে তাঁহাকে ব্যাঘ্রে হত্যা করে নাই, ইহা তাঁহার আশ্চর্য্য বোধ হইল। ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন, ব্যাঘ্র আসিতেছে কি না। অকস্মাৎ সম্মুখে বহুদূরে একটা আলোক দেখিতে পাইলেন। পাছে ভ্রম জন্মিয়া থাকে, এজন্য নবকুমার মনোনিবেশপূর্ব্বক তৎপ্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আলোক-পরিধি ক্রমে বর্দ্ধিতায়ন এবং উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল—আগ্নেয় আলোক বলিয়া প্রতীতি জন্মিল; প্রতীতিমাত্র নবকুমারের জীবনাশা পুনরুদ্দীপ্ত হইল। মনুষ্যসমাগম ব্যতীত এ আলোকের উৎপত্তি সম্ভবে না। কেন না, এ দাবানলের সময় নহে। নবকুমার গাত্রোত্থান করিলেন; যথায় আলোক, সেই দিকে ধাবিত হইলেন। একবার মনে ভাবিলেন, "এ আলোক ভৌতিক।—হইতেও পারে; কিন্তু শঙ্কায় নিরস্ত থাকিলেই কোন্ জীবন-রক্ষা হয়?" এই ভাবিয়া নির্ভীকচিত্তে আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। বৃক্ষ, লতা, বালুকাস্তূপ পদে পদে তাঁহার গতিরোধ করিতে লাগিল। বৃক্ষলতা দলিত করিয়া, বালুকাস্তূপ লঙ্ঘিত করিয়া নবকুমার চলিলেন। আলোকের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন যে, এক অত্যুচ্চ বালুকাস্তূপের শিরোভাগে অগ্নি জ্বলিতেছে, তৎপ্রভায় শিখরাসীন মনুষ্যমূর্ত্তি আকাশপটস্থ চিত্রের ন্যায় দেখা

যাইতেছে। নবকুমার শিখরাসীন মনুষ্যের সমীপবর্ত্তী হইবেন স্থিরসঙ্কল্প করিয়া অশিথিলীকৃত বেগে চলিলেন। পরিশেষে স্তূপারোহণ করিতে লাগিলেন। তখন কিঞ্চিৎ শঙ্কা হইতে লাগিল—তথাপি কম্পিতপদে স্তূপারোহণ করিতে লাগিলেন। আসীন ব্যক্তির সম্মুখবর্ত্তী হইয়া যাহা যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার রোমাঞ্চ হইল। তিষ্ঠিবেন কি প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

শিখরাসীন মনুষ্য নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছিল—নবকুমারকে প্রথমে দেখিতে পাইল না। নবকুমার দেখিলেন, তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর হইবে। পরিধানে কোন কার্পাসবস্ত্র আছে কি না, তাহা লক্ষ্য হইল না; কটিদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত শার্দ্দূল-চর্ম্মে আবৃত। গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা; আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজটা-পরিবেষ্টিত। সম্মুখে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলিতেছিল; সেই অগ্নির দীপ্তি লক্ষ্য করিয়া নবকুমার সে স্থলে আসিতে পারিয়াছিলেন। নবকুমার একটা বিকট দুর্গন্ধ পাইতে লাগিলেন; ইহার আসন-প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার কারণ অনুভূত করিতে পারিলেন। জটাধারী এক ছিন্নশীর্ষ গলিত শবের উপর বসিয়া আছেন। আরও সভয়ে দেখিলেন যে, সম্মুখে নরকপাল রহিয়াছে; তন্মধ্যে রক্তবর্ণ দ্রবপদার্থ রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে—এমন কি, যোগাসীনের কণ্ঠস্থ রুদ্রাক্ষমালা-মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড গ্রথিত রহিয়াছে। নবকুমার মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রহিলেন। অগ্রসর হইবেন কি স্থানত্যাগ করিবেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কাপালিকদিগের কথা শ্রুতছিলেন, বুঝিলেন যে, এ ব্যক্তি কাপালিক।

যখন নবকুমার উপনীত হইয়াছিলেন, তখন কাপালিক মন্ত্রসাধনে বা জপে বা ধ্যানে মগ্ন ছিল, নবকুমারকে দেখিয়া ভ্রূক্ষেপও করিল না। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, "কস্ত্বং?" নবকুমার কহিলেন, "ব্রাহ্মণ।"

কাপালিক কহিল, "তিষ্ঠ।" এই কহিয়া পূর্ব্বকার্য্যে নিযুক্ত হইল। নবকুমার দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এইরূপে প্রহরার্দ্ধ গত হইল। পরিশেষে কাপালিক গাত্রোত্থান করিয়া নবকুমারকে পূর্ব্ববৎ সংস্কৃতে কহিল, "মামনুসর।"

ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, অন্য সময়ে নবকুমার কদাপি ইহার সঙ্গী হইতেন না। কিন্তু এক্ষণে ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ কণ্ঠাগত; অতএব কহিলেন, "প্রভুর যেমত আজ্ঞা। কিন্তু আমি ক্ষুধাতৃষ্ণায় বড় কাতর, কোথায় গেলে আহার্য্য সামগ্রী পাইব, অনুমতি করুন।"

কাপালিক কহিল, "ভৈরবীপ্রেরিতোঽসি, মামনুসর, পরিতোষন্তে ভবিষ্যতি।"

নবকুমার কাপালিকের অনুগামী হইলেন। উভয়ে অনেক পথ বাহিত করিলেন—পথিমধ্যে কেহ কোন কথা কহিল না। পরিশেষে এক পর্ণকুটীর প্রাপ্ত হইল—কাপালিক প্রথমে প্রবেশ করিয়া নবকুমারকে প্রবেশ করিতে অনুমতি করিল এবং নবকুমারের অবোধগম্য কোন উপায়ে একখণ্ড কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালিত করিল। নবকুমার সেই আলোকে দেখিলেন যে, ঐ কুটীর সর্ব্বাংশে কিয়াপাতায় রচিত। তন্মধ্যে কয়েকখানা ব্যাঘ্রচর্ম্ম আছে—এক কলস জল ও কিছু ফলমূল আছে।

কাপালিক অগ্নি জ্বালিত করিয়া কহিল, "ফলমূল যাহা আছে, আত্মসাৎ করিতে পার। পর্ণপাত্র রচনা করিয়া কলস-জল পান করিও। ব্যাঘ্রচর্ম্ম আছে, অভিরুচি হইলে শয়ন করিও। নির্ব্বিঘ্নে তিষ্ঠ—ব্যাঘ্রের ভয় করিও না। সময়ান্তরে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। যে পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ না হয়, সে পর্য্যন্ত এ কুটীর ত্যাগ করিও না।"

এই বলিয়া কাপালিক প্রস্থান করিল। নবকুমার সামান্য ফলমূল আহার করিয়া এবং সেই ঈষত্তিক্ত জল পান করিয়া পরম পরিতোষলাভ করিলেন। পরে ব্যাঘ্রচর্ম্মে শয়ন করিলেন, সমস্ত দিবসজনিত ক্লেশ-হেতু শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলেন।

সমুদ্রতটে

প্রাতে উঠিয়া নবকুমার সহজেই বাটীগমনের উপায় করিতে ব্যস্ত হইলেন, বিশেষ কাপালিকের সান্নিধ্য কোনক্রমেই শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু আপাততঃ এ পথহীন বনমধ্য হইতে কি প্রকারে নিষ্ক্রান্ত হইবেন? কি প্রকারেই বা পথ চিনিয়া বাটী যাইবেন? কাপালিক অবশ্য পথ জানে; জিজ্ঞাসিলে কি বলিয়া দিবে না? বিশেষ, যতদূর দেখা গিয়াছে, ততদূর কাপালিক তাঁহার প্রতি কোন শঙ্কাসূচক আচরণ করে নাই—কেনই বা তবে তিনি ভীত হন? এ দিকে কাপালিক তাঁহাকে পুনঃ সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত কুটীর ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছে, তাহার অবাধ্য হইলে বরং তাহার রোষোৎপত্তির সম্ভাবনা। নবকুমার শ্রুতছিলেন যে, কাপালিকেরা মন্ত্রবলে অসাধ্য-সাধনে সক্ষম—এ কারণে তাহার

অবাধ্য হওয়া অনুচিত। ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া নবকুমার আপাততঃ কুটীরমধ্যে অবস্থান করাই স্থির করিলেন।

কিন্তু বেলা অপরাহ্ণ হইয়া আসিল, তথাপি কাপালিক প্রত্যাগমন করিল না। পূর্ব্বদিনের উপবাস, অদ্য এ পর্য্যন্ত অনশন, ইহাতে ক্ষুধা প্রবল হইয়া উঠিল। কুটীরমধ্যে যে অল্পপরিমাণ ফলমূল ছিল, তাহা পূর্ব্বরাত্রেই ভুক্ত হইয়াছিল—এক্ষণে কুটীর ত্যাগ করিয়া ফলমূলান্বেষণ না করিলে ক্ষুধায় প্রাণ যায়। অল্প বেলা থাকিতে ক্ষুধার পীড়নে নবকুমার ফলান্বেষণে বাহির হইলেন।

নবকুমার ফলান্বেষণে নিকটস্থ বালুকাস্তূপ সকলের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যে দুই একটা গাছ বালুকায় জন্মিয়া থাকে, তাহার ফলাস্বাদন করিয়া দেখিলেন যে, এক বৃক্ষের ফল বাদামের ন্যায় অতি সুস্বাদু, তদ্দ্বারা ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিলেন।

কথিত বালুকাস্তূপশ্রেণী প্রস্থে অতি অল্প; অতএব নবকুমার অল্পকাল ভ্রমণ করিয়া তাহা পার হইলেন। তৎপরে বালুকাবিহীন নিবিড় বনমধ্যে পড়িলেন। যাঁহারা ক্ষণকাল-জন্য অপূর্ব্বপরিচিত বনমধ্যে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, পথহীন বনমধ্যে ক্ষণমধ্যেই পথভ্রান্তি জন্মে। নবকুমারের তাহাই ঘটিল। কিছুদূর আসিয়া আশ্রম কোন্ পথে রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। গম্ভীর জলকল্লোল তাঁহার কর্ণপথে প্রবেশ করিল। তিনি বুঝিলেন যে, এ সাগরগর্জ্জন। ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে সম্মুখেই সমুদ্র। অনন্তবিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল। সিকতাময় তটে গিয়া উপবেশন করিলেন।

ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র। উভয়পার্শ্বে যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর পর্য্যন্ত তরঙ্গ-ভঙ্গ-প্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা; স্তূপীকৃত বিমল কুসুমদাম-গ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে, কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ নীলজলমণ্ডলমধ্যে সহস্র স্থানে সফেন তরঙ্গ-ভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখনও এমন প্রচণ্ড বায়ু-বহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে আন্দোলিত হইতে থাকে, তবে সে সাগরতরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল। অনতিদূরে কোন ইউরোপীয় বণিক্‌জাতির সমুদ্রপোত শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধিহৃদয়ে উড়িতেছিল।

কতক্ষণ যে নবকুমার তীরে বসিয়া অনন্যমনে জলধিশোভা দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তদ্বিষয়ে তৎকালে তিনি পরিমাণ-বোধ-রহিত। পরে একবারে প্রদোষতিমির আসিয়া কাল জলের উপর বসিল। তখন নবকুমারের চেতনা হইল যে, আশ্রম সন্ধান করিয়া লইতে হইবে। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন কেন, তাহা বলিতে পারি না—তখন তাঁহার মনে কোন্ ভূতপূর্ব্ব সুখের উদয় হইতেছিল, তাহা কে বলিবে? গাত্রোত্থান করিয়া সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধি-তীরে, সৈকত ভূমে, অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি! কেশভার—অবেণীসংবদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন, যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা

যাইতেছে। অলকাবলির প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না—তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর অথচ জ্যোতির্ম্ময়; সে কটাক্ষ, এই সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণরেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য; বাহুযুগলে বিমল শ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। রমণীদেহ একেবারে নিরাভরণ। মূর্ত্তিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। অর্দ্ধচন্দ্র-নিঃসৃত কৌমুদীবর্ণ; ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল; পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকসিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে সন্ধ্যালোকে না দেখিলে, তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।

নবকুমার অকস্মাৎ এইরূপ বনমধ্যে দৈবী মূর্ত্তি দেখিয়া নিস্পন্দশরীর হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বাক্‌শক্তি রহিত হইল,—স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। রমণীও স্পন্দহীন, অনিমিষলোচনে বিশাল চক্ষুর স্থিরদৃষ্টি নবকুমারের মুখে ন্যস্ত করিয়া রাখিলেন। উভয়মধ্যে প্রভেদ এই যে, নবকুমারের দৃষ্টি চমকিত লোকের দৃষ্টির ন্যায়, রমণীর দৃষ্টিতে সে লক্ষণ কিছুমাত্র নাই, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ হইতেছিল।

অনন্ত সমুদ্রের জনহীন তীরে, এইরূপে বহুক্ষণ দুই জনে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে তরুণীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল। তিনি অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ?"

এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নবকুমারের হৃদয়বীণা বাজিয়া উঠিল। বিচিত্র হৃদয়যন্ত্রের তন্ত্রীচয় সময়ে সময়ে এরূপ লয়হীন হইয়া থাকে যে, যত যত্ন করা যায়, কিছুতেই পরস্পর মিলিত হয় না, কিন্তু একটি শব্দে, একটি রমণীকণ্ঠসম্ভূত স্বরে সংশোধিত হইয়া যায়। সকলেই লয়বিশিষ্ট হয়, সংসারযাত্রা সেই অবধি সুখময় সঙ্গীতপ্রবাহ বলিয়া বোধ হয়। নবকুমারের কর্ণে সেইরূপ এ ধ্বনি বাজিল।

"পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ?"—এ ধ্বনি নবকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। কি অর্থ, কি উত্তর করিতে হইবে, কিছুই মনে হইল না। ধ্বনি যেন হর্ষবিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল; যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল, বৃক্ষপত্রে মর্ম্মরিত হইতে লাগিল, সাগরনাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল। সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী; রমণী সুন্দরী; ধ্বনিও সুন্দর,—হৃদয়তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্য্যের লয় মিলিতে লাগিল।

রমণী কোন উত্তর না পাইয়া কহিলেন, "আইস।" এই বলিয়া তরুণী চলিল, পদক্ষেপ লক্ষ্য হয় না। বসন্তকালে মন্দানিল-সঞ্চালিত শুভ্র মেঘের ন্যায় ধীরে ধীরে অলক্ষ্য-পদ-বিক্ষেপে চলিল; নবকুমার কলের পুত্তলিকার ন্যায় সঙ্গে চলিলেন। এক স্থানে একটা ক্ষুদ্র বন পরিবেষ্টন করিতে হইবে; বনের অন্তরালে গেলে আর সুন্দরীকে দেখিতে পাইলেন না। বনবেষ্টনের পর দেখেন যে, সম্মুখে কুটীর।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা

ভ্রাতৃদ্বয় *

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রতাপ পলায়ন করিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহার বিপৎশান্তি হয় নাই, দুইজন মোগল,—একজন খোরাসানী, অপর জন মুলতানী,—তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিলেন। প্রতাপের তেজস্বী অশ্ব চৈতক লম্ফ দিয়া একটী পর্ব্বতনদী পার হইয়া গেল, মোগলগণের সেই নদী পার হইতে বিলম্ব হইল। কিন্তু চৈতক আহত, প্রতাপও আহত। পশ্চাদ্ধাবক সন্নিকটে আসিতেছে, তাহাদিগের অশ্বের পদশব্দ সেই পর্ব্বতরাশিতে শব্দিত হইতেছে, প্রতাপ শুনিতে পাইলেন; এবার রক্ষা নাই জানিলেন, কিন্তু বীরের ন্যায় মরিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন।

সহসা পশ্চাৎ হইতে স্বর শুনিলেন, "হো নীলা ঘোড়ারা আশোয়ার" পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, কেবল একজন অশ্বারোহী। সেই অশ্বারোহী তাঁহার বিষম শত্রু ও সহোদর ভ্রাতা শক্ত!

রোষে প্রতাপসিংহ বলিলেন, "সংগ্রামসিংহের পৌত্র হইয়া মোগলের দাস হইয়াছ, ইহাতেও যথেষ্ট কলঙ্ক হয় নাই; এক্ষণে ভ্রাতাকে বধ করিতে পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছ? কুলকলঙ্ক!

* এই প্রবন্ধের পূর্ব্বাংশ 'হল্‌দীঘাটার যুদ্ধ' নামে পুস্তকের ১৭-২১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

প্রতাপসিংহ অদ্য সংগ্রামসিংহের বংশ নিষ্কলঙ্ক করিবে।" শক্ত প্রতাপের কথায় ভীত হইলেন না, রুষ্ট হইলেন না, ধীরে ধীরে প্রতাপের নিকট আসিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ! একদিন তোমার প্রাণনাশে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম, কিন্তু অদ্য সে ইচ্ছা তিরোহিত হইয়াছে। অদ্য তোমার বীরত্ব দেখিয়া মোহিত হইয়াছি, পূর্ব্বদোষ ক্ষমা কর, ভ্রাতাকে আলিঙ্গন দান কর।"

প্রতাপসিংহ দেখিলেন, শক্তের নয়নে জল। বহু দিনের বৈরভাব দূরে গেল, ভ্রাতৃস্নেহে উভয়ের হৃদয় উথলিল, উভয়ে উভয়কে স্নেহে আলিঙ্গন করিলেন।

প্রতাপের মহত্ত্ব ও প্রতাপের বীরত্ব দেখিয়া অদ্য শক্তের বৈরভাব তিরোহিত হইয়াছে, বহু বৎসরের ভ্রাতৃবিরোধ তিরোহিত হইয়াছে। ভ্রাতার নিকট ভ্রাতা ক্ষমা যাচ্ঞা করিতেছে, প্রতাপ কি সেই স্নেহদানে বিরত হইবেন? প্রতাপ পূর্ব্বদোষ বিস্মৃত হইলেন, সাশ্রুনয়নে হৃদয়ের ভ্রাতাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন।

যে দুইজন মোগল প্রতাপের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, তাহারা কোথায়? শক্ত দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়াছিলেন, ভ্রাতার প্রাণনাশের সম্ভাবনা দেখিয়া অব্যর্থ বর্শায় সে মোগলদিগের প্রাণনাশ করিয়াছেন।

সন্ধ্যার ছায়া সেই নির্জ্জন উপত্যকায় অবতীর্ণ হইতে লাগিল, পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিতে লাগিল। সেই নির্জ্জন নিঃশব্দ উপত্যকায় দুই ভ্রাতা অনেক দিনের অপহৃত ভ্রাতৃস্নেহ পাইলেন, অনেক দিনের হারাধন পাইলেন। স্নেহ হৃদয়ে লীন হয়, একেবারে শুষ্ক হয় না, সেই লীন স্নেহধারা অদ্য বীরহৃদয়ের হৃদয়কে প্লাবিত করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর প্রতাপসিংহ কহিলেন, "ভাই শক্ত! আজি প্রতাপের পরাজয়ের দিন নহে, আজি বিজয়ের দিন; আজ যে অপহৃত ধন ফিরিয়া পাইলাম, যুদ্ধের পরাজয় তাহার নিকট কি তুচ্ছ! ভাই! যেন আমরা পূর্ব্বের বিদ্বেষ চিরকাল বিস্মৃত হই, যেন আমাদের চিরকাল এইরূপ স্নেহ থাকে। ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিত হইয়া স্বদেশ রক্ষা করিব, বিদেশীয় শত্রুকে ভয় করিব না, দিল্লীশ্বর ও মানসিংহকে ভয় করিব না।"

রমেশচন্দ্র দত্ত।

সেকালের সুখদুঃখ

নবাব সিরাজদ্দৌলার নাম সকলের কাছেই চিরপরিচিত। তিনি অতি অল্পদিন মাত্র বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার সিংহাসনে বসিয়াছিলেন; কিন্তু সেই অল্পদিনের মধ্যেই স্বদেশে এবং বিদেশে আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

ইংরাজেরা একবার তাহাদের দেশের একজন হতভাগ্য নরপতিকে নর-বলি দিয়াছিল। ঘাতকের শাণিত কুঠার যখন সেই রাজমুণ্ড দ্বিখণ্ডিত করে, শোণিত-লোলুপ জনসাধারণ তখন উন্মত্ত পিশাচের মত ভৈরব নৃত্যে করতালি দিয়া কিছু দিনের জন্য প্রজাতন্ত্র সংস্থাপিত করিয়াছিল! কিন্তু তখনও তাহাদের দেশের কুটীরে-কুটীরে, দুর্গে-দুর্গে, প্রাসাদে-প্রাসাদে কত কৃষক, কত সৈনিক, কত সম্ভ্রান্ত পরিবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল! বাঙ্গালী যখন ষড়যন্ত্র করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে গৃহতাড়িত করে, মীরনের নৃশংস আদেশে সিরাজ-মুণ্ড যখন দেহ-বিচ্যুত হয়, দেশের রাজা-প্রজা তখন সকলে মিলিয়া বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার কৃপাকটাক্ষের প্রতীক্ষায় করযোড়ে দাঁড়াইয়াছিলেন;—সিরাজের শোচনীয় পরিণামে তাঁহার জন্য কেহই একবিন্দু অশ্রুমোচনের অবসর পান নাই।

এ সকল এখন পুরাতন কথা। দেশের আর সে অবস্থা নাই, লোকের আর সে তীব্র প্রতিহিংসা নাই, সিরাজ এবং তাঁহার সমসাময়িক রাজা-প্রজা সকলেই ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ

করিয়াছেন। এখন বোধ হয়, বাঙ্গালী যথার্থ নিরপেক্ষভাবে সিরাজ-চরিত্র আলোচনা করিবার অবসর পাইবেন।

সিরাজদ্দৌলা নাই। তাঁহার সময়ে যে বাঙ্গালা দেশ ছিল, সে বাঙ্গালা দেশও নাই। মোগল বাদশাহেরা * "সমুদয় মানব জাতির স্বর্গতুল্য বঙ্গভূমি" বলিয়া অনুশাসনপত্রে যাহার উল্লেখ করিতেন, সে স্বর্গ এখন গৌরবচ্যুত হৃত-সর্ব্বস্ব কাঙ্গাল-ভূমি। সে শিল্প নাই, সে বাণিজ্য নাই, বাঙ্গালীর সে রাজপদ, মন্ত্রিপদ, জমীদারদিগের সে জীবন-মরণের বিচারক্ষমতা নাই;—সে বাহুবল, সে রণকৌশল, সকলই এখন ইতিহাসগত অতীত কাহিনীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সিরাজদ্দৌলা যে সময়ের লোক, সে সময় এখন বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছে।

এক সময়ে এ দেশে মুসলমানের নামগন্ধ ছিল না। হিন্দুস্থান কেবল হিন্দু অধিবাসীর শঙ্খ-ঘণ্টারবে প্রতিশব্দিত হইত। কিন্তু সে বহুদিনের কথা। সেকালের সকল চিত্রই এত পুরাতন, এত জরাজীর্ণ, এত অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, এখন আর ভাল করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য বিচার করিবার উপায় নাই। বহুদিন হইতে এ দেশ হিন্দু-মুসলমানের জন্মভূমি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে; গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বহুদিন হইতে হিন্দু-মুসলমান বাহুতে বাহুতে মিলিত হইয়া জীবন-সংগ্রামে জন্মভূমির রণপতাকা বহন করিতেছে। সিরাজদ্দৌলার সময়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্ম্মগত পার্থক্য ছিল; কিন্তু ক্ষমতাগত, পদগৌরবগত কোনই পার্থক্য ছিল না। মুসলমানের শিষ্টাচার, মুসলমানের প্রয়োজনাতীত-সৌজন্য-পরিপ্লুত, শ্লথ-বিন্যস্ত, শ্রুতিসুমধুর, সুমার্জ্জিত যাবনিক

* Akbar and Aurangzeb.

ভাষা এবং পদবিজ্ঞাপক যাবনিক উপাধি গৌরবের সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান সমভাবে ব্যবহার করিতেন।

দিল্লীর বাদশাহ নামমাত্র বাদশাহ; বাঙ্গালার নবাবই বাঙ্গালাদেশের প্রকৃত "মা-বাপ" হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই নবাব-দরবারে হিন্দু-মুসলমানের কোনরূপ আসনগত পার্থক্য বা ক্ষমতাগত তারতম্য ছিল না। বরং অনেকাংশে হিন্দুদিগেরই বিশেষ প্রাধান্য জন্মিয়াছিল। বিলাসলোলুপ মুসলমান ওমরাহগণ আহার-বিহার লইয়াই সমধিক ব্যস্ত থাকিতেন; কর্ম্মকুশল হিন্দু অধিবাসিগণ, কেহ রাজা, কেহ মন্ত্রী, কেহ কোষাধ্যক্ষ, কেহ বা সেনানায়ক হইয়া বুদ্ধিবলে, শাসনকৌশলে, বাহুবিক্রমে বাঙ্গালা-দেশের ভাগ্য-বিবর্ত্তন করিতেন।

মুসলমান নবাব আপনাকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করিতেন না। বাঙ্গালাদেশই তাঁহার স্বদেশ, এবং বাঙ্গালী-জাতিই তাঁহার স্বজাতি হইয়া উঠিয়াছিল। রাজকোষের ধনরত্ন বাঙ্গালা দেশেই সঞ্চিত থাকিত; যাহা ব্যয় হইত, তাহাও বাঙ্গালীগণ কেহ দ্রব্য-বিনিময়ে, কেহ শ্রম-বিনিময়ে কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে পারিত। দেশের টাকা দেশেই থাকিত, তাহা সাত সমুদ্র তের নদীর পারে চির-নির্ব্বাসিত হইত না।

সেই একদিন আর এই একদিন! আজ সে দিনের বিলুপ্ত কাহিনীর আলোচনা করিতে হইলে অতীতের স্বপ্ন-সমুদ্র সন্তরণ করিয়া বাস্তব রাজ্যের, বাস্তব চিত্রপটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে; সেকালের চক্ষু লইয়া, সেকালের প্রাণ লইয়া, সেকালের ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে হইবে। সে ইতিহাস কেবল হতভাগ্য

সিরাজদ্দৌলার মর্ম্ম-বেদনার ইতিহাস নহে;—তাহা আমাদিগের পূজনীয় পিতৃপিতামহের সুখদুঃখের ইতিহাস।

সিরাজদ্দৌলার সময়ে বাঙ্গালাদেশ ১৩ চাক্‌লায় এবং ১৬৬০ পরগনায় বিভক্ত ছিল।* পরগনাগুলি কোন না কোন জমীদারের অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহারা বাহুবলে আপন আপন রাজ্য রক্ষা করিয়া, বিচারবলে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া, যথাকালে নবাব-সরকারে রাজস্ব দিতে পারিলে, তাঁহাদের স্বাধীন শক্তির প্রবল প্রতাপে কেহই বাধা দিতে চাহিত না। চাক্‌লায় চাক্‌লায় এক একজন হিন্দু অথবা মুসলমান "ফৌজদার" অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা থাকিতেন; তাঁহারা যথাকালে রাজস্ব-সংগ্রহের সাহায্য করা ভিন্ন আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। গঙ্গা, ভাগীরথী, ব্রহ্মপুত্র বাঙ্গালীর বাণিজ্য-ভাণ্ডার বহন করিত; সে বাণিজ্যে জেতৃ-বিজিত বলিয়া শুল্কদানের কোনরূপ তারতম্য ছিল না। মুসলমান নবাব কোন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে পাত্রমিত্র লইয়া দরবার করিতেন, কিন্তু আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যে প্রায়ই মনোনিবেশ করিবার অবসর পাইতেন না। জগৎ-শেঠের ইতিহাস-বিখ্যাত বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বাদশাহের নামে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা মুদ্রিত হইত; পরগনাধিপতি জমীদারগণ জগৎ-শেঠের কোষাগারে রাজস্ব ঢালিয়া দিয়া মুক্তিপত্র গ্রহণ করিতেন; এবং কখন কখন শিষ্টাচারের অনুরোধে রাজধানীতে আসিয়া কাবা-চাপকান পরিয়া, উষ্ণীষ বাঁধিয়া, জানু পাতিয়া মুসলমানী প্রথায় নবাব-দরবারে সমাসীন হইতেন।

দেশে যে অত্যাচার-অবিচার ছিল না তাহা নহে; বরং অনেক সময়েই দেশে ভয়ানক অরাজকতা উপস্থিত হইত। কিন্তু সে

* Grant's Analysis of Finances of Bengal.

অরাজকতায় জমীদার ও মহাজন যতই উৎপীড়িত হ'ন না কেন, কৃষক-কুটীরে তাহার ছায়াস্পর্শ হইত না। কৃষক যথাকালে হল চালনা করিয়া, যথা-প্রাপ্য শস্য সঞ্চয় করিয়া, স্ত্রীপুত্র লইয়া যথাসম্ভব নিরুদ্বেগেই কালযাপন করিত। দেশে দস্যু-তস্করের উৎপীড়নের অভাব ছিল না; কিন্তু দেশের লোকের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারেও কোনরূপ নিষেধ ছিল না। সম্ভ্রান্ত বংশের যুবকেরাও লাঠি-তরবারি চালনা করিতে জানিতেন। দস্যু-তস্করের উপদ্রব হইলে, গ্রামের লোকে দল বাঁধিয়া, রাত্রি জাগিয়া, লাঠি ঘুরাইয়া, মশাল জ্বালাইয়া, তরবারি ভাঁজিয়া, বর্শা চালাইয়া আত্মরক্ষা করিত। দস্যু-তস্কর ধরা পড়িলে, গ্রামবাসীরাই দশজনে মিলিয়া প্রয়োজনাতীত উত্তম-মধ্যম দিয়া সংক্ষেপে বিচার-কার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিত।

ইহাতে যেমন দুঃখ ছিল, সেইরূপ সুখও ছিল। আজকাল দস্যু-তস্করে উপদ্রব করিলে, কেহ কাহারও সাহায্য করিতে বাহির হয় না; অসহায় গৃহস্থ ঘরে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে! দস্যুদল সর্ব্বস্ব লুটীয়া, মানসম্ভ্রম পদদলিত করিয়া, হেলিতে দুলিতে ধীরে ধীরে বহুদূরে চলিয়া গেলে, গৃহস্থ পঞ্চায়েৎ ডাকিয়া থানায় গিয়া পুলিসে সংবাদ দিয়া আসে। দারোগা, বক্সী, কনেষ্টবল এবং চৌকীদার মহাশয় অবসর-অনুসারে একে একে শুভাগমন করিলে, গৃহস্থ ব্যস্তসমস্ত হইয়া একহাতে চোখের জল মুছিতে মুছিতে, আর একহাতে তাঁহাদের যথাযোগ্য মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ঋণ-গ্রহণে বাহির হয়। দস্যু-তস্কর ধরা পড়ুক বা না পড়ুক, সন্দেহে পড়িয়া অনেক গরীবকে নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়; দুই-এক স্থলে মিথ্যা অভিযোগ বলিয়া গৃহস্থকে রাজদ্বারে বিলক্ষণ

বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। সেকালে সুবিচারের সূক্ষ্মযন্ত্র ছিল না, সুতরাং কাহাকেও বিচার-বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত না।

অনেক বিষয়ে অসুবিধা ছিল; কিন্তু অনেক বিষয়ে সুবিধাও ছিল। পথ-ঘাট ছিল না, ত্বরিত গমনের সদুপায় ছিল না, দাতব্য-চিকিৎসালয় এবং বিনামূল্যে বিতরণীয় ঔষধালয় ছিল না;—কিন্তু লোকের ধনধান্য ছিল, স্বাস্থ্য ও বাহুবল ছিল; হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া দেশে দেশে ছুটিয়া বেড়াইবার বিশেষ প্রয়োজন হইত না। লোকে ঘরে বসিয়া হাতে-লেখা তুলট-কাগজের রামায়ণ মহাভারত পড়িত, অবসর সময়ে কবিকঙ্কণের চণ্ডীর গান গাহিত, এবং আপন আপন বাসস্থলে নিপুণভাবে, প্রসন্নচিত্তে, আপন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। অভাব অল্প হইলে দুঃখও অল্প হইয়া থাকে। সভ্যতাবিরোধী সুচিক্কণ সূক্ষ্ম-বস্ত্রের জন্য সকলেই লালায়িত হইত না; দেশের মোটা ভাত মোটা কাপড়েই অধিকাংশ লোকের এক রকম দিন চলিয়া যাইত। পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের অথবা তাঁহার বেত্রদণ্ডের মহিমায় যথাসম্ভব বিদ্যাভ্যাস করিয়া, বালকেরা অবসর-সময়ে মাঠে মাঠে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত; কখনও বা ঘোড়া ধরিয়া তাহার অনাবৃত পৃষ্ঠে নিতান্ত অসঙ্গতরূপে এক জনের স্থানে দুই তিন জন চাপিয়া বসিত; কখনও বা বর্ষার জলে—নদ, নদী, খাল, বিলে ঝাঁপাঝাঁপি করিয়া সাঁতার কাটিত; সময়ে অসময়ে গৃহস্থের গরু-বাছুর চরাইয়া, হাট-বাজার বহিয়া, দিনশেষে ঠাকুরমার উপকথায় হুঁ দিতে দিতে স্নেহের কোলে ঘুমাইয়া পড়িত। যুবকদল দিবসে তাস-পাশা খেলিয়া, দাবা-ব'ড়ে টিপিয়া, বৈকালে লাঠি-তরবারি ভাঁজিত; সন্ধ্যা-সমাগমে সযত্ন-বিন্যস্ত লম্বা

কোঁচা দোলাইয়া, অনাবৃত দেহ-সৌষ্ঠবের গৌরব বাড়াইবার জন্য কাঁধের উপর রঙ্গিন গামছা ছড়াইয়া দিয়া, বাব্‌রী-চুলে চিরুনী গুঁজিয়া, শুক-সারী অথবা নিতান্ত অভাবপক্ষে একটা পোষা বুল্‌বুল্‌ হাতে লইয়া, তাম্বূল-রাগ-রঞ্জিত অধরোষ্ঠে মৃদুমন্দ শিস্‌ দিতে দিতে—পাড়ায় বেড়াইতে বাহির হইত। বৃদ্ধেরা গৃহকর্ম্ম সারিয়া, পর্য্যাপ্ত ভোজনের পর তৈলাক্ত স্নিগ্ধতনু দিবা-নিদ্রায় সমাহিত করিয়া, সায়াহ্নে তামাকু সেবনের জন্য চণ্ডীমণ্ডপে, নদী-সৈকতে অথবা বৃক্ষতলে সমবেত হইয়া, দেশের কথা, দশের কথা, কত কি আবশ্যক অনাবশ্যক বিষয়ের মীমাংসা করিয়া, সন্ধ্যার পর হরিসঙ্কীর্ত্তনে অথবা পুরাণশ্রবণে ভক্তি-গদ্‌গদ-হৃদয়ে নিমগ্ন হইতেন। সমাজের যাঁহারা লক্ষ্মীরূপিণী অর্দ্ধাঙ্গিনী, তাঁহারা দেবতা, ব্রাহ্মণ, অতিথি ও পোষ্যবর্গের সেবা করিয়া, সময়ে অসময়ে ছেলে ঠেঙ্গাইয়া, নথ নাড়িয়া, চুল খুলিয়া, সন্ধ্যার শীতল বাতাসে পুকুর-ঘাট আলো করিয়া বসিতেন; কত কথা, কত রঙ্গরস—তার সঙ্গে প্রৌঢ়ার সগর্ব্ব-হস্তসঞ্চালন, নবীনার অবগুণ্ঠন-জড়িত অস্ফুট সখী-সম্ভাষণ, এবং স্থবিরার স্খলদ্‌বচনে শিবমহিম্ন-স্তোত্রের বিকৃত আবৃত্তি সান্ধ্য সম্মিলনকে কতই মধুময় করিয়া তুলিত।

সে দিন আর নাই; এখন আমরা সভ্য হইয়াছি। বালকেরা দন্তোদ্গমের পূর্ব্বেই, ক, খ ধরিয়া পাঁচ ঘণ্টা স্কুলের কঠিন কাষ্ঠাসনে কখন দাঁড়াইয়া, কখনও বা বসিয়া বৈকালে গৃহশিক্ষকের তীব্র তাড়না সহ্য করিয়া, আহার না করিতেই ঘুমাইয়া পড়ে; যুবারা হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া চাকরীর আশায়, উমেদারীর আশায়, কখনও বা শুধু একখানি প্রশংসাপত্র পাইবার আশায়,

দেশে দেশে ছুটাছুটি করিয়া, অল্প দিনেই অধ্যয়নক্লিষ্ট দুর্ব্বল দেহে নিতান্ত অসময়েই স্থবিরত্ব লাভ করে; বৃদ্ধেরা অনাবশ্যক উৎসাহে সেকালের জীর্ণ খুঁটার সঙ্গে উড্ডীয়মান জাতীয় জীবনকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য পাড়ায় পাড়ায় দালাদলির বৈঠক করিয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি করেন; আর সমাজের যাঁহারা লক্ষ্মীরূপিণী, সেই অর্দ্ধাঙ্গিনীগণ অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনে স্বামিপুত্রের সঙ্গে দেশে দেশে ফিরিয়া কেবল অনাবশ্যকরূপে চিকিৎসকের এবং স্বর্ণকারের ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন। এ সকল যদি একালের সুখের চিত্র বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারি, তবে সেকালে দেশের লোকের সুখশান্তির একেবারেই অভাব ছিল বলিয়া উপহাস করা শোভা পায় না।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

মধ্যাহ্ন-সঙ্গীত

(১৮৮৭)

একটি বন্ধুর সহিত অনেকদিন একসঙ্গে বাস করিয়াছিলাম। লোকের যেরূপ স্বর থাকিলে গান গাইতে পারে, বলা যায়, সে স্বর তাঁহার কণ্ঠে ছিল। অনেক প্রকার জাতীয়, বিজাতীয়, পাঠ্য ও অপাঠ্য সঙ্গীত তাঁহার অভ্যস্থ ছিল। একতন্ত্রী হইতে বহুতন্ত্রী পর্য্যন্ত, খোল হইতে ঢোল পর্য্যন্ত, এমন কোন যন্ত্র ছিল না, যাহার সাক্ষাৎ পাইলে একবার তিনি করাঘাত না করিয়া ছাড়িতেন। একসঙ্গে থাকিতাম বলিয়াই হউক, অথবা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণেই হউক, আমি কখন তাঁহাকে গান শুনাইতে অনুরোধ করি নাই। কখনও অনুরোধ করি নাই, তবে একদিন করিয়াছিলাম। একদিন চৈত্র মাসের দ্বিপ্রহর; প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড পৃথিবীকে লণ্ডভণ্ড করিয়া তুলিয়াছেন, পড়িতে পারা যায় না, ঘুম পায়, শুইয়া সুখ নাই, বিছানা বড় গরম; কিন্তু তখনও সেই রৌদ্রে অশ্বত্থের ডালে বসিয়া অনেক কিচির-মিচির শব্দ পরাভূত করিয়া, বসন্তের প্রিয়পাখী বিরহিণীর হৃদয় অপেক্ষাও অধিক উত্তপ্ত বালুকাময় প্রান্তরে তাহার কুহুরব ছড়াইতেছিল। শুনিয়াই আমার কবিতা লিখিতে ইচ্ছা গেল; অল্লায়াসেই এক চরণ লিখিয়া ফেলিলাম :—"কি সুখে ডাকরে পাখী দুপুরের রোদে।"

তাহার পর পদের মিল খুঁজিয়া লিখিলাম :—"থাম তুমি বাছা মোর খেতে দিব বোঁদে।" কিন্তু যে সকল কথা লিখিব ভাবিয়াছিলাম, তাহার একটিও প্রকাশ করা গেল না। ফুল, পাখী, সমীরণ, জ্যোৎস্নালোক, হাসি-হাসি মুখখানি,—এগুলির একটিকেও স্থান দিয়া উঠিতে পারিলাম না, কাজেই সেই সুমিষ্ট বোঁদেকে ছাড়িতে হইল। অন্যদিকে আমার কবিতাবাতালোড়িত হৃদয় কিছুতেই শান্ত হইল না। দুর্ব্বুদ্ধি আমার, তাই কখনও যাহা সজ্ঞানে অজ্ঞানে, শয়নে স্বপনে করি নাই, তাহা করিলাম। বন্ধু গম্ভীরভাবে বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে একটি গান গাইতে বলিলাম ; গান গাইবার পরিবর্ত্তে তিনি আমার অনুরোধের যে উত্তর দিয়াছিলেন, জীবনে তাহা ভুলিব না। যদি তিনি সেই উত্তরটি তাঁহার সুকণ্ঠে চাপিয়া রাখিয়া, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার বিবিধ বাদ্যযন্ত্র-পীড়নজনিত কিণচক্রগরিষ্ঠ শ্রীহস্তে চপেটাঘাত করিতেন, তবে আমার কোন অসন্তোষের কারণ থাকিত না ; বরং তাঁহাকে "বিদ্যালয়ের শিক্ষক হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতাম। বন্ধু আমাকে একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন যে, মধ্যাহ্নে সঙ্গীত হয় না। মানুষ সকল ক্লেশ সহিতে পারে, কিন্তু যাহাতে তাহার আত্মাভিমানের ঘাড়ে হাত পড়ে, তাহা কিছুতেই সহিতে পারে না। সঙ্গীতে আমার স্বরও নাই, অভিমানও নাই। কিন্তু সকল বিষয়েরই একটু সাধারণ জ্ঞান আছে, এমন অহঙ্কার ক'জনার নাই ? গান গাইতে না পারি, কিন্তু তাই বলিয়া আমার ক্ষুদ্র একটি প্রশ্নে একরাশি ব্যাকরণ ও অলঙ্কারে ভুল থাকিবে, অথবা বুদ্ধি-নামক সূক্ষ্ম পদার্থের অভাব বুঝাইবে, ইহা কি প্রাণে সহে ?

মধ্যাহ্নে কি সঙ্গীত হয় না? অরুণের তরুণচ্ছটা, উষার কিশোর কান্তি ও তদীয় চম্পক-অঙ্গুলি-স্পর্শোদ্দীপ্ত মেঘমালার স্নিগ্ধ শ্যামলাঙ্গ-পরিশোভিনী রক্ত-রেখা না থাকিলে কি কবিতা হয় না? সঙ্গীত ফোটে না? দিবসের শ্রান্তির অবসানে বিশ্ব যদি অন্ধকারের গর্ভে একবার না ডুবিয়া যায়, যদি চন্দ্রালোক, অলস হৃদয়ে, ক্লান্তিপূর্ণ সুষুপ্ত বিশ্বের মুখচুম্বন না করে, তবে কি, কণ্ঠস্বর একটু ঘুরিয়া পেঁচিয়া একটু অষ্টবক্র হইয়া, পোঁ-পোঁ খেন্-খেন্ সমভিব্যাহারে শ্রোতার শ্রবণ-বিবর তাড়না করিতে পারে না? আর সমিল বা অমিল চতুর্দ্দশটি অক্ষর-সম্বলিত পদ বিলম্বিত হয় না? মধ্যাহ্নের কি সঙ্গীত নাই? শুনিয়াছি প্রাচীনেরা কোন কোন রাগিণীকে মধ্যাহ্নে স্থান দিয়াছিলেন, কিন্তু একালের সুরসিকেরা, আর বিশেষ ভাবে আমার বন্ধু, তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কে সুরসিক, কে অরসিক, বুঝিতে পারিলাম না। যাঁহারা বৈশাখের রৌদ্রে, দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া পাখার বাতাস সেবন করিতে করিতে, কর্ম্মময় পৃথিবীর বক্ষে নিস্তব্ধ হইয়া, একমাত্র নাসিকাটি সচেতন রাখেন, তাঁহারাই সুরসিক? না, যাঁহারা মধ্যাহ্নের প্রস্ফুটরূপে পূর্ণ যৌবনের শোভা সন্দর্শন করেন, রৌদ্রের অগ্নিময় তাপে প্রপীড়িত, পরিশ্রান্ত, তৃষিত স্বর্গ-মর্ত্ত্যে বিশ্বপ্রাণের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিতে পান, আর কোলাহলময়, অবিরত কর্ম্মনিরত, স্বেদসিক্ত মনুষ্যলোকে জীবন-গৌরবের উৎসাহময় সঙ্গীত, সাকার সচল ও স্পর্শক্ষম দেখিতে পান, তাঁহারা সুরসিক?

বড় রাগ হইল; একখানি বেত পড়িয়াছিল, অন্যমনে সেখানি হাতে তুলিয়া গৃহমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলাম। বেত্র যে

বক্ষপৃষ্ঠে পড়িয়া, করুণ-রসাত্মক সঙ্গীত উদ্গিরণ করিবে, তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তবে ঘরের ইটি-সেটি, টেবিলখানি, চেয়ারখানি একটু ধীরে ধীরে নিপীড়িত হইতেছিল, এইমাত্র। কিন্তু তাহাতে ঠক্-ঠক্ ঢেব-ঢেব ভিন্ন অন্য কোন শ্রুতিমধুর শব্দ নিঃসৃত হয় নাই। সহসা বেত্রখানি একখানি মোটা রকম পুস্তকের বাঁধা মলাটে লাগিয়া ঠক্ করিয়া উঠিল। অনুসন্ধানে দেখিলাম সেখানি মেকলে সাহেবের প্রবন্ধ-পুস্তক। এই দ্বিপ্রহরের সময়ে, কি পাপে সেই মহাপুরুষের এই দণ্ড, ভাবিয়া পুস্তক উদ্ঘাটন করিলাম, প্রথমেই চোখে পড়িল Milton ! দু'চারি ছত্র পড়িয়াই ক্রোধ অধিক উদ্দীপ্ত হইল ; যদি পুস্তকখানি নিজের না হইত তবে উহাকে বেত্রাঘাত-বিদারিত-হৃদয় করিয়া ছাড়িতাম। দেখিলাম, মেকলে একজন মধ্যাহ্ন-সঙ্গীত-বিরোধী। তাঁহার বিশ্বাস এই যে, পৃথিবীর যখন শৈশব ছিল, যখন মানুষেরা সরল কুসংস্কার-পূর্ণ নেত্রে জগচ্ছবি নিরীক্ষণ করিত, তখনই প্রকৃত কবিতা ফুটিতে পারিয়াছিল। আর একালে, সভ্যতার চাপে, বিজ্ঞানের তাপে, দর্শনের শাপে, কবিতা বিদায় লইতেছেন। যিনি প্রাচীন ইতিহাসের গোটাকতক বাছাবাছা ঘটনা খুঁজিয়া পাতিয়া নিয়মিত অক্ষরের কারাগারে ফেলিয়া, কবি হইবেন বলিয়া সাধ করিয়াছিলেন, একথা তাঁহার উপযোগী বটে। শৈশব হউক, যৌবন হউক, বার্দ্ধক্য হউক, কোন্ অবস্থায় কবিত্ব নাই ? যাহা হোমার ও বাল্মীকিতে ছিল, সেক্ষপীয়র ও কালিদাসে তাহার ক্ষয় দৃষ্ট হয় না ; এবং গেটে, হিউগো, টেনিসন, লংফেলো ও বিদ্যাপতিতে তাহা পাওয়া যায় না কে বলিবে ? কবিতা কেবল "রাকাশশিশোভনা গতঘনা যামিনী" লইয়াই ব্যস্ত নয়, অমাবস্যার

দুর্দ্দিনে ও চৈত্রের দ্বিপ্রহরেও তিনি সর্ব্বত্র বিচরণ করেন। সঙ্গীত কোকিলেও আছে, পেচকেও আছে; চন্দ্রে আছে, জোনাকিতেও আছে। বিধাতার মহিমায় রচিত এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা কবিতাশূন্য। নাটকের নায়ক, কেবল পরম রূপবান্ ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন পুরুষই হইবেন, কে বলিল? যাহারা অন্ধ খঞ্জ, দীন দুঃখী, চপল পাপাসক্তচিত্ত, তাহাদেরও অন্তরে কত দেবত্ব, কত মাহাত্ম্য আছে; যাহার চক্ষু নাই, সে দেখিবে কিরূপে? তোমার সীতা, হেলেন, শকুন্তলা, দেস্‌দিমোনা, মার্গারেট একদিকে; আর ফান্‌টাইন্, ইপোনাইন্, এলিস্, ভ্রমর ও জেন্‌এয়ারে আর একদিকে। কুটিলাঙ্গ বলিয়া মন্থরা কুটিলা, কিন্তু সৌন্দর্য্যের প্রতিমা হইয়াও গুইনিভিয়র দুঃশীলা। সেকালে একালে এই স্থানে প্রভেদ। পূর্ব্বে যেগুলি কবিতার অবিষয়ীভূত ছিল, অথবা নীচ বলিয়া তাঁহাদের চক্ষে ঠেকিত না, একালের দৃষ্টি সেই পরিত্যক্ত জঞ্জালের মধ্য হইতে রত্ন বাছিয়া বাহির করিতেছে। বালক-কবি লিখিয়াছিলেন :—"A thing of beauty is joy for ever." (চির আনন্দে নন্দিত, যাহা সুন্দর); আর প্রাচীন কবি লিখিয়াছেন :—"The mind's internal heaven shall shed her dews of inspiration on the humblest lay." (মানবের গূঢ় স্বর্গ সঞ্চারিবে রস,—ক্ষুদ্র গীতিকায়)। কবিতা ফুরায় না। এ জগৎ নিত্য কবিতা-পরিপূর্ণ। আধ-আলো আধচ্ছায়ার কবিত্ব প্রখর কিরণের কবিত্বকে অগ্রাহ্য করিতে পারে না। আর যদি আধ-আলো আধচ্ছায়া লইয়াই কবিতা, তবে সে ছায়া কি দ্বিপ্রহরেও নাই? চক্ষু দিবসের রৌদ্রে ঝলসিয়া যায়; তখন দূর-দূরান্তরে পড়ে অন্ধকারের ছায়া। দর্শন-বিজ্ঞান

অনেক কুসংস্কার ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, সত্য; কিন্তু প্রাচীন সংশয় এখনও দূর হইল না। ছায়া এখনও রহিয়াছে। দর্শন-বিজ্ঞানে চক্ষু ঝলসিয়া যায়; কিন্তু জগৎতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, জীবন-মরণের তত্ত্ব চিরদিনই অন্ধকারে। শ্রেষ্ঠ কবিতা চিরদিনই জীবন-রহস্য লইয়া; কাজেই কবিতার উৎস অফুরন্ত।

অনেকে বলেন যে দেখ, চারিদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্রোত; আমদানি-রপ্তানি ও বোঝাই লইয়া পৃথিবী ব্যস্ত। রাত্রি-দিন চাকার খড়্-খড়্ ঘড়্-ঘড়্, এঞ্জিনের বংশী-নিনাদে, এ সভ্যতার বৃন্দাবনে, প্রাণও গেল, উপরন্তু কাণও গেল। এ টাকা-পয়সার ঝন্ঝনানিতে কি কোকিলের স্বর শুনিতে পাওয়া যায়? এঞ্জিনের ধোঁয়ার গন্ধে মাথা ভার, মল্লিকাদির সুবাস পাইবার উপায় কি? আমি বলি যে, কোকিল ও ফুল লইয়া ত অনেক কবিতা হইয়াছে, কিন্তু সেগুলি ছাড়িয়া, একালের ব্যবসা-বাণিজ্যের কবিতা কি লেখা যায় না? কল-কারখানার কি কবিতা নাই? আমার বন্ধু কখন কখন গাইয়া থাকেন :—"কি কল গ'ড়েছে সাহেব কোম্পানি।" আমি সে গানের কথা বলিতেছি না। আমি যে কবিতার কথা বলিতেছি, মার্কিন কবি হুইট্‌মান্ তাহার পথ দেখাইয়াছেন। হুইট্‌মান্ খুব বড় কবি না হইলেও মধ্যাহ্নের কবি। যে দৃশ্যে তোমার আমার রস শুকাইয়া যায়, সেই দৃশ্যে তাঁহার কবিত্বের প্রতিভা ফুটিয়া উঠে। তিনি সহরের রাস্তায়, ঘাটে, বাজারে ও কর্ম্মক্ষেত্রে, যে কোলাহল, তাহাকে লইয়াই কবিতা লিখিয়াছেন। এই কোলাহলের মধ্যে যে জীবন বিকশিত, এই পরিশ্রমের মধ্যে যে আনন্দ প্রকাশিত, তিনি তাহারই উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়াছেন। যে দিন ভারতবর্ষ এই সঙ্গীতের মাহাত্ম্য

বুঝিবে, সেই দিন অনেক দুর্দ্দশার শেষ হইবে। সকলে মিলিয়া চৈত্রের দ্বিপ্রহরে—এই অধীনতার প্রখর সূর্য্যতলে, একবার কর্ম্মের মধ্যাহ্ন-সঙ্গীত গাও, একবার গৌড়-সারঙ্গ ধর,—হে আমার সঙ্গীত-অভিমানী বন্ধু, এ দুপ্রহরে ঘুমাইও না ; আমার এই প্রথম ও শেষ অনুরোধ রক্ষা কর,—একবার গাও।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

পদ্যাংশ

পূর্ব্বরাগ

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।

বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা ॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ান-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা ॥
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি [১]।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে
কি কহে দুহাত তুলি ॥
একদিঠ করি ময়ুর-ময়ুরী-
কণ্ঠ [২] করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া-বঁধুর সনে ॥

চণ্ডীদাস

১। চুল

২। শ্রীকৃষ্ণের সহিত বর্ণসাদৃশ্য-হেতু

বিরহ

হরি গেও [১] মধুপুর [২] হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী-মালা ॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন-রজনী ॥
নয়নক নিন্দ [৩] গেও বয়ানক হাস [৪]।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ মঝু [৫] পাশ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি ॥

বিদ্যাপতি।

১। গিয়াছেন
২। মথুরা
৩। চোখের নিদ্রা
৪। মুখের হাসি
৫। আমার

গৌরচন্দ্রিকা

বিমল হেম জিনি তনু অনুপাম[২] রে
তাহে শোভে নানা ফুলদাম।
কদম্ব-কেশর জিনি একটী পুলক[৩] রে
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম॥
চলিতে না পারে গোরা চাঁদ গোসাঞি রে
বলিতে না পারে আধ বোল।
ভাবে অবশ হৈয়া হরি হরি বোলাইয়া
আচণ্ডালে ধরি দেই কোল॥
গমন মন্থর-গতি জিনি মদমত্ত হাতী
ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি যায়।
অরুণ-বসন-ছবি জিনি প্রভাতের রবি
গোরা-অঙ্গে লহরী খেলায়॥
এ হেন সম্পদ্ কালে গোরা না ভজিনু হেলে
তছু[৪] পদে না করিনু আশ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবনদাস॥

বৃন্দাবনদাস।

১। গৌরাঙ্গ-সম্বন্ধীয়
২। অনুপম
৩। রোমাঞ্চ
৪। তাহার

বঙ্গভাষা

হে বঙ্গ ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি'।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি'
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি' কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি',—
কেলিনু শৈবালে, ভুলি' কমল-কানন।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা, মাতৃ-কোষে রতনের রাজি ;
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে, ফিরি, ঘরে !"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষারূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

কালিদাস

কবিতা-নিকুঞ্জে তুমি, পিককুল-পতি !
কার গো না মজে মন ও-মধুর-স্বরে ?
শুনিয়াছি লোক-মুখে,—আপনি ভারতী,
সৃজি' মায়া-বলে সরঃ বনের ভিতরে,
নব নাগরীর বেশে তুষিলেন বরে
তোমায় ; অমৃত-রসে রসনা সিকতি',
আপনার স্বর্ণ-বীণা অরপিলা করে !—
সত্য কি হে, এ কাহিনী, কহ মহামতি ?
মিথ্যা বা কি ব'লে বলি ? . শৈলেন্দ্র-সদনে,
লভি' জন্ম মন্দাকিনী (আনন্দ জগতে !)
নাশেন কলুষ যথা এ তিন ভুবনে ;
সঙ্গীত-তরঙ্গ তব উথলি' ভারতে
(পুণ্যভূমি !), হে কবীন্দ্র, সুধা-বরিষণে
দেশ-দেশান্তরে কর্ণ তোষে সেই মতে !

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ।

পদ্মের মৃণাল

(১)

পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে ;
দেখিলাম সরোবরে ঘন ঘন দোলে—
কখন ডুবায় কায়, কভু ভাসে পুনরায়,
হেলে দুলে আশেপাশে তরঙ্গের কোলে—
পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে।
শ্বেত আভা স্বচ্ছ পাতা, পদ্ম শতদলে গাঁথা
উলটি পালটি বেগে স্রোতে ফেলে তোলে—
পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে।
একদৃষ্টে কতক্ষণ, কৌতুকে অবশ মন
দেখিতে শোকের বেগ ছুটিল কল্লোলে—
পদ্মের মৃণাল এক তরঙ্গের কোলে।

(২)

সহসা চিন্তার বেগ উঠিল উথলি ;
পদ্ম, জল, জলাশয় ভুলিয়া সকলি,
অদৃষ্টের নিবন্ধন, ভাবিয়া ব্যাকুল মন,
অই মৃণালের মত হায় কি সকলি ?
রাজা রাজমন্ত্রিলীলা বলবীর্য্য স্রোতঃশীলা
সকলি কি ক্ষণস্থায়ী দেখিতে কেবলি ?
অই মৃণালের মত নিস্তেজ সকলি !

অদৃষ্ট বিরোধী যার, নাহিক নিস্তার তার,
কিবা পশু পক্ষী আর মানবমণ্ডলী ?
লতা পশু কীট সম মানবেরো পরাক্রম,
জ্ঞান, বুদ্ধি, যত্ন-বলে বাঁধা কি সকলি ?
অই মৃণালের মত হায় কি সকলি ?

(৩)

কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল,
শাসন করিত যারা অবনীমণ্ডল ?
বলবীর্য্য-পরাক্রমে ভবে অবলীলাক্রমে
ছড়াইত মহিমার কিরণ উজ্জ্বল—
কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল ?
বাঁধিয়ে পাষাণস্তূপ অবনীতে অপরূপ,
দেখাইল মানবের কি কৌশল বল—
প্রাচীন মিসরবাসী—কোথা সে সকল ?
পড়িয়া রয়েছে স্তূপ, অবনীতে অপরূপ
কোথা তারা, এবে কারা হয়েছে প্রবল,
শাসন করিতে এই অবনীমণ্ডল ?

(৪)

জগতের অলঙ্কার আছিল যে জাতি,
জ্বালিল উন্নতিদীপ অরুণের ভাতি ;

অতুল অবনীতলে, এখনও মহিমা জ্বলে,

কে আছে সে নরধন্য কুলে দিতে বাতি ?

এই কি কালের গতি এই কি নিয়তি ?

ম্যারাথন্ থার্ম্পলি, হয়েছে শ্মশানস্থলী,

গিরীস আঁধারে আজ পোহাইছে রাতি,—

এই কি কালের গতি এই কি নিয়তি ?

যার পদচিহ্ন ধ'রে অন্য জাতি দম্ভ ক'রে,

আকাশ পয়োধি-নীরে ছড়াইত ভাতি—

জগতের অলঙ্কার কোথায় সে জাতি ?

(৫)

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ যার কোথায় সে রোম ?

কাঁপিত যাহার তেজে মহী সিন্ধু ব্যোম ?

ধরণীর সীমা যার, ছিল রাজ্য অধিকার,

সহস্র বৎসরাবধি একাদি নিয়ম—

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ আজি কোথায় সে রোম !

সাহস ঐশ্বর্য্যে যার ত্রিভুবন চমৎকার—

সে জাতি কোথায় আজি কোথা সে বিক্রম,

এমনি অব্যর্থ কি রে কালের নিয়ম ?

কি চিহ্ন আছে রে তার ? রাজপথ দুর্গে যার

পৃথিবী বন্ধন ছিল কোথায় সে রোম ?—

নিয়তির কাছে নর এত কি অক্ষম ?

(৬)

আরবের পারস্যের কি দশা এখন ?
সে তেজ নাহিক আর নাহি সে তর্জ্জন !
সৌভাগ্য-কিরণজালে উহারাই কোনকালে,
করেছিল মহাতেজে পৃথিবী শাসন।
আরবের পারস্যের কি দশা এখন !
পশ্চিমে হিস্পানাশেষ পূর্ব্বে সিন্ধু হিন্দুদেশ
কাফের যবনবৃন্দে করিল দমন,
উল্কাসম অকস্মাৎ হইল পতন।
'দীন্' ব'লে মহীতলে, যে কাণ্ড করিলা বলে,
সে দিনের কথা এবে হয়েছে স্বপন !
আরবের উপন্যাস অদ্ভুত যেমন।

(৭)

আজি এ ভারতে হায়, কেন হাহাধ্বনি !
কলঙ্ক লিখিতে কার কাঁদিছে লেখনী ?
তরঙ্গে তরঙ্গে নত পদ্মমৃণালের মত
পড়িয়া পরের পায় লুটায় ধরণী।
আজি এ ভারতে কেন হাহাকার ধ্বনি ?
জগতের চক্ষু ছিল, কত রশ্মি ছড়াইল,
সে দেশে নিবিড় আজ আঁধার রজনী—
পূর্ণগ্রাসে প্রভাকর নিস্তেজ যেমনি।

বুদ্ধি বীর্য্য বাহুবলে সুধন্য জগতীতলে,
ছিল যারা আজি তারা অসার তেমনি।
আজি এ ভারতে কেন হাহাকার ধ্বনি !

(৮)

কোথা বা সে ইন্দ্রালয় কোথা সে কৈলাস,
কোথা সে উন্নতি আশা কোথা সে উল্লাস ?
দম্ভে বসুন্ধরা 'পরে বেড়াইত তেজোভরে
আজি তারা ভয়ে ভীত হয়েছে হতাশ—
কোথা বা সে ইন্দ্রালয় কোথা সে কৈলাস ?
কত যত্নে কত যুগে বনবাসে কষ্ট ভুগে,
কালজয়ী হ'ল ব'লে করিত বিশ্বাস—
হায় রে সে ঋষিদের কোথা অভিলাষ ?
সে শাস্ত্র সে দর্শন, সে বেদ কোথা এখন ?
প'ড়ে আছে ইন্দ্রালয় ভাবিয়া হতাশ—
কোথা বা সে হিমালয় কোথা সে কৈলাস ?

(৯)

নিয়তির গতিরোধ হবে না কি আর ?
উঠিবে না কেহ কি রে উজলি আবার ?
মিসর পারস্য ভাতি গিরীক রোমীয় জাতি
ভারত থাকিবে কি রে চির-অন্ধকার ?
জাপান জিলণ্ডে নিশি পোহাবে এবার ?

যত্ন আশা পরিশ্রমে, খণ্ডিয়া নিয়তিক্রমে,
উঠিয়া প্রবল হ'তে পাবে না কি আর,
অই মৃণালের মত সহিবে প্রহার ?
না জানি কি আছে ভালে তাই গো মা এ কাঙ্গালে
মিশাইছে অশ্রুধারা ভস্মেতে তোমার,
ভারত কিরণময় হবে কি আবার ?

(১০)

তোর তরে কাঁদি আয় ফরাসী-জননি,
কোমল-কুসুম-আভা প্রফুল্ল-বদনী।
এত দিনে বুঝি সতি, ফিরিল কালের গতি,
হ'লে বুঝি দশাহীন ভারত যেমনি !
সভ্যজাতি মাঝে তুমি সভ্যতার খনি !
হ'ল যবে মহীতলে রোম দগ্ধ কালানলে,
তুমিই উজ্জ্বল ক'রে আছিলে ধরণী,
বীর-মাতা প্রভাময়ী সুচিরযৌবনি।
ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার ছিলে কতই যে প্রসবিলে
শিল্প নীতি নৃত্য গীত ! চকিত অবনী—
তোর তরে কাঁদি আয় ফরাসী-জননি !
বুঝি বা পড়িলে এবে কালের হিল্লোলে,
পদ্মের মৃণাল যথা তরঙ্গের কোলে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতসঙ্গীত *

"আর ঘুমাইও না দেখ চক্ষু মেলি
দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী,
কিবা সুসজ্জিত কিবা কুতূহলী,
বিবিধ-মানব-জাতিরে ল'য়ে।
মনের উল্লাসে, প্রবল আশ্বাসে,
প্রচণ্ড বেগেতে, গভীর বিশ্বাসে,
বিজয়ী পতাকা উড়ায়ে আকাশে,
দেখ হে ধাইছে অকুতোভয়ে।

হোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়,
পৃথিবী গ্রাসিতে করেছে আশয়,
হয়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্যবলে,

* ভারতবর্ষে যখন মোগল বাদসাহদিগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব এবং মোগল সৈন্যগণ ক্রমে ক্রমে ভারতভূমি আচ্ছন্ন করিয়া মহারাষ্ট্র-অঞ্চল আক্রমণ করে, তখন মাধবাচার্য্য নামে একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ স্বদেশের হীনতায় একান্ত দুঃখিত হইয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত নগরে নগরে এবং পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া বীরত্ব এবং উৎসাহ-প্রবর্দ্ধক গান করিয়া বেড়াইতেন। শিবাজীর সময় হইতে তাঁহার প্রণীত সঙ্গীত মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচলিত এবং অত্যন্ত আদরণীয় হয়। মাধবাচার্য্যের মৃত্যুর পর অন্যান্য গায়কেরা দেশে দেশে সেই গান করিয়া বেড়াইতেন। এই প্রবাদ অবলম্বন করিয়া ভারতসঙ্গীত লিখিত হইয়াছে।

ছাড়ে হুহুঙ্কার, ভূমণ্ডল টলে,
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে,
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।
মধ্যস্থলে হেথা আজন্মপূজিতা
চির-বীর্য্যবতী বীর-প্রসবিতা,
অনন্ত-যৌবনা যুনানী-মণ্ডলী,
মহিমা-ছটাতে জগৎ উজলি
কৌতুকে ভাসিয়া চলিয়া যায়।

আরব্য, মিশর, পারস্য, তুরকী,
তাতার, তিব্বত—অন্য কব কি?
চীন, ব্রহ্মদেশ, নবীন জাপান,
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয়জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!
বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

এই কথা বলি মুখে শিঙ্গা তুলি,
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,
নয়ন-জ্যোতিতে হানিয়ে বিজলী,
গায়িতে লাগিল জনেক যুবা।

আয়তলোচন উন্নতললাট,
সুগৌরাঙ্গ তনু সন্ন্যাসীর ঠাট,
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,
নয়নজ্যোতিতে হানিল বিজলী,
বদনে ভাতিল অতুল আভা।

নিনাদিল শৃঙ্গ করিয়া উচ্ছ্বাস,
"বিংশতি কোটী মানবের বাস,
এ ভারতভূমি যবনের দাস ?
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা।

আর্য্যাবর্ত্তজয়ী পুরুষ যাহারা
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা ?
জন কত শুধু প্রহরী পাহারা
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা ?

ধিক্ হিন্দুকুলে ! বীরধর্ম্ম ভুলে
আত্ম-অভিমান ডুবায়ে সলিলে
দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু-করতলে
সোণার ভারত করিতে ছার।

হীনবীর্য্য সম হয়ে কৃতাঞ্জলি
মস্তকে ধরিতে বৈরি-পদধূলি,
হাদে দেখ ধায় মহাকুতূহলী
ভারতনিবাসী যত কুলাঙ্গার !

এসেছিল যবে আর্য্যাবর্ত্তভূমে
দিক্ অন্ধকার করি তেজোধূমে,
রণ-রঙ্গ-মত্ত পূর্ব্বপিতৃগণ,
যখন তাহারা করেছিলা রণ,
করেছিলা জয় পঞ্চনদগণ,
তখন তাহারা ক'জন ছিল ?

আবার যখন জাহ্নবীর কূলে,
এসেছিলা তারা জয়ডঙ্কা তুলে,
যমুনা, কাবেরী, নর্ম্মদা-পুলিনে,
দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, দাক্ষিণাত্য বনে,
অসংখ্য বিপক্ষ পরাজয়ি রণে,
তখন তাহারা ক'জন ছিল ?

এখন তোরা যে শত কোটী তার,
স্বদেশ উদ্ধার করা কোন্ ছার,
পারিস্ শাসিতে হাসিতে হাসিতে,
সুমেরু অবধি কুমেরু হইতে,
বিজয়ী পতাকা ধরায় তুলিতে,
বারেক জাগিয়া করিলে পণ।

তবে ভিন্নজাতি শত্রুপদতলে,
কেন রে পড়িয়া থাকিস্ সকলে ?
কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন-শৃঙ্খলে,
স্বাধীন হইতে করিস্ মন ?

অই দেখ সেই মাথার উপরে,
রবি, শশী, তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপে দিক্ শোভা ক'রে
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখন(ও) বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যগিরি এখন(ও) উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখন(ও) ধাবিত,
পুরাকালে তারা যেরূপ ছিল।

কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশন সম
হিন্দু বীরদর্প বুদ্ধি পরাক্রম,
কাঁপিত যাহাতে স্থাবর জঙ্গম,
গান্ধার অবধি জলধি-সীমা?
সকলি ত আছে সে সাহস কই?
সে গম্ভীর জ্ঞান নিপুণতা কই?
প্রবল তরঙ্গ সে উন্নতি কই?
কোথা রে আজি সে জাতি-মহিমা!

হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি,
কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি?
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি!—
আর কি ভারত সজীব আছে?
সজীব থাকিলে এখনি উঠিত,
বীরপদভরে মেদিনী দুলিত,

"ভারতের নিশি প্রভাত হইত,
হায় রে সে দিন ঘুচিয়া গেছে।"

এই কথা বলি অশ্রুবিন্দু ফেলি,
ক্ষণমাত্র যুবা শৃঙ্গনাদ ভুলি,
পুনর্ব্বার শৃঙ্গ মুখে নিল তুলি,
গর্জ্জিয়া উঠিল গম্ভীর স্বরে,
"এখন(ও) জাগিয়া উঠ রে সবে,
এখন(ও) সৌভাগ্য উদয় হবে,
রবি-কর সম দ্বিগুণ প্রভাবে,
ভারতের মুখ উজ্জ্বল ক'রে।

একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র মিলে
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে
তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা।
জপ তপ আর যোগ আরাধনা,
পূজা, হোম, যাগ, প্রতিমা-অর্চ্চনা
এ সকলে এবে কিছুই হবে না,
তূণীর-কৃপাণে কর রে পূজা।

যাও সিন্ধুনীরে ভূধর-শিখরে
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে,
বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধ'রে
স্বকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হও।

তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে
প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হ'তে,
স্বাধীনতারূপ রতনে মণ্ডিতে,
যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও ॥

ছিল বটে আগে তপস্যার বলে,
কার্য্যসিদ্ধি হ'ত এ মহীমণ্ডলে,
আপনি আসিয়া ভক্ত-রণস্থলে
সংগ্রাম করিত অমরগণ।
এখন সে দিন নাহিক রে আর,
দেব-আরাধনে ভারত-উদ্ধার
হবে না—হবে না—খোল তরবার,
এ সব দৈত্য নহে তেমন ॥

অস্ত্র-পরাক্রমে হও বিশারদ
রণ-রঙ্গ-রসে হও রে উন্মাদ—
তবে সে বাঁচিবে ঘুচিবে বিপদ্
জগতে যদ্যপি থাকিতে চাও ॥
কিসের লাগিয়া হলি দিশেহারা,
সেই হিন্দুজাতি সেই বসুন্ধরা,
জ্ঞানবুদ্ধিজ্যোতি তেমতি প্রখরা,
তবে কেন ভূমে প'ড়ে লুটাও ॥

অই দেখ সেই মাথার উপরে,
রবি, শশী, তারা দিন দিন ঘোরে,

ঘুরিত যেরূপে দিক্ শোভা ক'রে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখন(ও) বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখন(ও) উন্নত,
সেই জাহ্নবী-বারি এখন(ও) ধাবিত,
কেন সে মহত্ত্ব হবে না উজ্জ্বল?

বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?"

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিন্ধুতট

নির্ম্মল আনন্দরাশি, নির্ম্মল আনন্দ হাসি,
প্রভাসের মহাসিন্ধু! আনন্দ নির্ম্মল,—
জলরাশি; হাসি,—লীলা তরঙ্গ চঞ্চল;
অপরাহ্ণ,—বসন্তের শুক্লা চতুর্দ্দশী।

আনন্দ রবির কর, আনন্দ সুনীলাম্বর,
প্রকৃতি আনন্দময়ী ষোড়শী রূপসী।
আনন্দের সচঞ্চল লীলা রত্নাকর!
আনন্দের অচঞ্চল লীলা নীলাম্বর!
নীলিমায় নীলিমায়, মহিমায় মহিমায়,
মিশাইয়া পরস্পরে—মহা আলিঙ্গন!
মহাদৃশ্য!—অনন্তের অনন্ত মিলন!
নীলসিন্ধু, শ্বেতবেলা; বেলায় তরঙ্গ-খেলা
দিতেছে বেলায় সিন্ধু শ্বেতপুষ্পহার,
গাহিয়া আনন্দগীত, চুম্বি অনিবার।
সিন্ধু-বক্ষে বেলা, যেন বিষ্ণু-বক্ষে বাণী,
সান্ধ্য রবিকরে হাসে বেলা সিন্ধুরাণী।

বিচিত্র শিবিরশ্রেণী, শত সংখ্যাতীত,
বিচিত্র কেতন শিরে, শোভিতেছে সিন্ধুতীরে,
সিন্ধু মত সিন্ধুপ্রিয়া করি তরঙ্গিত।
আসিছে যাদবগণ—আসিয়াছে কত,—
গজপৃষ্ঠে, অশ্বে, রথে, নানা দিকে, নানা পথে,
কল্লোলিত সিন্ধুপ্রিয়া করি সিন্ধু মত।
কিছু দূর মনোহর বঙ্কিম বেলায়,
নীল গগনের পটে অমল বিভায়,
কৃষ্ণের শিবিরশ্রেণী তুলি উর্দ্ধে শির
শোভিতেছে যেন দেব পবিত্র মন্দির।
শিবির-চূড়ায় স্বর্ণ-ধ্বজে নিরুপম,

নীল কেতনের বক্ষে, পীত সুদর্শন,
কি লীলা সমুদ্রতীরে, সমুদ্র অনিলে ধীরে
করিছে মহিমময় ! সিন্ধু অবিরাম
অসংখ্য তরঙ্গ-করে করিছে প্রণাম।

নবীনচন্দ্র সেন।

অহল্যার প্রতি

কি স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশি,
অহল্যা, পাষাণরূপে ধরাতলে মিশি',
নির্ব্বাপিত-হোম-অগ্নি তাপস-বিহীন
শূন্য তপোবনচ্ছায়ে ? আছিলে বিলীন
বৃহৎ পৃথ্বীর সাথে হয়ে এক-দেহ,
তখন কি জেনেছিলে তা'র মহাস্নেহ ?
ছিল কি পাষাণ-তলে অস্পষ্ট চেতনা ?
জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা,
মাতৃধৈর্য্যে মৌন মূক দুঃখ সুখ যত
অনুভব করেছিলে স্বপনের মত
সুপ্ত আত্মা মাঝে ? দিবারাত্রি অহরহ
লক্ষ কোটী পরাণীর মিলন, কলহ,

আনন্দ-বিষাদ-ক্ষুব্ধ ক্রন্দন, গর্জ্জন,
অযুত পান্থের পদধ্বনি অনুক্ষণ
পশিত কি অভিশাপ-নিদ্রা ভেদ ক'রে
কর্ণে তোর, জাগাইয়া রাখিত কি তোরে
নেত্রহীন মূঢ় রূঢ় অর্দ্ধ জাগরণে ?
বুঝিতে কি পেরেছিলে আপনার মনে
নিত্য নিদ্রাহীন ব্যথা মহাজননীর ?
যে দিন বহিত নব বসন্ত-সমীর,
ধরণীর সর্ব্বাঙ্গের পুলক-প্রবাহ
স্পর্শ কি করিত তোরে ? জীবন-উৎসাহ
জাগা'ত কি অপরূপ কম্প তব দেহে ?
যামিনী পশিত যবে মানবের গেহে,
ধরণী লইত টানি' শ্রান্ত তনুগুলি
আপনার বক্ষ'পরে, দুঃখ শ্রম ভুলি'
ঘুমাত অসংখ্য জীব—জাগিত আকাশ—
তাদের শিথিল অঙ্গ, সুষুপ্ত নিশ্বাস
বিভোর করিয়া দিত ধরণীর বুক,
মাতৃ-অঙ্গে সেই কোটী জীবস্পর্শ সুখ—
কিছু তা'র পেয়েছিলে আপনার মাঝে ?

যে গোপন অন্তঃপুরে জননী বিরাজে,—
বিচিত্রিত যবনিকা পত্রপুষ্পজালে
বিবিধ বর্ণের লেখা, তা'রি অন্তরালে
রহিয়া অসূর্য্যম্পশ্য, নিত্য চুপে চুপে
ভরিছে সন্তান-গৃহ ধনধান্যরূপে

জীবনে যৌবনে,—সেই গূঢ় মাতৃকক্ষে
সুপ্ত ছিলে এত কাল ধরণীর বক্ষে,
চিররাত্রিসুশীতল বিস্মৃতি-আলয়ে ;
যেথায় অনন্তকাল ঘুমায় নির্ভয়ে
লক্ষ জীবনের ক্লান্তি ধূলির শয্যায় ;
নিমেষে নিমেষে যেথা ঝরে' প'ড়ে যায়
দিবসের তাপে শুষ্ক ফুল, দগ্ধ তারা,
জীর্ণ কীর্ত্তি, শ্রান্ত সুখ, দুঃখ দাহহারা।
সেথা স্নিগ্ধ হস্ত দিয়ে পাপতাপরেখা
মুছিয়া দিয়াছে মাতা ; দিলে আজি দেখা
ধরিত্রীর সদ্যোজাত কুমারীর মত
সুন্দর সরল শুভ্র ; হ'য়ে বাক্যহত
চেয়ে আছ প্রভাতের জগতের পানে ;
যে শিশির প'ড়ে ছিল তোমার পাষাণে
রাত্রিবেলা, এখন সে কাঁপিছে উল্লাসে
আজানুচুম্বিত মুক্ত কৃষ্ণ কেশপাশে।
যে শৈবাল রেখেছিল ঢাকিয়া তোমায়
ধরণীর শ্যাম-শোভা অঞ্চলের প্রায়
বহু বর্ষ হ'তে—পেয়ে বহু বর্ষাধারা
সতেজ, সরস, ঘন—এখনো তাহারা
লগ্ন হ'য়ে আছে তব নগ্ন গৌর দেহে
মাতৃদত্ত বস্ত্রখানি সুকোমল স্নেহে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শেষ খেয়া

দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোম্‌টা-পরা ঐ ছায়া
ভুলাল রে ভুলাল মোর প্রাণ।
ও পারেতে সোনার কূলে আঁধার মূলে কোন্ মায়া
গেয়ে গেল কাজ-ভাঙানো গান।
নামিয়ে মুখ চুকিয়ে সুখ যাবার মুখে যায় যারা
ফেরার পথে ফিরেও নাহি চায়,
তাদের পানে ভাঁটার টানে যাব রে আজ ঘর-ছাড়া;
সন্ধ্যা আসে দিন যে চলে যায়।
ওরে আয়!
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিন-শেষের শেষ খেয়ায়!

সাঁজের বেলা ভাঁটার স্রোতে ও পার হ'তে এক-টানা
একটি দুটি যায় যে তরী ভেসে।
কেমন ক'রে চিন্‌ব ও রে ওদের মাঝে কোন্‌খানা
আমার ঘাটে ছিল আমার দেশে।
অস্তাচলে তীরের তলে ঘন গাছের কোল ঘেঁসে
ছায়ায় যেন ছায়ার মত যায়,
ডাক্‌লে আমি ক্ষণেক থামি হেথায় পাড়ি ধর্‌বে সে
এমন নেয়ে আছে রে কোন্ নায়?

ওরে আয় !
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিন-শেষের শেষ খেয়ায় !

ঘরেই যারা যাবার তারা কখন্ গেছে ঘরপানে
পারে যারা যাবার গেছে পারে ;
ঘরেও নহে পারেও নহে যে জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে !
ফুলের বার নাইক আর ফসল যার ফল্ল না,
চোখের জল ফেল্‌তে হাসি পায়,
দিনের আলো যার ফুরালো সাঁজের আলো জ্বল্ল না,
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।
ওরে আয় !
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
বেলা-শেষের শেষ খেয়ায় !

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বৈরাগ্য

কহিল গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী—
"গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি'।
কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে এখানে!"
দেবতা কহিলা—"আমি!"—শুনিল না কানে।
সুপ্তিমগ্ন শিশুটিরে আঁকড়িয়া বুকে
প্রেয়সী শয্যার প্রান্তে ঘুমাইছে সুখে।
কহিল—"কে তোরা ওরে মায়ার ছলনা!"
দেবতা কহিলা—"আমি!"—কেহ শুনিল না!
ডাকিল শয়ন ছাড়ি'—"তুমি কোথা প্রভু!"—
দেবতা কহিলা—"হেথা!"—শুনিল না তবু!
স্বপনে কাঁদিল শিশু জননীরে টানি',—
দেবতা কহিলা—"ফির!"—শুনিল না বাণী!
দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি' কহিলেন—"হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়!"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতলক্ষ্মী

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী !
অয়ি নির্ম্মল সূর্য্যকরোজ্জ্বল ধরণী
জনক-জননী-জননী !

নীল-সিন্ধু-জল-ধৌত চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল,
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী !

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে,
জ্ঞানধর্ম্ম কত কাব্যকাহিনী !

চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত করুণা
পুণ্যপীযুষ স্তন্যবাহিনী ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

প্রমীলার চিতারোহণ

খুলিল পশ্চিম-দ্বার অশনি-নিনাদে।
বাহিরিল লক্ষ রক্ষঃ স্বর্ণ-দণ্ড করে,
কৌষিক পতাকা তাহে উড়িছে আকাশে!
রাজপথ-পার্শ্বদ্বয়ে চলে সারি সারি!
নীরবে পতাকিকুল। সর্ব্বাগ্রে দুন্দুভি
করিপৃষ্ঠে, পূরে দেশ গম্ভীর আরাবে।
পদব্রজে পদাতিক কাতারে কাতারে;
বাজিরাজী সহ গজ; রথিবৃন্দ রথে
মৃদুগতি, বাজে বাদ্য সকরুণ ক্বণে!
যত দূর চলে দৃষ্টি, চলে সিন্ধুমুখে
নিরানন্দে রক্ষোদল! ঝক ঝক ঝকে
স্বর্ণ বর্ম্ম ধাঁধি আঁখি! রবিকর-তেজে
শোভে হৈমধ্বজদণ্ড; শিরোমণি শিরে;
অসিকোষ সারসনে; দীর্ঘ শূল হাতে;—
বিগলিত অশ্রুধারা, হায় রে, নয়নে!
বাহিরিল বীরাঙ্গনা (প্রমীলার দাসী)
পরাক্রমে ভীমাসমা, রূপে বিদ্যাধরী,
রণ-বেশে—কৃষ্ণ হয়ে নৃমুণ্ডমালিনী,—
মলিন বদন, মরি শশিকলাভাবে
নিশা যথা! অবিরল ঝরে অশ্রুধারা,
তিতি বস্ত্র, তিতি অশ্ব, তিতি বসুধারে!

উচ্ছ্বাসিছে কোন বামা ; কেহ বা কাঁদিছে
নীরবে ; চাহিছে কেহ রঘুসৈন্য পানে
অগ্নিময় আঁখি রোষে, বাঘিনী যেমনি
(জালাবৃত) ব্যাধবর্গে হেরিয়া অদূরে !
হায় রে কোথা সে হাসি—সৌদামিনী-ছটা !
কোথা সে কটাক্ষ-শর, কামের সমরে
সর্ব্বভেদী ? চেড়ীবৃন্দ মাঝারে বড়বা,
শূন্যপৃষ্ঠ, শোভাশূন্য, কুসুম-বিহনে
বৃন্ত যথা ! ঢুলাইছে চামর চৌদিকে
কিঙ্করী, চলিছে সঙ্গে বামাব্রজ কাঁদি
পদব্রজে ; কোলাহল উঠিছে গগনে ।
প্রমীলার বীর-বেশ শোভে ঝলমলে
বড়বার পৃষ্ঠে—অসি, চর্ম্ম, তূণ, ধনুঃ,
কিরীট-মণ্ডিত, মরি, অমূল্য রতনে ।
সারসন মণিময় ; কবচ খচিত
সুবর্ণে—মলিন দোঁহে । সারসন স্মরি,
হায় রে, সে সরু কটি ! কবচ ভাবিয়া
সে সু-উচ্চ কুচযুগে—গিরিশৃঙ্গসম !
ছড়াইছে খই, কড়ি, স্বর্ণমুদ্রা-আদি
অর্থ, দাসী ; সকরুণে গাইছে গায়কী,
পেশল উরস্ হানি কাঁদিছে রাক্ষসী ।

বাহিরিল মৃদুগতি রথবৃন্দ মাঝে
রথবর ঘনবর্ণ, বিজলীর ছটা
চক্রে ; ইন্দ্রচাপরূপী ধ্বজ চূড়দেশে ;—

কিন্তু কান্তিশূন্য আজি, শূন্যকান্তি যথা
প্রতিমাপঞ্জর, মরি, প্রতিমাবিহনে
বিসর্জ্জন-অন্তে! কাঁদে ঘোর কোলাহলে
রক্ষোরথী, ক্ষণ বক্ষঃ হানি মহাক্ষেপে
হতজ্ঞান! রথমধ্যে শোভে ভীমধনুঃ,
তূণীর, ফলক, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র, গদা-
আদি অস্ত্র; সু-কবচ; সৌরকর-রাশি-
সদৃশ কিরীট; আর বীর-ভূষা যত।
সকরুণ গীতে গীতি গাইছে কাঁদিয়া
রক্ষোদুঃখ! স্বর্ণমুদ্রা ছড়াইছে কেহ,
ছড়ায় কুসুম যথা নড়ি ঘোর ঝড়ে
তরু! সুবাসিত জল ঢালে জলবহ,
দমি উচ্চগামী রেণু, বিরত সহিতে
পদভর। চলে রথ সিন্ধুতীরমুখে।

সুবর্ণ শিবিকাসনে, আবৃত কুসুমে,
বসেন শবের পাশে প্রমীলা সুন্দরী,—
মর্ত্ত্যে রতি মৃত-কাম সহ সহগামী!
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু, গলে ফুলমালা;
কঙ্কণ মৃণালভুজে; বিবিধ ভূষণে
ভূষিতা রাক্ষসবধূ। ঢুলাইছে কাঁদি
চামরিণী সু-চামর; কাঁদি ছড়াইছে
ফুলরাশি বামাবৃন্দ। আকুল বিষাদে,
রক্ষঃকুল-নারীকুল কাঁদে হাহা রবে।
হায় রে, কোথা সে জ্যোতিঃ ভাতিত যে সদা

মুখচন্দ্রে ? কোথা, মরি, সে সুচারু হাসি,
মধুর অধরে নিত্য শোভিত যে, যথা
দিনকরকররাশি তোর বিম্বাধরে,
পঙ্কজিনি ? মৌনব্রতে ব্রতী বিধুমুখী—
পতির উদ্দেশে প্রাণ ও-বরাঙ্গ ছাড়ি
গেছে যেন যথা পতি বিরাজেন এবে !
শুকাইলে তরুরাজ, শুকায় রে লতা,
স্বয়ংবরা বধূ ধনী। কাতারে কাতারে,
চলে রক্ষোরথী সাথে, কোষশূন্য অসি
করে, রবিকর তাহে ঝলে ঝল ঝলে,
কাঞ্চন-কঞ্চুকবিভা নয়ন ঝলসে !
উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে ;
বহে হবির্ব্বহ হোত্রী মহামন্ত্র জপি ;
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর, কুঙ্কুম, পুষ্প বহে রক্ষোবধূ
স্বর্ণপাত্রে ; স্বর্ণকুম্ভে পূত অম্ভোরাশি
গাঙ্গেয়। সুবর্ণদীপ দীপে চারিদিকে।
বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে ;
বাজে করতাল, বাজে মৃদঙ্গ, ডুম্বকী ;
বাজিছে ঝাঁঝরী, শঙ্খ ; দেয় হুলাহুলি
সধবা রাক্ষসনারী আর্দ্র অশ্রুনীরে—
হায় রে, মঙ্গলধ্বনি অমঙ্গল দিনে !

বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুলরাজ
রাবণ ;—বিশদ বস্ত্র, বিশদ উত্তরী,

ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে ;
চারিদিকে মন্ত্রিদল দূরে নতভাবে।
নীরব কর্ব্বুরপতি অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
নীরব সচিববৃন্দ, অধিকারী যত
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ। বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে
রক্ষঃপুরবাসী রক্ষঃ—আবাল-বনিতা-
বৃদ্ধ ; শূন্য করি পুরী, আঁধার রে এবে
গোকুলভবন যথা শ্যামের বিহনে !
ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে, তিতি অশ্রুনীরে,
চলে সবে, পূরি দেশ বিষাদ-নিনাদে !

কহিলা অঙ্গদে প্রভু সুমধুর স্বরে ;—
"দশ শত রথী সঙ্গে যাও মহাবলী
যুবরাজ, রক্ষঃসহ মিত্রভাবে তুমি,
সিন্ধুতীরে ! সাবধানে যাও হে সু-রথী !
আকুল পরাণ মম রক্ষঃকুলশোকে।
এ বিপদে পরাপর নাই ভাবি মনে,
কুমার ! লক্ষ্মণশূরে হেরি পাছে রোষে,
পূর্ব্ব কথা স্মরি মনে কর্ব্বুরাধিপতি,
যাও তুমি যুবরাজ ! রাজচূড়ামণি,
পিতা তব বিমুখিলা সমরে রাক্ষসে,
শিষ্টাচারে, শিষ্টাচার, তোষ তুমি তারে !"

দশ শত রথী সাথে চলিলা সু-রথী
অঙ্গদ সাগরমুখে। আইলা আকাশে
দেবকুল ;—ঐরাবতে দেবকুলপতি,

সঙ্গে বরাঙ্গনা শচী অনন্তযৌবনা,
শিখিধ্বজে শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি
সেনানী ; চিত্রিত রথে চিত্ররথ রথী ;
মৃগে বায়ুকুলরাজ ; ভীষণ মহিষে
কৃতান্ত ; পুষ্পকে যক্ষ, অলকার পতি ;—
আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি,
মলিন তপনতেজে ; আইলা সুহাসী
অশ্বিনীকুমারযুগ, আর দেব যত।
আইলা সুরসুন্দরী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা,
কিন্নর, কিন্নরী। রঙ্গে বাজিল অম্বরে
দিব্য বাদ্য। দেব-ঋষি আইলা কৌতুকে,
আর আর প্রাণী যত ত্রিদিবনিবাসী।
উতরি সাগরতীরে, রচিলা সত্বরে
যথাবিধি চিতা রক্ষঃ; বহিল বাহকে
সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে।
মন্দাকিনী পূতজলে ধুইয়া যতনে
শবে, সু-কৌষিক বস্ত্র পরাই, থুইল
দাহস্থানে রক্ষোদল ; পড়িলা গম্ভীরে
মন্ত্র রক্ষঃ-পুরোহিত। অবগাহি দেহ
মহাতীর্থে সাধ্বী সতী প্রমীলা সুন্দরী
খুলি রত্ন-আভরণ, বিতরিলা সবে
প্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভাষিণী,
সম্ভাষি মধুরভাষে দৈত্যবালাদলে,
কহিলা ;—"লো সহচরি, এতদিনে আজি

ফুরাইল জীব-লীলা জীবলীলা-স্থলে
আমার ! ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে ।
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,
বাসন্তি ! মায়েরে মোর—" হায় রে, বহিল
সহসা নয়নজল ! নীরবিলা সতী ;—
কাঁদিল দানববালা হাহাকার রবে !
মুহূর্ত্তে সংবরি শোক কহিলা সুন্দরী ;—
"কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এত দিনে ! যাঁহার হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতা মাতা, চলিনু লো আজি তাঁর সাথে ;—
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে ?
আর কি কহিব, সখি ! ভুল না লো তারে—
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে ।"
চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন !)
বসিলা আনন্দমতি পতি-পদ-তলে ;
প্রফুল্ল কুসুমদাম কবরী-প্রদেশে ।
বাজিল রাক্ষসবাদ্য ; উচ্চে উচ্চারিল
বেদ বেদী ; রক্ষোনারী দিল হুলাহুলি ;
সে রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে
হাহারব ! পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে ।
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর, কুঙ্কুম-আদি দিল রক্ষোবালা
যথাবিধি ; পশুকুলে নাশি তীক্ষ্ণশরে

ঘৃতাক্ত করিয়া রক্ষঃ যতনে থুইল
চারিদিকে, যথা মহানবমীর দিনে,
শাক্ত ভক্ত-গৃহে, শক্তি, তব পীঠতলে !
অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে ;—
"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে,—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা ! কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা ?—ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে !
ছিল আশা, রক্ষঃকুলরাজসিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ ! বৃথা আশা ! পূর্ব্বজন্ম-ফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে !
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চির-রাহু-গ্রাসে !
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল ? কেমনে ফিরিব,—
হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর ? কি সান্ত্বনাচ্ছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে ?
'কোথা পুত্র পুত্রবধূ আমার ?' সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী,—'কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি ?'—
কি ক'য়ে বুঝাব তারে ? হায় রে, কি ক'য়ে ?

হা পুত্র ! হা বীরশ্রেষ্ঠ ! চিরজয়ী রণে !
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি ! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?"
অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে !
নড়িল মস্তকে জটা ; ভীষণ গর্জ্জনে
গর্জ্জিল ভুজঙ্গবৃন্দ ; ধক ধক ধকে
জ্বলিল অনল ভালে ; ভৈরব কল্লোলে
কল্লোলিলা ত্রিপথগা, বরিষায় যথা
বেগবতী স্রোতস্বতী পর্ব্বতকন্দরে !
কাঁপিল কৈলাসগিরি থর থর থরে !
কাঁপিল আতঙ্কে বিশ্ব ; সভয়ে অভয়া
কৃতাঞ্জলিপুটে সাধ্বী কহিলা মহেশে ;—
"কি হেতু সরোষ, প্রভু, কহ তা দাসীরে ?
মরিল সমরে রক্ষঃ বিধির বিধানে ;
নহে দোষী রঘুরথী ! তবে যদি নাশ
অবিচারে তারে, নাথ, কর ভস্ম আগে
আমায় ।" চরণযুগ ধরিলা জননী ।
সাদরে সতীরে তুলি কহিল ধূর্জ্জটি ;—
"বিদরে হৃদয় মম, নগরাজবালে,
রক্ষোদুঃখে । জান তুমি কত ভালবাসি
নৈকষেয় শূরে আমি ! তব অনুরোধে,
ক্ষমিব, হে ক্ষেমঙ্করি, শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ।"
আদেশিলা অগ্নিদেবে বিষাদে ত্রিশূলী ;—
"পবিত্রি, হে সর্ব্বশুচি, তোমার পরশে

"আন শীঘ্র এ সু-ধামে রাক্ষস-দম্পতী।"
ইরম্মদরূপে অগ্নি ধাইলা ভূতলে!
সহসা জ্বলিল চিতা। সচকিতে সবে
দেখিলা আগ্নেয় রথ; সুবর্ণ-আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসববিজয়ী
দিব্যমূর্ত্তি! বামভাগে প্রমীলা রূপসী,
অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনু দেশে,
চিরসুখহাসিরাশি মধুর-অধরে!
উঠিল গগন-পথে রথবর বেগে;
বরষিলা পুষ্পাসার দেবকুল মিলি;
পূরিল বিপুল বিশ্ব আনন্দ-নিনাদে!
দুগ্ধধারে নিবাইল উজ্জ্বল পাবকে
রাক্ষস। পরম যত্নে কুড়াইলা সবে
ভস্ম, অম্বুরাশিতলে বিসর্জ্জিলা তাহে।
ধৌত করি দাহস্থল জাহ্নবীর জলে
লক্ষ রক্ষঃশিল্পী আশু নির্ম্মিল মিলিয়া
স্বর্ণ-পাটিকেলে মঠ চিতার উপরে;—
ভেদি অভ্র, মঠচূড়া উঠিল আকাশে।
করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে!
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

পাণ্ডব-গৌরব

দ্বারকার কক্ষ

(শ্রীকৃষ্ণ ও ভীম)

কৃষ্ণ। এস ভাই, এস বৃকোদর!
দণ্ডীরে এনেছ সঙ্গে লয়ে?

ভীম। না জানি কি গুরু অপরাধে,
বহু লজ্জা দিয়েছ শ্রীহরি!
ত্রিভুবন অযশ গাহিবে,
দুর্য্যোধন সহায় হইলে
অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে হয় সাধ।
হে মুরারি, তব পদ স্মরি করিয়াছি পণ,
রণে দুর্য্যোধনে করিব নিধন,—
গদাঘাতে ভাঙ্গি উরু।
মরমে দহিয়ে, তোমারে স্মরিয়ে,
পাঞ্চালী খুলেছে বেণী ;—
যা'ক মম প্রতিজ্ঞা অতলে,
রহুক দ্রৌপদী এলোকেশী চিরদিন,
কুশলে কৌরব রহুক হস্তিনাপুরে,
খেদ নাহি করি।
কিন্তু আশ্রিতে ত্যজিব,

এ কলঙ্ক অর্পিতে মাথায়,
ইচ্ছা কি হে তব ইচ্ছাময় ?
সন্ধি হেতু আসি নাই চক্রধারী।

কৃষ্ণ। কহ বীর কিবা প্রয়োজন ?
কহ তব কিবা হেতু আগমন ?

ভীম। মিনতি দাসের এই রাখ যদুপতি,
উপস্থিত রণ, আমার কারণ—
আমি তব অরি,
নহে আর চারি পাণ্ডব বিরোধী তব ;
বধিয়া আমায়—বিবাদ ঘুচাও প্রভু।
আসিয়াছি দ্বৈরথ-সমর আকিঞ্চনে,
অকিঞ্চনে করো না বঞ্চনা,
বাঞ্ছাকল্পতরু তব নাম।

কৃষ্ণ। বুঝিয়াছি বৃকোদর তব অহঙ্কার ;
তুমি বলবান্,
বাহুবলে নাহিক সমান তব,
তাই চাও যুদ্ধ মম সনে।
বুঝেছি কৌশল,
কিন্তু তুমি যদধিক ছল,
তা হ'তে অধিক ছল আমি।
বুঝাও আমায়,—
শত্রু নহে আর চারি ভ্রাতা তব !
বুদ্ধিহীন হেন কি ভেবেছ মোরে ?
প্রশ্রয় তোমায় নাহি দিলে যুধিষ্ঠির,

বল না কেমনে,
দণ্ডী সহ কর বাস বিরাটনগরে ?
কেন বা অর্জ্জুন ভ্রমিয়া ভুবন,
সহায় করিবে যত ক্ষত্র রাজগণে ?
সহদেব নকুল ছু'জনে,
প্রাণপণে যুদ্ধ-আয়োজন কেন করে ?
কহি আমি শুনেছি যেমন।

ভীম। গিরিধারী,
নাহি বাহুবল তব,
চাহ বুঝাইতে,
তোমা হ'তে আমি বলাধিক !
ক্ষত্রিয়সমাজে,
কথা বটে সম্মানসূচক !
ছল নহি আমি—অতি ছল তুমি,
মুক্তকণ্ঠে করি হে স্বীকার।
ছলে চাহ ভুলাইতে,
ছলে কহ আশ্রিতে ত্যজিতে,
চতুরের চূড়ামণি তুমি !
কিন্তু শুন চিন্তামণি,
কল্পতরু ধর নাম,—
মিথ্যাবাদী নহে যুধিষ্ঠির !—
অনল সমান হৃদি দগ্ধ হয় অপমানে,
সে অনল নির্ব্বাণ কারণে,—
স্থান চাই তোমার চরণে।

সূতপুত্র কৌরবের ক্রীতদাস,
তাহারে সাধিল মাতা সাহায্য কারণ ;
স্বচক্ষে নেহারি—তবু প্রাণ ধরি,
করি নাই আঁখি উৎপাটন !
দেহ রণ—লজ্জা রাখ লজ্জানিবারণ !
কণ্ঠে প্রাণ থাকিতে আমার,
দুর্য্যোধন-মৃত্যু নাহি হয়।
গদাধর, বধিয়া আমায়,
অপমানে কর ত্রাণ !

কৃষ্ণ। সমবল সহ রণ ক্ষত্রিয়-নিয়ম।
যেই জরাসন্ধ সহ রণে
ভঙ্গ দিছি কতবার,
তৃণবৎ ছিঁড়িলে তাহারে !
ধরেছিনু ক্ষুদ্র গোবর্দ্ধন—
কিন্তু তব চরণের ঘায়,
গিরিশির চূর্ণ শত শত !
নাহি হেন শক্তি মম জিনিব সবায়,
লব তুরঙ্গিণী এই প্রতিজ্ঞা আমার,
ছলে বলে কৌশলে রাখিব সেই পণ।
পাইয়াছ অপমান চাহ বুঝাইতে,
কিন্তু কোন মতে
স্থান মম নাহি পায় চিতে।
জানিতাম সরল তোমায়,—
দেখি, তুমি আমা হতে অধিক চতুর।

ভাল,
বল দেখি কিসে তুমি হতমান ?

ভীম। বুঝেও না বুঝে যেই জন,
কথায় শকতি নাহি বুঝাতে তাহায় !
রাধার নন্দন কর্ণ শত্রু বাল্যাবধি,
করিল পাণ্ডব-মাতা তাহারে মিনতি।
পাণ্ডবের কুলনারী আনি কেশে ধরি,
যেই অরি উরু দেখাইল,
সভামাঝে বসন হরণ—
করেছিল আকিঞ্চন,—
তারে পাণ্ডব-প্রধান, করিয়ে সম্মান,
আবাহন করিল সমরে হ'তে সাথী ;
হা কৃষ্ণ, এ হ'তে কিবা
হবে হে দুর্গতি ?
জানা'ব কাহায় ? দীর্ঘশ্বাস ঢালি তব পায়,
সেই তপ্ত শ্বাসে—
দগ্ধ হোক্ চরণ তোমার !

কৃষ্ণ। ভাল ভাল শঠ বৃকোদর,
ঘুচাইলে চতুরালী অহঙ্কার !
কর্ণ সহ কুন্তীদেবী কি কথা কহিল,
জানি আমি সে গুহ্যবারতা ;
শত্রু তুমি, কি হেতু তোমারে কব ?
মাতৃজ্ঞান করে কর্ণ তাঁরে,
আসন্ন-সমরে, পদ বন্দিবারে,

করেছিল আকিঞ্চন,
দরশন পেয়েছিল সে কারণে তাঁর।
কৌরব-পাণ্ডবে যদি মিলে এ আহবে,
তাহে তব কিবা অপমান ?
বাড়িবে কেবল ভারতবংশের মান ;
তোমার সম্মান অধিক বাড়িবে তাহে।
মম ডরে দণ্ডীরে ত্যজিল দুর্য্যোধন,
কিন্তু যথা—
অনল-সদনে উত্তাপিত হয় কায়,
সেইরূপ তোমার প্রভায়,
প্রভান্বিত দুর্য্যোধন।
অতুল বীরত্ব তব ক্ষত্রিয়-ব্যভার—
পশিয়াছে হৃদয়ে তাহার ;
ক্ষত্রধর্ম্ম শিখিয়াছে ক্ষত্রিয়-সমাজ,
তব উচ্চ আদর্শ হেরিয়ে।
তাই ভয়ে যারে করিল বর্জ্জন,
তাহার রক্ষণে পুনঃ প্রবেশিল রণে।
যাও যাও—কি বুঝাও ভীমসেন ?
চাহ বধিয়া আমায় বিপদ্ করিতে দূর,
চাহ ভ্রাতৃগণের কল্যাণ ?
ভাব মনে ত্রিভুবন আমার সহায়,
পাছে হয় অকল্যাণ ভ্রাতার কাহারো ;
তাই ছল করি আসি দ্বারকায়
পূরাইবে অভিলাষ।

যাও যাও—
দ্বন্দ্বযুদ্ধ তোমা সহ কভু না করিব।

ভীম। অতি ছল, অতি খল, অতীব কুটিল,
তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল!
তুমি লজ্জাহীন,
তোমারে কি লজ্জা দিব?
সম তব মান-অপমান,
নহে ক্ষত্র হ'য়ে কহ কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়-সদনে,
পরাজয়-ভয়ে রণে হও পরাঙ্মুখ।
নিন্দা-স্তুতি সমান তোমার,
কি হইবে রুষ্ট কথা ক'য়ে।
কিন্তু নাম ধর ভক্তাধীন,
কায় মন প্রাণ অর্পণ করেছি রাঙ্গা পায়,
তথাপি যগুপি তুমি না বুঝ বেদনা—
রণস্থলে দেবতামণ্ডলে,
উচ্চকণ্ঠে করিব প্রচার—
নহ তুমি লজ্জানিবারণ,
নহ কভু ভক্তাধীন!
নহে কেন কর হতমান?
হ'লে কণ্ঠাগত প্রাণ,
কৃষ্ণনাম আর না আনিব মুখে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

পুণ্ডরীক

বিশাল ক্ষীরোদ সরঃ পদ্মসমাকুল,
সর্ব্ব ঋতু ভরি লক্ষ্মী নিবসেন যথা,
সেই সরে একদিন পদ্মদল-মাঝে,
তীরে যবে ঋষিগণ নিমগন ধ্যানে,
সহসা কাঁদিল এক শিশু সদ্যোজাত।
বৃদ্ধ দ্বিজ এক জন কহিয়াছে শেষে,
দেখেছে সে বাহু এক মৃণাল-নিন্দিত,
অস্ফুট-কমল সম কর সুকুমার,
রাখি শিশু ফুল্ল-সিত-অরবিন্দ-দলে,
লুকাইতে সরোজলে পলকের মাঝে ;
শিশুর কাতর রবে পূর্ণ পদ্মবন ;
ধ্যানমগ্ন ঋষিগণ সমাধি-বিহ্বল,
কেহ না শুনিলা কর্ণে, ইন্দ্রিয় সকল
ছাড়ি নিজ অধিকার, প্রভুর আজ্ঞায়
মিলিয়াছে অন্তর্দ্দেশে।
একা শ্বেতকেতু
সহসা মেলিলা আঁখি, অতি ক্ষুব্ধ চিতে।
তপোধন ঋষিগণ, মূর্ত্ত ব্রহ্মতেজঃ,
তপোভঙ্গে মেলি আঁখি নয়ন-শিখায়

করেন অঙ্গার-শেষ ধ্যান-বিঘাতকে।
দয়ার আধার দেব-ঋষি শ্বেতকেতু,
অনুক্ষণ আর্দ্রীভূত স্নেহল নয়ন,
প্রশান্ত আননে তপঃ-প্রভা সুমধুর,—
শারদ আকাশে যথা পূর্ণ সুধাকর,—
মেলি আঁখি, দেখিলেন শ্বেত-শতদলে
অসহায় ক্ষুদ্র শিশু কাঁদে ক্ষীণরবে।
"কার চেষ্টা ধ্যানভঙ্গ করিতে আমার?
কার মায়া? ইন্দ্র সদা ভীত তপোভয়ে
কি ভয় আমারে? আমি আকাঙ্ক্ষাবিহীন,
নাহি চাহি স্বর্গ-সুখ তপস্যার ফলে;
আপনার প্রভু হ'তে চাহি নিরন্তর,
উৎসর্গিতে প্রাণ মন চাহি ব্রহ্মপদে;
আমারে ছলিছ কেন ত্রিদশের পতি?"
মৃদুস্বরে বলি হেন, আরম্ভিলা পুনঃ
ধ্যান-যোগ; কর্ণে পুনঃ করিল প্রবেশ
শিশুর রোদন-ধ্বনি, অস্ফুট, কোমল।
আবার মেলিলা আঁখি ঋষি পুণ্যবান্,
কহিলা, "আকাঙ্ক্ষাহীন হৃদয় আমার,
নাহি চাহি তপঃফল; কিসের লাগিয়া
উপেক্ষা করিব হেন শিশু অসহায়?
ব্রহ্ম-দরশন মাত্র আকাঙ্ক্ষিত মম;
হৃদয় চঞ্চল এবে বাৎসল্যের ভরে,
চঞ্চল হৃদয়ে ছায়া পড়িবে কি তাঁর?

অথবা এ চঞ্চলতা প্রেম-জলধির
একটি বুদ্বুদ-লীলা হৃদয়ে আমার।
ঈষৎ সমীরে যদি দোলে পদ্মদল,
অমনি অতল হ্রদে হারাবে জীবন
ক্ষুদ্র শিশু, বিধাতার হস্ত-নিরমিত।”
সন্তরিয়া মধ্যজলে আইলা তাপস,
ধীরে ধীরে এক হস্তে তুলি শিশুতনু,
আর হস্তে সঞ্চালিয়া শুভ্র বারিচয়,
উত্তরিলা সরস্তীরে।

প্রবেশিলা যবে
তপোবনে তপোধন, নিরখি কৌতুকে
প্রতিবেশী মুনিগণ হাসি জিজ্ঞাসিলা—
“কার পরিত্যক্ত শিশু আনিলা যতনে,
শ্বেতকেতো? চিরদিন ব্রহ্মচারী তুমি,
তুমি সুপুরুষবর, মার ঋষিরূপী,
অথবা কুমার, দেব-কুমারী-বাঞ্ছিত।
তপঃপ্রিয়, গৃহসুখে নহ অভিলাষী,
না লইলে দারা তেঁই; নহিলে এখন
কুলের রক্ষক পুত্র, নয়নাভিরাম,
বাড়াত আশ্রম-শোভা। এতদিনে বুঝি
সুকুমারী স্নেহলতা লভিল জনম
দুশ্চর তপস্যা-শুষ্ক হৃদয়েতে তব;
আনিলে পরের শিশু করিতে আপন।
কহ, এ কাহার শিশু, পাইলে কোথায়?”

কহিলা তাপসবর—

"রমার আলয়,

নিত্য প্রস্ফুটিত পদ্ম ক্ষীরোদ সরসে
পুণ্ডরীক শয্যোপরি আছিল শয়ান
অলৌকিক শিশু এই; রোদনে ইহার
চঞ্চল হইল হিয়া বাৎসল্যের ভরে।
সন্তরি ইহারে বক্ষে ধরিনু যখন,
শুনিনু মধুর বাণী—প্রেমে পুলকিতা
লজ্জাবতী বধূ যথা প্রথম তনয়ে
আরোপি প্রাণেশ-অঙ্কে কহে ধীরে ধীরে,—
'মহাত্মন্, লহ এই তনয়ে তোমার।'
নিরখিনু চারিদিক্, স্বচ্ছ নীররাশি
হাসিছে অরুণালোকে, স্থির পদ্মবন
আমার উরস্-ভারে পীড়িত ঈষৎ
দেখিলাম; না দেখিনু নারী বা পুরুষ
জলমাঝে; তীরে মগ্ন ধ্যান-আরাধনে
ঋষিবৃন্দ নেত্র মুদি। উত্তরিয়া তীরে
দেখিলাম পরিচিত বৃদ্ধ এক দ্বিজে,—
জানি তাঁরে সত্যবাদী, জ্ঞানী, পুণ্যবান্,
বিস্ময়-স্ফারিত নেত্রে নেহারিছে মোরে।
জিজ্ঞাসিনু, 'দ্বিজবর, বাণী সুমধুর
অমিয়-প্রবাহ-সম শুনেছ বহিতে
নীরব ক্ষীরোদ তটে, অথবা গগনে?'
'শুনি নাই বাণী, কিন্তু অলৌকিকতর

দেখিয়াছি দৃশ্য এক। দেখ নাই তুমি,
দ্যুতিময় কর শিশু ধরি পদ্মোপরি?'—
কহিলা ব্রাহ্মণ। যবে ফিরি তপোবনে,
শুনিলাম-অন্তঃকর্ণ প্রতিধ্বনিময়,
'মহাত্মন্, লহ এই তনয়ে তোমার'—
ঋষিগণ, নহে একি দেবতার লীলা?"
সবিস্ময়ে ঋষিগণ আসি শিশু-পাশে
নেহারিলা মুখ তার, আশিসিলা সবে,
কহিলা, "সামান্য নহে এ শিশু-রতন;
গঠেছেন পদ্মাসনা মাধব-বাসনা
বিজনে নলিনীবনে মানসকুমার;
ভাগ্যবলে পুণ্যফলে পাইয়াছ তুমি।"
বাড়িতে লাগিল শিশু পুণ্ডরীক নামে,
শ্বেত শতদলে জন্ম তেঁই অভিধান।
"স্নেহের শীতল উৎস, আনন্দ কিরণ
উচ্ছ্বসিত যুগপৎ আশ্রম-কাননে,"—
কহিতেন ঋষিগণ,—"ধন্য শ্বেতকেতু,
জীবন্ত সৌন্দর্য্য-তরু শূন্য তপোবনে
স্থাপিলা যতনে যেই, সরসী মরুতে।"
"হেন শোভা," শুনিয়াছি, কহিতেন তাত,
"শোভা পায় রমণীরে; কান্তি পুরুষের
হইবেক ভীমকান্ত, বজ্র-তড়িন্ময়;
জ্যোৎস্না আর ফুলদলে গঠিত এ শিশু,
অতি রমণীয়, যেন অতি সুকুমার।

নেহারি এ মুখ যবে, ভয় পাই মনে,
—সৌন্দর্য্য আত্মার ছায়া শরীর-দর্পণে—
অসহিষ্ণু মূরছিবে স্বলপ ব্যথায়।"
"পূর্ণ সৌন্দর্য্যের শিশু, ইন্দিরা-তনয়,
রমণী-মানসজাত, তাই হেন রূপ ;
কি আশঙ্কা, শ্বেতকেতো, মূর্ত্ত তপঃ তুমি
শিক্ষক পালক যবে, শোভায় প্রভাব,
মধুরে ভীষণ, পুষ্পে বজ্রের মিলন
দেখাইবে,—একাধারে লক্ষ্মী-শ্বেতকেতু।"
তবুও বিষাদ-ছায়ে আবৃত বদন,
চিন্তায় আবিল আঁখি থাকিত তাঁহার ;
দুর্ভাগ্যের ভাগ্যবর্ত্ম দূর ভবিষ্যতে
পাইতেন দেখিবারে দূরদর্শী তাত।

কেমনে কাটিত দিন কহিব কেমনে ?
মধুর স্বপন সম স্মৃতি শৈশবের,
নয়নেতে আসে জল স্মরি সে সকল ;
পিতার সে স্নেহময় প্রশান্ত বদন,
মধুর গম্ভীর স্বর—মহাশ্বেতে, প্রাণ,
ভুঞ্জিয়াছি জন্মান্তর, নিত্য দুঃখময় ;
শিশুত্ব লভিতে যদি পারি তপোবলে
সেই অঙ্কে, সে পবিত্র চারু তপোবনে,
তা'হলে তপস্যা সাধি পুনর্জ্জন্ম লাগি।
অধীত-সমগ্রবিদ্য পিতা পুণ্যবান্
খুলি দিলা আপনার জ্ঞানের ভাণ্ডার,

পিতৃধনে অধিকারী হইলাম কালে।
বাখানিত সবে যবে প্রতিভা আমার
পিতার স্নেহলকান্তি হইল উজ্জ্বল।
সহাধ্যায়িগণ মোরে কহিত আদরে
পুণ্ডরীক লক্ষ্মী-সুত, বীণাপাণি-পতি।
গেল হেন জীবনের প্রথম অধ্যায়।

শ্রীকামিনী রায়।

ভারতবর্ষ

যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি! ভারতবর্ষ!
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ
সে দিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি;
বন্দিল সবে, "জয় মা জননি! জগত্তারিণি! জগদ্ধাত্রি!"
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

সদ্যঃস্নান-সিক্তবসনা, চিকুর সিন্ধু-শীকরলিপ্ত;
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল কমল-আনন দীপ্ত;
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে তপন তারকা চন্দ্র;
মন্ত্রমুগ্ধ, চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমন্দ্র।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি। জগজ্জননি। ভারতবর্ষ।"

শীর্ষে শুভ্র তুষারকিরীট; সাগর উর্ম্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা;
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার—পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা।
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে;
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে, ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

উপরে, পবন প্রবল স্বননে শূন্যে গরজি' অবিশ্রান্ত,
লুটায়ে পড়িছে পিককলরবে, চুম্বি' তোমার চরণ-প্রান্ত;
উপরে, জলদ হানিয়া বজ্র, করিয়া প্রলয়-সলিল-বৃষ্টি—
চরণে তোমার কুঞ্জকানন কুসুমগন্ধ করিছে সৃষ্টি!
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয়-উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি;
জননি! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ;
——জগৎপালিনি! জগত্তারিণি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

বঙ্গভাষা

আজি গো তোমার চরণে, জননি ! আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান ;
ভক্তি-অশ্রু-সলিল-সিক্ত শতেক ভক্ত দীনের গান !
মন্দির রচি মা তোমার লাগি', পয়সা কুড়ায়ে পথে পথে মাগি',
তোমারে পূজিতে মিলেছি জননি স্নেহের সরিতে করিয়া স্নান।
জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দু'টি অমল কমল-চরণে স্থান !

জান কি জননি জান কি কত যে আমাদের এই কঠোর ব্রত !
হায় মা ! যাহারা তোমার ভক্ত নিঃস্ব কি গো মা তারাই যত !
তবু সে লজ্জা তবু সে দৈন্য, সহেছি মা সুখে তোমারি জন্য,
তাই দু'হস্তে তুলিয়া মস্তে ধরেছি যেন সে মহৎ মান।
জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দু'টি অমল কমল-চরণে স্থান !

নয়নে বহেছে নয়নের ধারা জ্বলেছে জঠরে যখন ক্ষুধা,
মিটায়েছি সেই জঠর-জ্বালায় পিইয়া তোমার বচন-সুধা ;
মরুভূমি সম যখন তৃষায়, আমাদের মা গো ছাতি ফেটে যায়,
মিটায়েছি মা গো সকল পিপাসা তোমার হাসিটি করিয়া পান।
জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দু'টি অমল কমল-চরণে স্থান !

পেয়েছি যা কিছু কুড়ায়ে তাহাই তোমার কাছে মা এসেছি 'ছুটি',
বাসনা তাহাই গুছায়ে যতনে সাজাব তোমার চরণ দু'টি।
চাহিনাক কিছু, তুমি মা আমার—এই জানি শুধু নাহি জানি আর,
তুমি গো জননি হৃদয় আমার, তুমি গো জননি আমার প্রাণ!
জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দু'টি অমল কমল-চরণে স্থান!

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

শেষ

গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল আঁধার আজি কুঞ্জবন।
(আর) গাহে না পাখী, ফুটে না কলি, নাহিক অলি-গুঞ্জরণ।
দুলাতে মৃদু লতিকা বনে, খেলিতে নব কলিকা সনে,
মধুরতর নাহি সে আর সমীর ধীর সঞ্চরণ॥

কাননে ঢালি জ্যোছনারাশি, ভাসে না চাঁদ গোকুলে আসি,
নাহি সে হাসি প্রমোদরাশি নাহি সে সুখ-সম্মিলন।
জলদে শশি-মাধুরী ঢাকা, বিষাদ যেন সকলে মাখা,
শ্রীহীন তরু, শ্রীহীন লতা, শ্রীহীন চারু পুষ্পবন॥

অমিয়-স্বর-লহরে মাখি, স্তবধ করি পশু ও পাখী,
মধুরভাষী আর সে বাঁশী গাহে না গীত সম্মোহন।
যমুনা পানে চাহিলে ফিরে, কপোল ভাসে নয়ন-নীরে,
পরাণে শুধু উছলি উঠে সুনীল জলে সন্তরণ॥

নিবিড় বনে তমাল-ছায় কোকিল-বধূ গীত না গায়,
সারিকা-শুক বিরস-মুখ বিগত প্রেমসম্ভাষণ।
অধীর ব্রজ-বালক-দল, না খায় ধেনু তৃণ কি জল,
সজল আঁখি উরধ মুখে করিছে কি যে অন্বেষণ॥

প্রেমিক কে সে মধুরভাষী বধিয়ে গেল গোকুলবাসী,
ব্রজে কি আর বাঁশরী তার গাবে না গীত সঞ্জীবন।
অধীর প্রাণে বিষম ক্লেশ, কেমনে করি এ দুখ শেষ,
বিনে শ্রীহরি কেমনে করি নয়ন-বারি সংবরণ॥

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

কয়াধু *

কার তরে এই শয্যা দাসী, রচিস্ আনন্দে?
হাতীর দাঁতের পালঙ্কে মোর দেরে আগুন দে;
পুত্র যাহার বন্দিশালায় শিলায় শুয়ে হায়,
ঘুম যাবে সে দুধের-ফেনা ফুলের বিছানায়?
দুলাল যাহার শিকল-বেড়ীর নিগ্রহে জর্জ্জর,
জন্তলিকা! রত্ন-মুকুট তার শিরে দুর্ভর!

* দিতি ও কশ্যপের পুত্র অসুর-সম্রাট্ হিরণ্যকশিপুর পত্নী কয়াধু। ইনি জম্ভাসুরের কন্যা ও মহিষাসুরের ভগিনী। ইঁহার চারি পুত্র—প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, হ্লাদ ও অনুহ্লাদ।

ফণীর মতন রাজার দেওয়া দংশে মণিহার,
যম-যাতনা এখন এ মোর রম্য অলঙ্কার!
কেয়ূর-কাঁকণ শিথ্‌লে দেরে, খুলে দে কুণ্ডল,
শিথ্‌লে দে এই মোতির সীঁথি শচীর আঁখিজল!
রাণীত্বে আর নাইরে রুচি—নাই কিছুরই সাধ,
যে দিকে চাই কেবল দেখি লাঞ্ছিত প্রহ্লাদ!
যে দিকে চাই মলিন অধর, উপবাসীর চোখ,
যে দিকে চাই গগন-ছোঁয়া নীরব অভিযোগ,
যে দিকে চাই ব্রতীর মূর্ত্তি নিগ্রহে অটল,
সাপের সাথে শিশুর খেলা,—মন করে বিহ্বল।
মারণ-পটু মারছে বটু—মারছে বাছারে,
শস্ত্রপাণি দিচ্ছে হানা বালক নাচারে,
কাঁটায় গড়া মারছে কোড়া দুধের ছেলের গায়,
দ্যাখ্‌রে রাঙা দাগ্‌ড়াতে দ্যাখ্ আমার দেহ ছায়!
প্রাণের ক্ষতে লোহুর ধারা ঝর্‌ছে লক্ষ ধার,
আর চোখে নিদ্ আস্‌বে ভাবিস্ পালঙ্কে রাজার?
গুমে গুমে পুড়ে যেন যাচ্ছে শরীর মন,
ক্লান্ত আঁখি মুদ্‌লে দেখি কেবল কুস্বপন,
পাহাড় থেকে আছ্‌ড়ে ফেলে দিচ্ছে পাথরে—
প্রহ্লাদে মোর; দিচ্ছে ঠেলে সাপের চাতরে।
জগদ্দলন পাষাণ বুকে ফেল্‌ছে তরঙ্গে,
চোরের সাজে সাজিয়ে সাজা চোরেরি সঙ্গে!
নির্দ্দোষেরে খুনীর বাড়া দিচ্ছে রে দণ্ড
কালনেমি, কবন্ধ, রাহু দৈত্য পাষণ্ড।

কভু দেখি ফেল্‌ছে বাছায় পাগ্‌লা হাতীর পায়,—
বিদ্রোহীদের প্রাপ্য সে আজ নিরীহ জন পায়!
চর্ম্মচোখে রক্ত ঝরে দারুণ সে দৃশ্যে,
মর্ম্মচোখে কেবল দেখি—নৃসিংহ বিশ্বে!

*   *   *   *   *

হায় ক্ষমতার অপপ্রয়োগ।—হাহা রে আফ্‌শোষ,
অপ্রযুক্ত দণ্ড এসে,—জাগায় বিধির রোষ!
কি দোষ বাছার বুঝ্‌তে নারি, অবাক চোখে চাই,
ইচ্ছা করে এদেশ ছেড়ে অন্য কোথাও যাই—
অন্য কোথাও—অন্য কোথাও—এ রাজ্যে আর নয়,
ভাগ্যে আমার স্বর্গপুরী হ'ল ভীষণ-ভয়,
চোখের আগে কেবল জাগে ছেলের মলিন মুখ,
খড়্গ জেতা স্বর্গপুরে নাইরে স্বর্গ-সুখ।
বুঝ্‌তে নারি কি দোষ বাছার,—ভাবি অহর্নিশ,
ষণ্ড গুরুর শিক্ষা পেয়েও ষণ্ডামি তার বিষ,—
এই কি কসুর অপাপ শিশুর? হায় রে কে জানে,
বিহ্বলতায় বিকল করে এ মোর পরাণে।......
ফিরে এল শিক্ষা-শেষে শিশু পুলক-মন,
ভীষণ সাপের আবর্ত্তে হায় এই সমাবর্ত্তন!
প্রশ্ন হ'ল—"কি শিখেছ?" রাজার সভা-মাঝে
কয় শিশু—"তাঁর নাম শিখেছি রাজার রাজা যে;
যাঁর আদি নাই, অন্তও নাই, যে-জন চিরন্তন,
সত্য-মূর্ত্তি স্বতঃস্ফূর্ত্তি অরূপ নিরঞ্জন,

তিন ভুবনের প্রভু যিনি, প্রভু যে চার যুগে,
শিখেছি নাম জপ্‌তে তাঁহার, গাইতে সে নাম মুখে।"
ছেলের বোলে রুষ্ট রাজা দেবস্ব-লোভী,
ছেলের দেব-প্রেমে দেখেন বিদ্রোহ-ছবি।
বিধির বরে দেবতা-মানুষ-পশুর অবধ্য
মাতেন পিয়ে অহঙ্কারের অপাচ্য মদ্য।
ভাবেন মনে "হইছি অমর" অবধ্য ব'লেই!
পরের বধ্য নয় ব'লে, হায়, মৃত্যু যেন নেই!
দেবতা-মানুষ-পশুর বাইরে কেউ যেন নেই আর
বলের দর্পে দণ্ড দিতে; এম্‌নি ব্যবহার!
দাবী করেন দেবের প্রাপ্য যজ্ঞ-হবির ভাগ,
ভগবানের জয়-গানে হায় বাড়ে উঁহার রাগ!
উনিই যেন রুদ্র মরুৎ, উনিই সূর্য্য, সোম,
ক্ষণস্থায়ী রাজ্যমদে দণ্ডধারী যম।
ইন্দ্র উনি ইন্দ্রজয়ী, জয়ন্ত, জিষ্ণু,
একলা উনি সব দেবতা, নাসত্য বিষ্ণু।
ছেলের বোলে ক্রোধোন্মত্ত দৈত্য ধুরন্ধর,
"আমার আগে অন্যে বলে ত্রিভুবনেশ্বর!
রাজদ্বেষী অমন ছেলে, ফল বা কি জীয়ে?
ডুবিয়ে দেব নির্য্যাতনের নরক সৃজিয়ে।
খর্ব্ব করে রাজায় যে তার রাখ্‌ব না মাথা,
দণ্ডবিধান কর্‌ব, স্বয়ং আমিই বিধাতা।"
বাক্য শুনে বালক বলে বিনয় বচনে—
"হৃদয় আমার নিরত যাঁর অর্ঘ্য-রচনে,

পিতার পিতা মাতার মাতা রাজার রাজা সেই,
সত্য তিনি নিত্য তিনি তাঁর তুলনা নেই ;
পিতা গুরু,—মান্য করি,—শ্রদ্ধা দিই ভূপে,
তাই ব'লে হায় ভুল্‌তে নারি সত্য-স্বরূপে।
আত্মা আপন বিশিষ্টতা কর্‌ব না ক্ষুণ্ণ,
স্মরণে যার মরণ মরে, কীর্ত্তনে পুণ্য,
সে নাম আমি ছাড়্‌ব নাকো, ছাড়্‌ব না নিশ্চয় ;
অঙ্গে যিনি, অস্ত্রে তিনি,—শাস্তিতে কি ভয় ?"
কথার শেষে কোটাল এসে বাঁধ্‌লে ক'সে তায়,
শান্ত শিশু হাস্‌লে শুধু শিষ্ট উপেক্ষায়।
চলে গেল শাস্তি নিতে নিরীহ প্রহ্লাদ—
আত্মলাভের মূল্য দিতে প্রহারে সাহ্লাদ !
মিনতি-বোল্ বল্‌তে গেলাম দৈত্যপতিরে,...
বিমুখ হ'য়ে,—আঁক্‌ড়ে বুকে নিলাম ক্ষতিরে,
ছেড়ে এলাম সভাগৃহ বাক্য-যন্ত্রণায়
সিংহাসনের আসনে ভাগ ঠেলে এলাম পায়,
ভাব-দেহে যাই লাগ্‌ল আঘাত, হায়রে কয়াধু,
স্থূল-শরীরও মরিয়া হ'ল, টিক্‌ল না যাদু।
চলে এলাম রাজ্য রাজা ডুবিয়ে উপেক্ষায়,—
সত্য যেথা পায় না আদর চিত্ত বিমুখ তায়।
আসার পথে দেখে এলাম কেবল অলক্ষণ,—
বিদ্রিল মোর বিধবা-বেশ শুভ্র অগণন।
ব্যাকুল চোখে চাইতে ফাঁকে চোখ হ'ল বন্ধ,
মশানে স্ব-মুণ্ডে লাথি ঝাড়্‌ছে কবন্ধ !

ক্ষিপ্ত-পারা আকাশে চাই, সেথায় দেখি হায়,
রক্ত-স্নাত সিংহ-শীর্ষ পুরুষ অতিকায়,
অঙ্কে তাহার লুটায় কে রে মুকুট-পরা শির,
সিংহনখে ছিন্ন অন্ত্র চৌদিকে রুধির!
দু'হাতে চোখ ঢেকে এলাম অন্ধ আশঙ্কায়
ভিত্তি-'পরে কপাল ঠুকে কেবল প্রতি পায়।
সেই অবধি শুন্‌ছি কেবল অন্তরে গুর্‌গুর্‌
বিসর্জ্জনের বাজনা বাজায় বিপর্য্যয়ের সুর,
টল্‌ছে মাটি নাগ বাসুকি অধর্ম্মেরি ভার
হাজার ফণা নেড়ে করে বইতে অস্বীকার'।
যে বিধি নয় ধর্ম্ম্য, বুঝি, তার আজি রোখ-শোধ;
বিধির টনক নড়ায় শিশুর শিষ্ট প্রতিরোধ।
বিধি-বহিষ্কৃতের বিধি মান্‌বে না কেউ আর,
ওই শোনা যায়, জম্ভলিকা! নৃসিংহ-হুঙ্কার!
রেখে দে তোর শয্যা-রচন রাণীর পালঙ্কে,
হৃষীকেশের শাঁখ হৃদে শোন্‌ হর্ষে—আতঙ্কে।
ভীষণ মধুর রোল উঠেছে রুদ্র আনন্দে,
সুখের বাসায় সুখের আশায় দে রে আগুন দে।
দুঃখ বরণ করেছে মোর নির্দ্দোষী প্রহ্লাদ,
সেই দুখে আজ আঁকড়ে বুকে চল্‌ করি জয়নাদ।
আত্মা চাহে শিশুর রূপে প্রাপ্য যাহা তার,—
বিদ্রোহ নয় বিপ্লবও নয় ন্যায্য অধিকার।
উচিত ব'লে দণ্ড নেবার দিন এসেছে আজ,
উচিত ক'য়ে পরতে হবে চোর-ডাকাতের সাজ,

চিত্ত-বলের লড়াই সুরু পশু-বলের সাথ,
বন্যা-বেগের হানার মুখে কিশোর-তনুর বাঁধ।
প্রলয়-জলে বটের পাতা! চিত্ত-চমৎকার!
তীর্থ হ'ল বন্দিশালা, শিকল অলঙ্কার!
খেদ কিছু নাই, আর না ডরাই, চিত্তে মাভৈঃ রব;
উচিত ব'লে বন্দী ছেলে এ মম গৌরব!

কয়াধু তোর জনম সাধু, মোছ রে চোখের জল,
রাজ-রোষেরি রোশ্‌নায়ে তোর মুখ হ'ল উজ্জ্বল।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

অন্তর্য্যামী

যখনি দেখিতে নারি, অন্ধকার আসে,
পথ খুঁজে মরে প্রাণ, তারি চারি পাশে!
কোথা হ'তে জ্বাল দীপ, সম্মুখে তাহার?
নয়নে দরশ আসে, চলে সে আবার!

যখনি হৃদয়-যন্ত্রে ছিঁড়ে যায় তার,
সুরহীন হ'য়ে আসে সঙ্গীতের ধার—
কোথা হ'তে অলক্ষিতে তুমি দাও সুর?
মহান্ সঙ্গীতে হয় প্রাণ ভরপুর!

চিত্তরঞ্জন দাশ।

যমুনা-লহরী

নির্ম্মল সলিলে, বহিছ সদা,
তটশালিনী সুন্দর যমুনে ! ও।

কত শত সুন্দর নগরী তীরে
রাজিছে তটযুগ ভূষি ও।
পড়ি জল নীলে, ধবল সৌধ-ছবি,
অনুকারিছে নভ-অঙ্গন ও।

যুগ-যুগ-বাহী, প্রবাহ তোমারি,
দেখিল কত শত ঘটনা ও।
তব জল-বুদ্বুদ সহ কত রাজ্য,
পরকাশিল, লয় পাইল ও।

কল কল ভাষে, বহিয়ে কাহিনী,
কহিছ সবে কি পুরাতন ও।
স্মরণে আসি, মরম পরশে কথা,
ভূত সে ভারত-গাথা ও।

তব জল-কল্লোল সহ কত সেনা,
গরজিল কোন দিন সমরে ও।
আজি শব-নীরব, রে যমুনে সব,
গত যত বৈভব, কালে ও।

শ্যাম সলিল তব, লোহিত ছিল কভু,
পাণ্ডব-কুরুকুল-শোণিতে ও।
কাঁপিল দেশ, তুরগ-গজ-ভারে,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।

তব জল-তীরে, পৌরব যাদব,
পাতিল রাজ-সিংহাসন ও।
শাসিল দেশ, অরিকুল নাশি,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।

দেখিলে কি তুমি, বৌদ্ধ পতাকা,
উড়িতে দেশ-বিদেশে ও।
তিব্বত-চীনে, ব্রহ্ম-তাতারে,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।

এ জল-ধারে ধীরে বহিল কভু,
প্রেম-বিরহ-আঁখিনীর ও।
নাচিল গাইল, কত সুখ সম্পদ,
এ তব সৈকত-পুলিনে ও।

এ তনু-মুকুরে, আসি পূর্ণশশী,
নিরখিত মুখ যবে শরদে ও।
ভাসিত দশ দিশি, উৎসব-রঙ্গে,
প্লাবিত চিত সুখ-উৎসে ও।

সে তুমি, সে শশী, ধীর অনিল সে,
তবু সব মগন বিষাদে ও।
নাহিক সে সব প্রমোদ উৎসব,
গ্রাসিল সকলে কালে ও।

যে মুরলী-রবে নিবিড় নিশীথে,
উন্মাদিত ব্রজবালা ও।
আকুল প্রাণে তব তট-পানে,
ধাইত রব-সন্ধানে ও।

বর্দ্ধিত বিরহে, শ্বাস-পবন কত,
বিরচিত বলি তব হৃদয়ে ও।
সুহৃদ্-সমাগমে পুন এই দর্পণে,
প্রতিবিম্বিত সিত হাসি ও।

সে সব কৌতুক, কাল-কবল আজি,
লেশ না রাখিলে শেষ ও।
কই সেই গৌরব, নিকুঞ্জ-সৌরভ,
হ'ল পরিণত শত কাহিনী ও।

কভু শত ধারে, এ উভ পারে,
পাঠান, আফ্‌গান, মোগল ও।
ঢালিল সেনা, ত্রাসি নিবাসী,
বাঁধিল ভারতে বন্ধনে ও।

অহো ! কি কু-দিবসে, গ্রাসিল রাহু,
মোচন হইল না আর ও।
ভাঙ্গিল চূর্ণিল, উলটি পালটি,
লুটি নিল যা ছিল সার ও।

সে দিন হইতে, অন্ধ মনোগৃহ,
পরবল-অর্গল-পাতে ও।
সে দিন হইতে, শ্মশান ভারত,
পর অসিঘাত-নিপাতে ও।

সে দিন হইতে, তব জল তরলে,
পরশে না কুলবালা ও।
সে দিন হইতে, ভারত-নারী,
অবরোধে অবরোধিত ও।

সে দিন হইতে, তব তট-গগনে,
নূপুর-নাদ বিনীরব ও।
সে দিন হইতে, সব প্রতিকূলে,
যে দিন ভারত-বন্ধন ও।

এ পয়ঃ-পারে কত কত জাতীয়,
ভাতিল কত শত রাজা ও।
আসিল, স্থাপিল, শাসিল রাজ্য
রচি ঘর কত পরিপাটী ও।

কত শত দুর্জ্জয়, দুর্গম দুর্গে,
বেড়িল তব তট-দেশে ও।
নগর-প্রাচীরে ঘেরিল শেষে,
চির-যুগ-সম্ভোগ আশে ও।

উপহসি সর্ব্বে, মানব-গর্ব্বে,
কাল প্রবল চিরকালে ও।
গৃহ গড় পুঞ্জে, কতিপয় তুঞ্জে,
রাখিল করি বিকলাকৃতি ও।

ঐ পুরোভাগে, ভগ্ন বিভাগে
গৃহবর শেষ শরীরে ও।
দেখিছি যে সব, উজ্জ্বল লেখা
সে গত-যৌবন-রেখা ও।

এর অলিন্দে, সুন্দরীবৃন্দে,
মোগল নরপতি-কেশরী ও।
বসি ও-মর্ম্মরে, উল্লাস অন্তরে,
তৌলিত মোহন রূপে ও।

কভু এ গবাক্ষে কৌতুক-চক্ষে,
নিরখিত পরিজন লইয়ে ও।
নিম্ন প্রদেশে, সে গজ-যুদ্ধে,
ভীষণ প্রাণ-বিনাশক ও।

এ-ঘর মাঝে, নারী-সমাজে,
বসি কভু খেলিত চৌসর ও।
রাখিত পাশে, সে তরবারি,
কাফর-কণ্ঠ-বিদারী ও।

কৈ? সব আজি, সময়-সমুদ্রে
মজ্জিত সহ শত আশা ও।
দেখিল শত শত, হ'ল না নিবারিত,
নিস্ত্রপ মনুজ-পিপাসা ও।

সে গৃহ-পাশে কাঁপিত ত্রাসে,
ভূপতি-পদবিক্ষেপে ও।
সে সব ভবনে, কত শত অধমে,
পূরিছে মূত্র পুরীষে ও।

যে ঘর-মধ্যে, সুরভি-সমৃদ্ধে,
সম্মোহিত-চিত কালে ও।
সে সব সদনে, উদ্ভবে বমনে,
পূতিগন্ধ বিকিরণ ও।

যে গৃহ-অঙ্গে, বহুবিধ রঙ্গে,
বিখচিত ছিল মণিরাজি ও।
সে সব কালে, হরি এক কালে
ঢাকিল লূতা-জালে ও।

ঐ তব তীরে, শুভ্র শরীরে,
দণ্ডায়িত গৃহ-রাজ ও।
যার স্বরূপে, দিক্‌দিক্ হইতে,
কর্ষে মনুজ-সমাজে ও।

কত নর-পঞ্জরে, নির্ম্মিল ইহারে,
শোষি' শোণিত কোষে ও।
দর্শাইতে সব, দর্শক লোকে,
প্রমদা-গৌরব শেষে ও।

অহো! কত কাল, রবে এ জীবিত
তটিনি! তট তব শোভি' ও।
ভূষণ হইয়ে, তব জল নীলে,
ব্যঞ্জিতে মন-অভিলাষে ও।

হবে কোন কালে, হত ঘোর কালে
পরিমিত সুর-পরমায়ু ও।
রহিবে শেষে, এ গৃহ-দেশে,
আকাশে শুধু বায়ু ও।

যদি এই শেষ, রবে সব শেষ,
জীবন-স্বপন প্রভাতে ও।
তবু মন ক্ষয়িয়ে, দুখ শত সইয়ে,
চরিছে লোক কি আশে ও।

গোবিন্দচন্দ্র রায়।

স্যার আশুতোষ

(জীবদ্দশায় লিখিত)

জ্বলজ্জ্যোতি কলাযুতা শেমুষী সে কার,
স্ফুরিত বিভায় যার বঙ্গ আলোকিত ?
বিদ্যাতপে সিদ্ধকাম জ্বলন্ত পাবক ;
গরিমার আসনেতে সদা সমাসীন,
তেজবন্ত মহাতপা দুর্ব্বাসা সমান।
এই প্রতিভায় যদি আকাশ-উপর
স্থাপিতেন মহাধাতা, জ্যোতিতে ইহার
চিত্রাদ্যুতি ম্রিয়মাণ হইত আপনি।
স্বাধীন রাজ্যেতে যদি লভিতে জনম,
বিস্‌মার্ক বা ডিস্‌রেলির প্রতিভা-আলোক
বিবর্ণ হইয়া যেতো ও-প্রভা হেরিয়া।
যুক্তি তব তর্কসহ কেশরীর ন্যায়
চলে যবে, মহিমার তুলিয়া হিল্লোল,
সত্যের সন্ধানে,—গতিভঙ্গী তার
কত যে মাধুর্য্যভরা, বুঝে সেইজন—
চিত্ত যার যুক্তিরসে সদা পরিপ্লুত।
বীরত্বে উঠে না জাতি, যে বীরত্ব মাঝে
জাতির আলোক-ভাষা না থাকে জড়িত ;

জাতীয় চিন্তায় সিক্ত নহে সে বীরতা,
সে বীরত্বে সিংহবীর্য্য না হয় প্রকাশ,
সে বীরত্বে ভীষ্মশৌর্য্য উঠে না ফুটিয়া ;
মনোরমা বাংলার মনোরমা ভাষা,
তোমার উৎসাহে আজ সে যে জ্যোতির্ম্ময়ী ;
মন্দাকিনী ব'হে যায় কলুশ নাশিয়া
বঙ্গভাষা-ধুনী চলে মাতায়ে হৃদয়।
ঋষিবর ও-নদীর সৈকতে বসিয়া
রম্য গীতাঞ্জলি-গাথা উদাত্ত আরাবে
উচ্চারিয়া, মন্ত্র মুগ্ধ করিছে জগৎ।
শ্যামল বঙ্গের শোভা অতুল জগতে ;
বাঙ্গালীর গীতিগাথা তুলনা ইহার
নাহি 'হায়েনে'র কুঞ্জে—'দান্তে'র বিপিনে ;
তুমি সে ভাষার প্রাণ করেছ প্রতিষ্ঠা ;
গর্ব্বিত বাঙ্গালী আজি তোমার প্রভায়।
লবণাক্ত সিন্ধুবারি, শশাঙ্ক-লাঞ্ছন,
দীপমূলে অন্ধকার, তথাপি ইহারা
প্রত্যেকেই রমণীয়, প্রত্যেকে মহান্ ;
দোষ যদি থাকে, থাক্ ; দীর্ঘ বিশালতা,
স্ফটিক-নির্ম্মল চিত্ত, উদাত্ত চরিত—
গর্ব্বের জিনিষ উহা, সাধনার ধন।

শ্রীবনোয়ারীলাল গোস্বামী।

সেথা আমি কি গাহিব গান ?

সেথা আমি কি গাহিব গান ?
যেথা, গভীর ওঙ্কারে, সাম ঝঙ্কারে,
কাঁপিত দূর বিমান।

যেথা, স্বরসপ্তকে বাঁধিয়া বীণা,
বাণী শুভ্রকমলাসীনা,
রোধি' তটিনী-জল-প্রবাহ,
তুলিত মোহন তান।

যেথা, আলোড়ি' চন্দ্রালোক শারদ,
করি' হরিগুণগান নারদ,
মন্ত্রমুগ্ধ করিত ভুবন,
টলাইত ভগবান।

যেথা, যোগীশ্বর-পুণ্যপরশে,
মূর্ত্ত রাগ উদিল হরষে ;
মুগ্ধ কমলাকান্ত-চরণে
জাহ্নবী জনম পান।

যেথা, বৃন্দাবন-কেলিকুঞ্জে,
মুরলী-রবে পুঞ্জে পুঞ্জে,
পুলকে শিহরি' ফুটিত কুসুম,
যমুনা যেত উজান।

আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র,
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র,
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ,
আর কি আছে সে প্রাণ ?

রজনীকান্ত সেন।

দারিদ্র্য

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান্ !
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান
কণ্টক-মুকুট শোভা।—দিয়াছ, তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস ;
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি ; বাণী ক্ষুরধার ;
বীণা মোর শাপে তব হ'ল তরবার !

দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্ণেরে মোর করিলে বিরস,
অকালে শুকালে মোর রূপ রস প্রাণ !
শীর্ণ করপুট ভরি' সুন্দরের দান

যতবার নিতে যাই—হে বুভুক্ষু তুমি
অগ্রে আসি কর পান! শূন্য মরুভূমি
হেরি মম কল্পলোক। আমার নয়ন
আমারি সুন্দরে করে অগ্নি বরিষণ!

বেদনা-হলুদ-বৃন্ত কামনা আমার—
শেফালির মত শুভ্র সুরভি-বিথার
বিকশি উঠিতে চাহে, তুমি হে নির্ম্মম
দল বৃন্ত ভাঙ শাখা কাঠুরিয়া সম!
আশ্বিনের প্রভাতের মত ছলছল
ক'রে ওঠে সারা হিয়া, শিশির-সজল

টলটল ধরণীর মত করুণায়!
তুমি রবি তব তাপে শুকাইয়া যায়
করুণা-নীহার-বিন্দু! ম্লান হয়ে উঠি
ধরণীর ছায়াঞ্চলে! স্বপ্ন যায় টুটি
সুন্দরের, কল্যাণের! তরল গরল
কণ্ঠে ঢালি তুমি বল, 'অমৃতে কি ফল?
জ্বালা নাই, নেশা নাই, নাই উন্মাদনা,—
রে দুর্ব্বল, অমরার অমৃত-সাধনা
এ দুঃখের পৃথিবীতে তোর ব্রত নহে!
তুই নাগ, জন্ম তোর বেদনার দহে।
কাঁটা-কুঞ্জে বসি তুই গাঁথিবি মালিকা,
দিয়া গেনু ভালে তোর বেদনার টীকা!'...

গাহি গান, গাঁথি মালা, কণ্ঠ করে জ্বালা,
দংশিল সর্ব্বাঙ্গে মোর নাগ নাগ-বালা!...

ভিক্ষা-ঝুলি নিয়া ফের দ্বারে দ্বারে ঋষি
ক্ষমাহীন হে দুর্ব্বাসা! যাপিতেছে নিশি
সুখে বর-বধূ যথা—সেখানে কখন্
হে কঠোর-কণ্ঠ, গিয়া ডাক,—'মূঢ়, শোন্,
ধরণী বিলাস-কুঞ্জ নহে নহে কারো,
অভাব বিরহ আছে, আছে দুঃখ, আরো
আছে কাঁটা শয্যাতলে, বাহুতে প্রিয়ার,
তাই এবে কর্ ভোগ!'—পড়ে হাহাকার
নিমেষে সে সুখ-স্বর্গে, নিবে যায় বাতি,

কাটিতে চাহে না যেন আর কাল-রাতি!
চল পথে অনশন-ক্লিষ্ট ক্ষীণ তনু,
কী দেখি বাঁকিয়া ওঠে সহসা ভ্রূ-ধনু,
দু'নয়ন ভরি রুদ্র হান অগ্নি-বাণ,
আসে রাজ্যে মহামারী দুর্ভিক্ষ তুফান,
প্রমোদ-কানন পুড়ে, উড়ে অট্টালিকা,—
তোমার আইনে শুধু মৃত্যু-দণ্ড লিখা!

বিনয়ের ব্যভিচার নাহি তব পাশ,
তুমি চাহ নগ্নতার উলঙ্গ প্রকাশ।
সঙ্কোচ সরম বলি জান না ক' কিছু,
উন্নত করিছ শির যার মাথা নীচু।

মৃত্যু-পথযাত্রীদল তোমার ইঙ্গিতে
গলায় পরিছে ফাঁসি হাসিতে হাসিতে !
নিত্য অভাবের কুণ্ড জ্বালাইয়া বুকে
সাধিতেছ মৃত্যু-যজ্ঞ পৈশাচিক সুখে !

লক্ষ্মীর কিরীট ধরি ফেলিতেছ টানি
ধূলিতলে। বীণা-তারে করাঘাত হানি
সারদার, কী সুর বাজাতে চাহ গুণী ?
যত সুর আর্তনাদ হয়ে ওঠে শুনি !...

প্রভাতে উঠিয়া কালি শুনিনু, সানাই
বাজিছে করুণ সুরে ! যেন আসে নাই
আজো কা'রা ঘরে ফিরে ! কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ডাকিছে তাদেরে যেন ঘরে 'সানাইয়া' !
বধূদের প্রাণ আজ সানা'য়ের সুরে
ভেসে যায় যথা আজ প্রিয়তম দূরে
আসি আসি করিতেছে ! সখি বলে, বল্
মুছিলি কেন লা আঁখি মুছিলি কাজল ?......

শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই
'আয় আয়' কাঁদিতেছে তেমনি সানাই !
ম্লানমুখী শেফালিকা পড়িতেছে ঝরি
বিধবার হাসি সম—স্নিগ্ধ গন্ধে ভরি !
নেচে ফেরে প্রজাপতি চঞ্চল পাখায়
দুরন্ত নেশায় আজি, পুষ্প-প্রগল্‌ভায়
চুম্বনে বিবশ করি' ! ভোমরার পাখা
পরাগে হলুদ আজি, অঙ্গে মধু মাখা।

উছলি' উঠিছে যেন দিকে দিকে প্রাণ !
আপনার অগোচরে গেয়ে উঠি গান
আগমনী আনন্দের ! অকারণে আঁখি
পূ'রে আসে অশ্রু-জলে ! মিলনের রাখী
কে যেন বাঁধিয়া দেয় ধরণীর সাথে,
পুষ্পাঞ্জলি ভরি' দুটি মাটী-মাখা হাতে
ধরণী এগিয়ে আসে দেয় উপহার।
ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার !—
সহসা চমকি উঠি ! হয়ে মোর শিশু
জাগিয়া কাঁদিছ ঘরে, খাও নি ক' কিছু
কালি হ'তে সারাদিন তাপস নিষ্ঠুর,
কাঁদ মোর ঘরে নিত্য তুমি ক্ষুধাতুর !

পারি নাই বাছা মোর, হে প্রিয় আমার,
দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে !—মোর অধিকার
আনন্দের নাহি নাহি ! দারিদ্র্য অসহ
পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি ! কে বাজাবে বাঁশী ?
কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি ?
কোথা পাব পুষ্পাসব ?—ধুতুরা-গেলাস
ভরিয়া করেছি পান নয়ন-নির্য্যাস !......

আজো শুনি আগমনী গাহিছে সানাই,
ও যেন কাঁদিছে শুধু—'নাই কিছু নাই !'

নজরুল ইস্‌লাম।

গঙ্গাস্তোত্র

চির-ক্রন্দনময়ী গঙ্গে !
কুলু কুলু কল কল প্রবাহিত আঁখি-জল
দেব-মানবের একসঙ্গে !
বিশ্বের ক্রন্দন-বিচলিত নারায়ণ,
আঁখি তার অশ্রুতে ভরিল,—
গোলোকে হ'ল না ঠাঁই, শিবজটা বাহি তাই
শতধারা ধরণীতে ঝরিল।
হিমগিরি-নির্ঝরে তোমার জীবন গড়ে,—
মিথ্যা মা মিথ্যা এ কাহিনী ;
যুগে যুগে নরনারী-অক্ষুরাণ-আঁখিবারি
পুষ্ট করিছে তব বাহিনী।
তব তীর-ধীর-বায়ু হরিল কত না আয়ু,
কত আলো স্রোতোজলে মিলালো !
ভরি' তব ভাঙ্গা পাড় কত কোটী হাহাকার
ভাঙ্গা বুক রাঙ্গা আঁখি ঘুমালো !
ভরা কোল করি' খালি জননীরা আনে ডালি
যুগে যুগে মাগো তোরি অঙ্কে,—
কত না বালুর চর সে ব্যথায় উর্ব্বর
বলি-অঙ্কিত তট-পঙ্কে।

অশ্রুপূত ও জল, পূত তব তটতল
লুপ্ত করিয়া কত কীর্ত্তি ;
কত না চিতার ছাই মিশাইয়ে আছে, তাই
পবিত্র তব তট-মৃত্তি।
তাই আনি' তব মাটি গড়ি' নিজ দেবতাটি
তোমারি সলিলে যবে পূজি মা !
যুগে যুগে যত ব্যথা মানব পেয়েছে হেথা
তারি পূজা করি যে তা বুঝি না।
তাই গাহি তব তীরে, তাই নাহি তব নীরে,
তাই চাহি ঘুমাতে ও কোলে মা !
কলো কল্ কুলু কুল্ এ ধারার কোথা মূল
কোথা কূল দিস্ যদি ব'লে মা !
বন্দি ত্রিকালজয়ী গঙ্গে মূর্ত্তিময়ী—
অনন্ত-জীব-ব্যথা-প্রবাহ !
অনাদি ও ক্রন্দনে মিশাইনু ক্রন্দন এ,
বুঝে নে মা এ প্রাণের কি দাহ !

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

মানব-বন্দনা

১

সেই আদি-যুগে যবে অসহায় নর,
নেত্র মেলি' ভবে,
চাহিয়া আকাশ-পানে—কারে ডেকেছিল,
দেবে, না মানবে ?
কাতর আহ্বান সেই মেঘে মেঘে উঠি',
লুটি' গ্রহে গ্রহে,
ফিরিয়া কি আসে নাই, না পেয়ে উত্তর,
ধরায় আগ্রহে ?
সেই ক্ষুব্ধ অন্ধকারে, মরুত-গর্জ্জনে,
কার অন্বেষণ ?
সে নহে বন্দনা-গীতি, ভয়ার্ত্ত—ক্ষুধার্ত্ত
খুঁজিছে স্বজন !

২

আরক্ত প্রভাত-সূর্য্য উদিল যখন
ভেদিয়া তিমিরে,
ধরিত্রী অরণ্যে ভরা, কর্দ্দমে পিচ্ছিল—
সলিলে শিশিরে।

শাখায় ঝাপটি' পাখা গরুড় চীৎকারে,
কাণ্ডে সর্পকুল ;
সম্মুখে শ্বাপদ-সঙ্ঘ বদন ব্যাদানি'
আছাড়ে লাঙ্গুল
দংশিছে দংশক গাত্রে, পদে সরীসৃপ,
শূন্যে শ্যেন উড়ে ;—
কে তাহারে উদ্ধারিল ? দেব, না মানব—
প্রস্তরে লগুড়ে ?

৩

শীর্ণ অবসন্ন দেহ, গতিশক্তি-হীন,
ক্ষুধায় অস্থির ;
কে দিল তুলিয়া মুখে স্বাদু পক্ব ফল,
পত্রপুটে নীর ?
কে দিল মুছায়ে অশ্রু ? কে বুলা'ল কর
সর্ব্বাঙ্গে আদরে ?
কে নব-পল্লবে দিল রচিয়া শয়ন
আপন গহ্বরে ?
দিল করে পুষ্পগুচ্ছ, শিরে পুষ্পলতা,
অতিথি-সৎকার ;
নিশীথে বিচিত্র সুরে বিচিত্র ভাষায়
স্বপন-সম্ভার !

৪

শৈশবে কাহার সাথে জলে স্থলে ভ্রমি'
শিকার-সন্ধান ?
কে শিখাল ধনুর্ব্বেদ, বহিত্র-চালনা,
চর্ম্ম-পরিধান ?
অর্দ্ধ-দগ্ধ মৃগমাংস কার সাথে বসি',
করিনু ভক্ষণ ?
কাষ্ঠে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালি' কার হস্ত ধরি',
কুন্দন নর্ত্তন ?
কে শিখাল শিলাস্তূপে, অশ্বত্থের মূলে
করিতে প্রণাম ?
কে শিখাল ঋতুভেদ, চন্দ্র-সূর্য্য-মেঘে,
দেব-দেবী নাম ?

৫

কৈশোরে কাহার সনে মৃত্তিকা-কর্ষণে
হইনু বাহির ?
মধ্যাহ্নে কে দিল পাত্রে শালি-অন্ন ঢালি'
দধি দুগ্ধ ক্ষীর ?
সায়াহ্নে কুটীরচ্ছায়ে কার কণ্ঠ সাথে
নিবিদ্ উচ্চারি' ?
কার আশীর্ব্বাদ ল'য়ে অগ্নি সাক্ষী করি'
হইনু সংসারী ?

কে দিল ঔষধি রোগে, ক্ষতে প্রলেপন,
স্নেহে অনুরাগে ?
কার ছন্দে—সোম-গন্ধে—ইন্দ্র অগ্নি বায়ু
নিল যজ্ঞ-ভাগে ?

৬

যৌবনে সাহায্যে কার নগর-পত্তন,
প্রাসাদ-নির্ম্মাণ ?
কার ঋক্ সাম যজুঃ, চরক সুশ্রুত,
সংহিতা, পুরাণ ?
কে গঠিল দুর্গ, সেতু, পরিখা, প্রণালী,
পথ, ঘাট, মাঠ ?
কে আজ পৃথিবী-রাজ ? জলে স্থলে ব্যোমে
কার রাজ্যপাট ?
পঞ্চভূত বশীভূত, প্রকৃতি উন্নীত,
কার জ্ঞানে বলে ?
ভুঞ্জিতে কাহার রাজ্য—জন্মিলেন হরি
মথুরা কোশলে ?

৭

প্রবীণ সমাজ-পদে, আজি প্রৌঢ় আমি
যুড়ি' দুই কর,
নমি, হে বিবর্ত্ত-বুদ্ধি ! বিদ্যুৎ-মোহন,
বজ্রমুষ্টিধর !

চরণে ঝটিকাগতি—ছুটিছ উধাও
দলি' নীহারিকা !
উদ্দীপ্ত তেজসনেত্রে—হেরিছ নির্ভয়ে
সপ্তসূর্য্য-শিখা !
গ্রহে গ্রহে আবর্ত্তন—গভীর নিনাদ
শুনিছ শ্রবণে !
দোলে মহাকাল-কোলে অণু পরমাণু—
বুঝিছ স্পর্শনে !

৮

নমি, হে সার্থক-কাম ! স্বরূপ তোমার
নিত্য অভিনব !
মর দেহে নহ মর, অমর-অধিক
স্থৈর্য্য ধৈর্য্য তব !
ল'য়ে সলাঙ্গুল দেহ, স্থূলবুদ্ধি তুমি
জন্মিলে জগতে,—
শুষিলে সাগর শেষে, রসাইলে মরু,
উড়ালে পর্ব্বতে !
গঠিলে আপন মূর্ত্তি—দেবতা-লাঞ্ছন,
কালের পৃষ্ঠায় !
গড়িছ—ভাঙ্গিছ তর্কে, দর্শনে, বিজ্ঞানে,
আপন স্রষ্টায় !

৯

নমি, হে বিশ্বগ-ভাব ! আজন্ম চঞ্চল,
বিচিত্র, বিপুল !
হেলিছ—দুলিছ সদা, পড়িছ আছাড়ি',
ভাঙ্গি' সীমা—কূল !
কি ঘর্ষণ—কি ধর্ষণ, লম্ফন—গর্জ্জন,
দ্বন্দ্ব—মহামায় !
কে ডুবিল—কে উঠিল, নাহি দয়ামায়া,
নাহিক নিস্তার !
নাহি তৃপ্তি, নাহি শ্রান্তি, নাহি ভ্রান্তি ভয়
কোথায়—কোথায় !
চিরদিন এক লক্ষ্য,—জীবন-বিকাশ
পরিপূর্ণতায় !

১০

নমি তোমা, নরদেব ! কি গর্ব্বে গৌরবে
দাঁড়ায়েছ তুমি !
সর্ব্বাঙ্গে প্রভাত-রশ্মি, শিরে চূর্ণ মেঘ,
পদে শস্পভূমি।
পশ্চাতে মন্দির-শ্রেণী, সুবর্ণ-কলস
ঝলসে কিরণে ;
বালকণ্ঠ-সমুত্থিত নবীন উদগাথ
গগনে পবনে।

হৃদয়-স্পন্দন সনে ঘুরিছে জগৎ,
চলিছে সময় ;
ভ্রূভঙ্গে—ফিরিছে সঙ্গে—ক্রম ব্যতিক্রম,
উদয় বিলয় !

১১

নমি আমি প্রতিজনে,—আদ্বিজ চণ্ডাল,
প্রভু ক্রীতদাস !
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু,
সমগ্রে প্রকাশ !
নমি, কৃষি-তন্তু-জীবী, স্থপতি, তক্ষণ,
কর্ম্ম-চর্ম্ম-কার !
অদ্রিতলে শিলাখণ্ড—দৃষ্টি-অগোচরে
বহ অদ্রি-ভার !
কত রাজ্য, কত রাজা গড়িছ নীরবে
হে পূজ্য, হে প্রিয় !
একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে,—
আত্মার আত্মীয় !

অক্ষয়কুমার বড়াল।

সাথী

ওগো সাথী ! মম সাথী !—আমি সেই পথে যাবো সাথে,
যে-পথে আসিবে তরুণ প্রভাত অরুণ তিলক মাথে।

যে-পথে কাননে আসে ফুলদল,
যে-পথে কমলে পশে পরিমল,
যে-পথে মলয় আনে সৌরভ শিশির-সিক্ত প্রাতে !
(আমি সেই পথে যাবো সাথে !)

যে-পথে বধূরা যমুনার কূলে
যায় ফুল হাতে প্রেমের দেউলে
যে-পথে বন্ধু বন্ধুর দেশে চলে বন্ধুর সাথে !
(আমি সেই পথে যাবো সাথে !)

যে-পথে পাখীরা যায় গো কুলায়,
যে-পথে তপন যায় সন্ধ্যায়,
সে পথে মোদের হবে অভিসার শেষ তিমির-রাতে !

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন।

স্বদেশ

বল বল বল সবে
শত বীণা বেণু রবে
ভারত আবার জগত সভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
কর্ম্মে মহান্ হবে,
ধর্ম্মে মহান্ হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার
পুরাতন এ পূরবে!

আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী,
ঘিরি তিন দিক্ নাচিছে লহরী,
যায়নি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী
এখনো অমৃত-বাহিনী—
প্রতি প্রান্তর, প্রতি গুহাবন,
প্রতি জনপদ, তীর্থ অগণন
কহিছে গৌরব-কাহিনী!—

বিদুষী মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী,
সতী ও সাবিত্রী, সীতা, অরুন্ধতী,
বহু বীরবালা, বীরেন্দ্র-প্রসূতি,
—আমরা তাঁদেরই সন্ততি!

অনলে দহিয়া রাখে যারা মান
পতি পুত্র তরে সুখে ত্যজে প্রাণ
আমরা তাঁদেরই সন্ততি !

ভোলেনি ভারত ভোলেনি সে কথা,
অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা,
নানক নিমাই করেছিল ভাই
সকল ভারত-নন্দনে
ভুলি ধর্ম্মদ্বেষ জাতি অভিমান
ত্রিশ কোটি দেহ হবে একপ্রাণ
এক জাতি প্রেম-বন্ধনে !

মোদের এ দেশ নাহি রবে পিছে
ঋষিরাজকুল জনমেনি মিছে
দুদিনের তরে হীনতা বহিছে
জাগিবে আবার জাগিবে—
আসিবে শিল্প, ধন, বাণিজ্য
আসিবে বিদ্যা, বিনয়, বীর্য্য,
—আসিবে আবার আসিবে।

এস হে কৃষক কুটীরনিবাসী,—
এস হে অনার্য্য গিরি-বন-বাসী,—
এস হে সংসারী, এস হে সন্ন্যাসী—
মিল হে মায়ের চরণে—!

এস অবনত, এস হে শিক্ষিত—
পরহিতে সবে হইয়া দীক্ষিত,
মিল হে মায়ের চরণে—
এস হে হিন্দু, এস মুসলমান,
এস হে পারসী, বৌদ্ধ, খৃষ্টিয়ান্
—মিল হে মায়ের চরণে

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন।

শ্যামাঙ্গী বর্ষাসুন্দরী

মুক্ত মেঘ-বাতায়নে বসি',
এলোকেশী কে ঐ রূপসী ?
জলযন্ত্র ঘুরায়ে ঘুরায়ে,
জলরাশি দিতেছে ছড়ায়ে !
রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ করি',
সারাদিন, সারারাত্রি, বারিরাশি পড়িছে ঝঝ রি।

চমকিল বিদ্যুৎ সহসা !
এ আলোকে বুঝিয়াছি, এ নারীরে চিনিয়াছি ;
এ যে সেই সতত-সরসা,
ভুবনমোহিনী ধনী রূপসী বরষা।

শ্যামাঙ্গী বরষা আজি, বিহ্বলা মোহিনী সাজি',
এলায়ে দিয়েছে তার মসীবর্ণ কাল কাল চুল ;
শ্রীকণ্ঠে প'রেছে বালা, অপরাজিতার মালা,
দু'কর্ণে দোদুল দোলে নীলবর্ণ ঝুমকার ফুল !

নীলাম্বরী সাড়ীখানি পরি,
অপূর্ব্ব মল্লার রাগ ধ'রেছে সুন্দরী !
স্রস্ত কেশরাশি হ'তে বেলফুল চৌদিকে ঝরিছে ;
কালোরূপ ফাটিয়া পড়িছে !
যাই বলিহারি !
কে দেখেছে কবে ভবে হেন বরনারী ?

দেবেন্দ্রনাথ সেন।

তাজমহল

এ কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর সা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান।
শুধু তব অন্তর-বেদনা
চিরন্তন হ'য়ে থাক্ সম্রাটের ছিল এ সাধনা।
রাজশক্তি বজ্র-সুকঠিন
সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক্ লীন,
কেবল একটী দীর্ঘশ্বাস
নিত্য উচ্ছ্বসিত হ'য়ে সকরুণ করুক আকাশ
এই তব মনে ছিল আশ।

হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হ'য়ে যাক্,
শুধু থাক্
এক বিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

হায়রে মানবহৃদয়
বারবার
কারো পানে ফিরে চাহিবার
নাই যে সময়,
নাই নাই!
জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই।
ভুবনের ঘাটে ঘাটে ;—
এক হাটে লও বোঝা, শূন্য ক'রে দাও অন্য হাটে ;

দক্ষিণের মন্ত্র-গুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবী-মঞ্জরী
যেইক্ষণে দেয় ভরি'
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,
বিদায় গোধুলি আসে ধূলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।
সময় যে নাই ;
আবার শিশিররাত্রে তাই

নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোলে নব কুন্দরাজি
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি।
হায়রে হৃদয়
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।
নাই নাই, নাই যে সময়!

হে সম্রাট, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয় হরণ
সৌন্দর্য্যে ভুলায়ে।
কণ্ঠে তার কি মালা দুলায়ে
করিলে বরণ
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে?
রহে না যে
বিলাপের অবকাশ
বারোমাস,
তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে
চিরমৌন জাল দিয়ে বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে।

জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে
সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে।

প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা'
সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে,
হে সম্রাট কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে
যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া

প্রভাতের অরুণ আভাসে,
ক্লান্ত-সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্য-বিলাসে,
ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হ'তে আসে ফিরে ফিরে।

তোমার সৌন্দর্য্যদূত যুগ যুগ ধরি'
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্ত্তা নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

চ'লে গেছ তুমি আজ,
মহারাজ ;

রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে
সিংহাসন গেছে টুটে ;
তব সৈন্যদল
যাদের চরণভরে ধরণী করিত টলমল
তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে
উড়ে যায় দিল্লির পথের ধূলি' পরে।
বন্দীরা গাহে না গান ;
যমুনা-কল্লোল সাথে নহবৎ মিলায় না তান ;
তব পুরসুন্দরীর নূপুর নিক্কণ
ভগ্ন প্রাসাদের কোণে
ম'রে গিয়ে ঝিল্লিস্বনে
কাঁদায় রে নিশার গগন।

তবুও তোমার দূত অমলিন
শ্রান্তি-ক্লান্তিহীন,
তুচ্ছ করি' রাজ্য ভাঙাগড়া,
তুচ্ছ করি' জীবন-মৃত্যুর ওঠা-পড়া,
যুগে যুগান্তরে
কহিতেছে একস্বরে
চির বিরহীর বাণী নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

মিথ্যা কথা,—কে বলে যে ভোলে নাই ?
কে বলে রে খোলে নাই
স্মৃতির পিঞ্জর দ্বার ?

অতীতের চির অস্ত-অন্ধকার
অজিও হৃদয় তব রেখেচে বাঁধিয়া ?

বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়া
আজিও সে হয়নি বাহির ?
সমাধিমন্দির
এই ঠাঁই রহে চির স্থির ;
ধরার ধূলায় থাকি',
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি'।

জীবনেরে কে রাখিতে পারে ?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিচে তাহারে ?
তা'র লাগি নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্ব্বাচলে আলোকে আলোকে।

স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধন-বিহীন।
মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোনোদিন
পারে নাই তোমারে ধরিতে ;
সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট, তোমারে ভরিতে
নাহি পারে,—
তাই এ ধরারে
জীবন উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে
মৃৎপাত্রের মত যাও ফেলে।

তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্ত্তিরে তোমার
বারংবার !
তাই
চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।

যে প্রেম সম্মুখপানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,
যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন,
তা'র বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধূলার মত জড়ায়ে ধরেচে তব পায়ে,
দিয়েচে তা' ধূলিরে ফিরায়ে।
সেই তব পশ্চাতের পদধূলি' পরে
তব চিত্ত হ'তে বায়ুভরে
কখন্ সহসা
উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হ'তে খসা।

তুমি চলে' গেছ দূরে
সেই বীজ অমর অঙ্কুরে
উঠেচে অম্বর পানে,
কহিছে গম্ভীর গানে—
যত দূর চাই
নাই নাই সে পথিক নাই।

প্রিয়া তা'রে রাখিল না, রাজ্য তা'রে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্র-পর্ব্বত।
আজি তা'র রথ
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বার পানে।
তাই
স্মৃতিভারে আমি পড়ে' আছি
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রতিমা

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে—এ বিশ্ব নিখিল
তোমারি প্রতিমা;
মন্দির তোমার কি গড়িব মা গো! মন্দির যাঁহার
দিগন্ত নীলিমা!
তোমার প্রতিমা শশী, তারা, রবি,
সাগর, নির্ঝর, ভূধর, অটবী,
নিকুঞ্জভবন, বসন্ত-পবন, তরু, লতা, ফল, ফুলমধুরিমা!

সতীর পবিত্র প্রণয়-মধু,—মা !
শিশুর হাসিটি, জননীর চুমা,
সাধুর ভকতি, প্রতিভা, শকতি,
—তোমারি মাধুরী তোমারি মহিমা ;
যেই দিকে চাই এ নিখিল ভূমি—
শতরূপে মা গো ! বিরাজিত তুমি,
বসন্তে, কি শীতে, দিবসে, নিশীথে,
বিকশিত তব বিভব-গরিমা !
তথাপি মাটির এ প্রতিমা গড়ি',
তোমারে পূজিতে চাই মা ঈশ্বরী !
অমর কবির হৃদয় গভীর
ভাষায় যাহার দিতে নারে সীমা ;
খুঁজিয়ে বেড়াই অবোধ আমরা,
দেখি না আপনি দিয়েছ মা ধরা,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে হাতটি বাড়ায়ে,
ডাকিছ নিয়ত করুণাময়ী মা !

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

রামের বিলাপ

"রাজ্য ত্যজি', বনবাসে নিবাসিনু যবে,
লক্ষ্মণ, কুটীর-দ্বারে, আইলে যামিনী,
ধনুঃ করে, হে সুধন্বি, জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি ; আজি রক্ষঃপুরে—
আজি এই রক্ষঃপুরে, অরি-মাঝে আমি
বিপদ্-সলিলে মগ্ন ; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে
বিরাম? রাখিবে আজি কে, কহ, আমারে?
উঠ, বলি ! কবে তুমি বিরত পালিতে
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা ? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—
চির-ভাগ্যহীন আমি—ত্যজিলা আমারে,
প্রাণাধিক, কহ, শুনি কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী ?
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি' রক্ষঃ-কারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি। কেমনে ভুলিলে—
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে, হে, আজি,
মাতৃ-সম নিত্য যা'রে সেবিতে আদরে ?
হে রাঘব-কুল-চূড়া, তব কুলবধূ
রাখে বাঁধি' পৌলস্তেয় ! না শাস্তি' সংগ্রামে
হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব

এ শয়ন—বীর-বীর্য্যে সর্ব্বভুক্-সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি? উঠ ভীম-বাহু,
রঘুকুল-জয়-কেতু! অসহায় আমি
তোমা' বিনা, যথা রথী শূন্য-চক্র রথে!
তোমার শয়নে হনু বলহীন, বলি,
গুণহীন ধনুঃ যথা; বিলাপে বিষাদে
অঙ্গদ; বিষণ্ণ মিতা সুগ্রীব সুমতি;
অধীর কর্ব্বুরোত্তম বিভীষণ রথী;
ব্যাকুল এ বলি-দল! উঠ ত্বরা করি';—
জুরাও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি'!—
"কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্দ্ধর, চল ফিরি' যাই বনবাসে।
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি,'—
অভাগিনী!—নাহি কাজ বিনাশি' রাক্ষসে।
তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূ-তীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর? কি কহিব, সুধিবেন যবে
মাতা,—'কোথা, রামভদ্র, নয়নের মণি
আমার, অনুজ তোর?' কি বলে' বুঝাব
ঊর্ম্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে?
উঠ, বৎস! আজি কেন বিমুখ, হে, তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যা'র প্রেম-বশে,
রাজ্য-ভোগ ত্যজি' তুমি পশিলা কাননে।

সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন; মুছিতে যতনে
অশ্রু-ধারা; তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে,
প্রাণাধিক? হে লক্ষ্মণ, এ আচার কভু
(সুভ্রাতৃ-বৎসল তুমি বিদিত জগতে!)
সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি
আমার! আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি',
পূজিনু দেবতা-কুলে ;—দিলা কি দেবতা
এই ফল? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি;
শিশির-আসারে নিত্য সরস কুসুমে,
নিদাঘার্ত্ত; প্রাণ-দান দেহ এ প্রসূনে!
সুধা-নিধি তুমি, দেব সুধাংশু; বিতর
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে—
বাঁচাও, করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।"

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

অন্ধ বধূ

পায়ের তলায় নরম ঠেক্‌ল কি !
আস্তে একটু চল্‌না ঠাকুর-ঝি—
ওমা, এ যে ঝরা-বকুল ! নয় ?
তাইত' বলি, বসে' দোরের পাশে,
রাত্তিরে কাল—মধু-মদির বাসে
আকাশ-পাতাল—কতই মনে হয় !
জ্যৈষ্ঠ আস্‌তে ক'দিন দেরী ভাই—
আমের গায়ে বরণ দেখা যায় ?
—অনেক দেরী ? কেমন করে' হবে !
কোকিল-ডাকা শুনেছি সেই কবে,
দখিন হাওয়া—বন্ধ কবে ভাই ;
দীঘির ঘাটে নতুন সিঁড়ি জাগে—
শেওলা-পিছল—এম্‌নি শঙ্কা লাগে,
পা পিছ্‌লিয়ে তলিয়ে যদি যাই
মন্দ নেহাৎ হয়না কিন্তু তায়—
অন্ধ চোখের দ্বন্দ্ব চুকে' যায় !

দুঃখ নাইক সত্যি কথা শোন্,
অন্ধ গেলে কি আর হবে, বোন ?
বাঁচ্‌বি তোরা—দাদা ত' তোর আগে ;
এই আষাঢ়েই আবার বিয়ে হবে,
বাড়ী আসার পথ খুঁজে' না পাবে—
দেখ্‌বি তখন—প্রবাস কেমন লাগে !
—কি বল্লি ভাই, কাঁদবে সন্ধ্যা-সকাল ?
হা অদৃষ্ট, হায় রে আমার কপাল !
কত লোকেই যায় ত' পরবাসে—
কাল-বোশেখে কে না বাড়ী আসে ?
চৈতালি কাজ, কবে যে সেই শেষ !
পাড়ার মানুষ ফির্‌ল সবাই ঘর,
তোমার ভায়ের সবই স্বতন্তর—
ফিরে' আসার নাই কোন উদ্দেশ !
—ঐ যে হেথায় ঘরের কাঁটা আছে—
ফিরে' আস্‌তে হবে ত' তার কাছে !
এইখানেতে একটু ধরিস্ ভাই,
পিছল ভারি—ফস্‌কে যদি যাই—
এ অক্ষমার রক্ষা কি আর আছে !
আসুন ফিরে'—অনেক দিনের আশা,
থাকুন ঘরে, না থাক্ ভালবাসা—
তবু দুদিন অভাগিনীর কাছে !
জন্মশোধের বিদায় নিয়ে ফিরে'—
সেদিন তখন আস্‌ব দীঘির তীরে।

'চোখ-গেল' ঐ চেঁচিয়ে হ'ল সারা !
আচ্ছা দিদি, কি কর্‌বে ভাই তারা—
জন্ম লাগি' গিয়েছে যার চোখ !
কাঁদার সুখ যে বারণ তাহার, ছাই !
কাঁদ্‌তে পেলে বাঁচ্‌ত সে যে ভাই,
কতক তবু কম্‌ত যে তার শোক !
'চোখ-গেল'—তার ভরসা তবু আছে,
চক্ষুহীনার কি কথা কার কাছে !
টানিস্‌ কেন ? কিসের তাড়াতাড়ি—
সেই ত ফিরে' যাব আবার বাড়ী,
একলা-থাকা সেই ত' গৃহকোণ—
তার চেয়ে এই স্নিগ্ধ শীতল জলে
দুটো যেন প্রাণের কথা বলে—
দরদ-ভরা দুখের আলাপন ;
পরশ তাহার মায়ের স্নেহের মত'
ভুলায় খানিক মনের ব্যথা যত !
এবার এলে, হাতটি দিয়ে গায়ে,
অন্ধ আঁখি বুলিয়ে খানিক পায়ে—
বন্ধ চোখের অশ্রু রুধি' পাতায়,
জন্ম-দুখীর দীর্ঘ আয়ু দিয়ে
চিরবিদায় ভিক্ষা যাব নিয়ে,
সকল বালাই বহি' আপন মাথায় !—
দেখিস তখন, কাণার জন্য আর
কষ্ট কিছু হয় না যেন তাঁর ।

তার পরে—এই শেওলা-দীঘির ধার—
সঙ্গে আস্‌তে বল্‌ব নাক আর,
শেষের পথে কিসের বল' ভয়—
এইখানে এই বেতের বনের ধারে,
ডাহুক-ডাকা সন্ধ্যা-অন্ধকারে—
সবার সঙ্গে সাঙ্গ পরিচয়!
শেওলা-দীঘির শীতল অতল নীরে—
মায়ের কোলটি পাই যেন ভাই ফিরে'!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

শেষ

ফোটে ফুল ঝরে যায়, লুটায় ধূলায়,
ভরে যায় বনতল পাটল পাতায়;
আকাশে হারায়ে যায় পুরাণ দিবস
স্মৃতিতে জড়ায়ে থাকে সুরভি-পরশ।
অর্পি নবীনের শিরে মুকুট-রতন
ফিরে যায় কুণ্ঠাহীন চিরপুরাতন;—
আদি সে সফল হয় আসে যবে শেষ,
রূপে রাগে ধরা দেয় মূর্ত্ত নিরুদ্দেশ!

আসা যাওয়া, ফিরে চাওয়া,—মিছে অভিনয় ?
প্রাণপণ আকিঞ্চন, একি কিছু নয় ?
যুগ যুগ রহস্যের নিভৃত নির্ঝর,
জলধনু-তোরণের বর্ণ-রেণু-শর
কোথা ধায় ? কে সুধায় ? মূক নিরুত্তর—
কাঞ্চন-শৃঙ্গের মত কি মন্ত্রে নিথর !—
হায় ধ্রুব কোথা খুঁজি ! মুছি অশ্রুধারা—
অতল স্পর্শের তলে কোথা হই হারা !

একি রঙ্গ ! অফুরন্ত জন্ম মৃত্যু খেলা—
তরুবল্লী-পশুপক্ষী-পতঙ্গের মেলা !
মুক্ত দ্বার,—অবারিত প্রাণের ভাণ্ডার—
অকস্মাৎ যবনিকা মাঝখানে তার !—
কবে বল' কোথা কোন্ নেপথ্য-আড়ালে,
কোন্ রজনীর প্রান্তে দীপ্ত চক্রবালে,
ফুরাইবে এ বিরহ ? পারাবার-শেষে
চুম্বিব অনন্ত বেলা তোমারি উদ্দেশে !

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অতিথি

১

সন্ধ্যা-তারকা উঠেছে তখন
গগন-পারে,
আসিল সে একা— অজানা অতিথি,
আমার দ্বারে।

চাহিনু যেমনি মুখপানে তা'র,
মনে হ'ল—সে যে চির আপনার,
বরণ করিয়া মন্দিরে মোর
লইনু তা'রে।
আসিল সে যবে অজানা অতিথি
আমার দ্বারে !
রতন-প্রদীপ জ্বালিয়া অমনি
যতন-ভরে
কুসুম-আসন করিনু রচনা
তাহার তরে।

ভুলি' দুরাশায় ভাবিলাম মনে—
প্রবাসীর শত স্নেহের বাঁধনে
চিরদিন তরে এই গৃহ-মাঝে
রাখিব ধরে'।
কুসুম-আসন করিনু রচনা
যতন-ভরে।

২

তখনো প্রাচীতে আসেনি অরুণ,
জাগেনি পাখী,
তখনো নিদ্রা- আবেশে অবশ
আমার আঁখি।

ঘর ছাড়ি আসি অতিথি আমার
বাহিরিল পথে একাকী আবার,
নিবায়ে প্রদীপ গৃহখানি মোর
আঁধারে ঢাকি'।
তখনো প্রাচীতে আসে নাই উষা,
জাগেনি পাখী।
জানিনা কোথায় কতদূর তা'র
আপন দেশ,
কবে হবে তা'র এই নিদারুণ
যাত্রা শেষ!

দিয়াছিনু মোর যত উপহার,
ফেলে গেছে সব, তবু মনে তা'র
জাগিবে কি কভু ক্ষণিক নিশার
স্মৃতির লেশ।
এই নিদারুণ যাত্রা তাহার
কোথায় শেষ।

৩

কণ্ঠে তাহার ছিল অমূল্য
রতন-হার,
ছিন্ন করিয়া ফেলে গেছে যত
মুকুতা তা'র !
তা'র সেই ধন কোথা আমি রাখি ;
হারাই হারাই ভয়ে সদা থাকি,
অতিথি আমার ফিরিয়া কি কভু
আসিবে আর ।
হার ছিঁড়ে সে যে ফেলে গেছে যত
মুকুতা তা'র !

রমণীমোহন ঘোষ ।

ভক্তবৎসল ভগবান্

দ্বেষ নাহি কোন' জনে, বাঁধে মৈত্রীর বন্ধনে,
সর্ব্বজীবে সকরুণ প্রাণ,
নির্ম্মম নিরহঙ্কার, সুখ দুঃখ সম যার,
শত্রুতেও যেই ক্ষমাবান্ ।

সতত সন্তুষ্ট যতী, আমা'পরে স্থিরমতি,
সংযতাত্মা যেই জিতেন্দ্রিয়,
আমাতেই বুদ্ধি মন, সঁপয়ে জীবন ধন,
সেই ভক্ত—আমার সে প্রিয়।
অন্যে নাহি দেয় ব্যথা, অব্যথ আপনি তথা,
নাহি জানে চিত্তের বিকার,
হর্ষ রাগ ভয়োদ্বেগ, ক্রোধের নাহি আবেগ,
সেই ভক্ত—প্রিয় সে আমার।
নাহি কোন অভিরুচি, যিনি দক্ষ, যিনি শুচি,
উদাসীন রহে নিরাধার,
কর্ম্মে নাহি অনুরাগ, বিষয়েতে বীতরাগ,
সেই ভক্ত—প্রিয় সে আমার।
নাহি শোক হর্ষ দ্বেষ, আকাঙ্ক্ষার নাহি লেশ,
শুভাশুভ না করে বিচার,
আমাতে অচলা ভক্তি, আমায় অনন্যাসক্তি,
সেই ভক্ত—প্রিয় সে আমার।
শত্রু মিত্র সম জ্ঞান, তথা মান অপমান,
অনাসক্ত ভকত উদার,
শীত উষ্ণ হর্ষ খেদ, সুখ দুঃখে নাহি ভেদ,
সর্ব্ব ভূতে সম দৃষ্টি যার,
স্তুতি নিন্দা তুল্য দেখে, বাক্যেতে সংযম শেখে,
যাহা পায় সন্তুষ্ট আপন;
গেহহীন ভ্রমে যতী, অভ্রান্ত সরল গতি,
প্রিয় বড় আমার সে জন।

কহিনু যে ধর্ম্মামৃত, রহে তাহে চিরাশ্রিত,
উপাসয়ে যথা যে নিয়ম,
শ্রদ্ধাবান্ ভক্তিমান্, আমায় তদ্গত প্রাণ,
সব হ'তে মম প্রিয়তম।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বসন্তে

সখি রে,—
বন অতি রমিত হইল ফুল-ফুটনে।
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,
উছলে সু-রবে জল, চল লো বনে।
চল লো জুড়াব আঁখি দেখি ব্রজরমণে।

সখি রে,—
উদয়-অচলে উষা দেখ আসি হাসিছে।
এ বিরহ বিভাবরী, কাটানু ধৈরয ধরি
এবে লো রব কি করি? প্রাণ কাঁদিছে।
চল লো নিকুঞ্জে যথা কুঞ্জমণি নাচিছে।

সখি রে,—

পূজে ঋতুরাজে আজি ফুলজালে ধরণী।

ধূপরূপে পরিমল, আমোদিছে বনস্থল,

বিহঙ্গমকুল-কল, মঙ্গলধ্বনি।

চল লো নিকুঞ্জে পূজি শ্যামরাজ, সজনি!

সখি রে,—

পাদ্যরূপে অশ্রুধারা দিয়া ধোব চরণে।

দুই কর-কোকনদে, পূজিব রাজীব-পদে,

শ্বাসে ধূপ, লো প্রমদে, ভাবিয়া মনে।

কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-ধ্বনি বাজিবে লো সঘনে।

* * * *

সখি রে,—

বন অতি রমিত হইল ফুল-ফুটনে।

পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,

উছলে সু-রবে জল, চল লো বনে।

চল লো জুড়াব আঁখি দেখি মধুসূদনে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

সমুদ্রমন্থনে শিব

সুরাসুর যক্ষ রক্ষ ভুজঙ্গ কিন্নর।
সভে মথিলেক সিন্ধু না জানে শঙ্কর॥
দেখিয়া নারদ মুনি হইয়া চিন্তিত।
কৈলাস-শিখরে গিয়া হৈল উপনীত॥
প্রণমিলা শিবদুর্গা দুঁহার চরণে।
আশীর্ব্বাদ করি দেবী দিলেন আসনে॥
নারদ বলিলা আছিলাম সুরপুরে।
শুনিল মথিলা সিন্ধু যত সুরাসুরে॥
বিষ্ণু পাইলা কমলা কৌস্তভ মণি আদি।
হয় উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত গজনিধি॥
দেবে নানা রত্ন পাইল মেঘে পাইল জল।
অমৃত অমরবৃন্দ কল্পতরুবর॥
নানা ধাতু মহৌষধি পাইল নরলোকে।
এই হেতু হৃদয়ে জন্মিল বহু শোকে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে নিবসে যতজনে।
সভে ভাগ পাইল কেবল তোমা বিনে॥
তে কারণে তত্ত্ব লইতে আইলাম হেথা।
সভার ঈশ্বর তুমি বিধাতার ধাতা॥
তোমারে না দিয়া ভাগ বাঁটি সভে নিল।
এই হেতু মোর মন ধৈর্য্য না হইল॥

এতেক নারদ মুনি বলিলা বচন।
শুনিয়া উত্তর না করিল ত্রিলোচন ॥
দেখি ক্রোধে কম্পিতা কহেন ত্রিলোচনা।
নারদেরে কহে দেবী করি অভ্যর্থনা ॥
কাহারে এতেক বাক্য কহিলে মুনিবর।
বৃক্ষেরে কহিলে যেন না পায় উত্তর ॥
কণ্ঠেতে হাড়ের মালা বিভূষণ যার।
কৌস্তুভের মণিরত্ন কিবা কাজ তার ॥
কি কাজ চন্দনে যার বিভূষণ ধূলি।
অমৃতে কি কাজ তার ভক্ষ্য সিদ্ধিমূলী ॥
মাতঙ্গে কি কাজ যার বলদ বাহন।
পারিজাতে কিবা কাজ ধুস্তূর ভূষণ ॥
সকল চিন্তিয়া মোর অঙ্গ জরজর।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব জান মুনিবর ॥
জানিয়া ইঁহারে দক্ষ পূজা না করিল।
সেই অভিমানে আমি শরীর ত্যজিল ॥
দেবীর বচনে হাসি বলেন ভগবান্।
যে বলিলা হৈমবতী কিছু নহে আন ॥
বাহন ভূষণ মোর কোন্ প্রয়োজন।
আমি লই যাহা নাহি লয় অন্যজন ॥
ভক্তিতে করিয়া বশ মাগি নিল দাস।
অম্লান অম্বর পট্টাম্বর দিব্যবাস ॥
ঘৃণা করি ব্যাঘ্রচর্ম্ম কেহ না লইল।
তেঞি মোর বাঘাম্বর পরিতে হইল ॥

অগুরু চন্দন লইল কুঙ্কুম কস্তুরী।
বিভূতি না লয় তেঁই বিভূষণ করি॥
মণিরত্ন সভে লইল মুকুতা প্রবাল।
কেহ না লইল তেঁই আছে হাড়মাল॥
বিল্বপত্র ধুস্তূরা-কুসুম ঘনঘসি।
কেহ না লইল তেঁই অঙ্গেতে বিভূষি॥
রথ গজ লইল বাহন পরিচ্ছদ।
কেহ না লইল তেঁই আছয়ে বলদ॥
কহিলা যে দক্ষ মোরে পূজা না করিল।
অজ্ঞান-তিমিরে দক্ষ মোহিত আছিল॥
তেঁই মোকে না জানিয়া পূজা না করিল।
তাহার উচিত ফল তৎক্ষণে পাইল॥
দেবী বলে দারাপুত্র গৃহী যেইজন।
তাহারে না হয় যুক্ত এসব বচন॥
বিভব বিভূতি আদি সঙ্গে যত জনে।
সংসারে বিমুখ ইথে আছে কোন্ জনে॥
সংসারেতে বিমুখ যেজন এ সকলে।
কাপুরুষ বলিয়া তাহারে লোকে বলে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্রে তুমি যেমত পূজিত।
সাক্ষাতেতে সে সকল হৈতেছে বিদিত॥
রত্নাকর মথিয়া লভিল রত্নগণ।
কেহ না পুছিল তোমা করিয়া হেলন॥
পার্ব্বতীর এই বাক্য শুনিয়া শঙ্কর।
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ কাঁপে থরথর॥

কাশীরাম কহে কাশীপতি ক্রোধমুখে।
বৃষভ সাজিতে আজ্ঞা করিলা নন্দীকে ॥

পার্ব্বতীর কটুভাষ শুনি ক্রোধে দিশ্বাস
টানিয়া আনিল বাঘবাস।
বাসুকি নাগের দড়ি কাঁকালি বাঁধিল বেড়ি
তুলিয়া লৈল যুগপাশ ॥
কপালে কলঙ্কি-কলা কণ্ঠেতে হাড়ের মালা
করযুগে কঙ্কুকি কঙ্কণ।
ভানু বৃহদ্ভানু শশী ত্রিবিধ প্রকার ভূষি
ক্রোধে যেন প্রলয়-কিরণ ॥
যেন গিরি হেমকুটে আকাশে লহরী উঠে
উথে মধ্যে গঙ্গা জটাজূটে।
রজত-পর্ব্বত-আভা কোটি-চন্দ্র-মুখ-শোভা
ফণি-মণি বিরাজে মুকুটে ॥
গলে দিল হার সাপ টঙ্কারি ফেলিল চাপ
ত্রিশূল ভ্রূকুটি লইয়া করে।
পদভরে ক্ষিতি লড়ে চিৎকার ছাড়িয়া চলে
অতিশয় বেগে ভয়ঙ্করে ॥
ডম্বুরের ডিমি ডিমি আকাশ পাতাল ভূমি
কম্প হইল ত্রৈলোক্য মণ্ডলে।
অমর ঈশ্বর ভীত আর সবে সচিন্তিত
এ কোন প্রলয় হৈল বলে ॥

বৃষভ সাজিয়া বেগে নন্দী আনি দিল আগে
নানা রত্ন করিয়া ভূষণ।
ক্রোধে কাঁপে ভূতনাথ যেন কদলীর পাত
অতি শীঘ্র কৈলা আরোহণ॥
আশু-দলে সেনাপতি ময়ূর বাহনে গতি
শক্তি করে করি ষড়ানন।
গণেশ চড়িয়া মূষ করে ধরি পাশাঙ্কুশ
দক্ষিণ ভাগেতে ক্রোধ-মন॥
বামে নন্দী মহাকাল করে শূল গলে মাল
পাছে জ্বরাসুর ষট্ পদে।
চলিলা দেবের রাজ . দেখিয়া শিবের কাজ
তিন লোকে গণেন প্রমাদে॥
ক্ষণেকে ক্ষীরোদ-কূলে উত্তরিলা সহ দলে
যথায় মথনে সুরাসুর।
কাশীরাম দাস কয় শীঘ্রগতি প্রণময়
সর্ব্বদেবে দেখিয়া ঠাকুর॥

করজোড়ে দাণ্ডাইলা সর্ব্ব দেবগণ।
শিব বলে মথ সিন্ধু রহাইলে কেন॥
ইন্দ্র বলে মথন হৈল দেব শেষ।
নিবারিয়া আপনে গেলেন হৃষীকেশ॥
একে ক্রোধে আছিলেন দেব মহেশ্বর।
দ্বিতীয় ইন্দ্রের বাক্যে কম্পে কলেবর॥

শিব বলে এত গর্ব্ব তোমা সভাকার।
আমারে হেলন কর এত অহঙ্কার॥
রত্নাকর মথি সভে রত্ন লৈলে বাঁটি।
হেন চিত্তে না করিলে আছয়ে ধূর্জ্জটি॥
যে করিলে তাহা কিছু না করিয়ে মনে।
আমি মন্থিবারে কৈনু করহ হেলনে॥
এতেক বলিলা যদি দেব মহেশ্বর।
ভয়েতে দেবতা সব না করে উত্তর॥
নিঃশব্দে রহিলা সব দেবের সমাজ।
করজোড়ে বলয়ে কশ্যপ মুনিরাজ॥
অবধান কর দেব পার্ব্বতীর কান্ত।
কহিব ক্ষীরোদ-সিন্ধু-মথন-বৃত্তান্ত॥
পারিজাত-মালা দুর্ব্বাসার গলে ছিল।
স্নেহেতে সেই পুষ্পমালা ইন্দ্র গলে দিল॥
গজরাজ আরোহণে ছিলা পুরন্দর।
সেই মাল্য দিল তার দন্তের উপর॥
সহজে মাতঙ্গ অণুক্ষণ মদে মত্ত।
পশুজাতি না জানিল মালার মহত্ব॥
শুণ্ডে জড়াইয়া মালা ফেলিলা ভূতলে।
দেখিয়া দুর্ব্বাসা ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে॥
অহঙ্কারে ইন্দ্র মোরে অবজ্ঞা করিল।
মোর দত্ত মাল্য ইন্দ্র ছিঁড়িয়া ফেলিল॥
সম্পদে হইয়া মত্ত গর্ব্ব কৈল মোরে।
দিল শাপ হতলক্ষ্মী হও পুরন্দরে॥

ব্রহ্মশাপে লোকমাতা প্রবেশিল জলে।
লক্ষ্মী বিনা কষ্ট হৈল ত্রৈলোক্য মণ্ডলে॥
লোকের কারণ ব্রহ্মা কৃষ্ণে নিবেদিল।
সমুদ্র মথিতে আজ্ঞা নারায়ণ কৈল॥
এই হেতু ক্ষীরোদ মথিল মহেশ্বর।
শেষ মথনের দড়ি মন্থন মন্দর॥
অনেক উৎপাত হৈল বরুণের পুরে।
লক্ষ্মী দিয়া স্তুতি কৈল দেব বিশ্বেশ্বরে॥
নিবারি মথন তেঁই গেলা নারায়ণ।
পুনঃ তুমি আজ্ঞা কর মথন কারণ॥
বিষ্ণু-বলে বলবান্ আছিল অমর।
ইবে বিষ্ণু বিনা শ্রমযুক্ত কলেবর॥
দ্বিতীয় মথন-দড়ি নাগরাজ শেষ।
সাক্ষাতে আপনে প্রভু দেখ তার ক্লেশ॥
অঙ্গের যতেক হাড় সব হৈল চূর।
সহস্র মুখেতে লাল বহয়ে প্রচুর॥
বরুণের যত কষ্ট না যায় কথন।
আর আজ্ঞা নহে দেব মথন কারণ॥
শিব বলে আমা হেতু মথ একবার।
আসিবার অকারণ না হয় আমার॥
হরবাক্য কার শক্তি লঙ্ঘিবারে পারে।
পুনরপি মন্দর ধরিল দেবাসুরে॥
শ্রমেতে অশক্ত কলেবর সর্ব্বজনা।
ঘনশ্বাস বহে যেন আগুনের কণা॥

অত্যন্ত ঘর্ষণে পুনঃ মন্দর পর্ব্বত।
তপত হইল যেন জ্বলদগ্নিবৎ ॥
ছিঁড়ি খণ্ড খণ্ড হইল নাগের শরীর।
ক্ষীরোদ সাগরে সব বহিল রুধির ॥
অত্যন্ত ঘর্ষণ নাগ সহিতে নারিল।
সহস্র মুখের পথে গরল স্রবিল ॥
সিন্ধুর ঘর্ষণ-অগ্নি সর্পের গরল।
দেবের নিশ্বাস আর মন্দর-অনল ॥
চারি অগ্নি মিশ্রিত হইয়া এক হৈল
সমুদ্র হৈতে আচম্বিতে বাহিরিল ॥
প্রাতঃ হৈতে যেন দিনকর তেজ বাড়ে।
দাবানল বাড়ে যে শুষ্ক বন পোড়ে ॥
যুগান্তের কালে যেন সমুদ্রের জল।
মুহূর্ত্তেকে ব্যাপিলেক সংসার সকল
দহিল সভার অঙ্গ বিষম জ্বলনে।
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল সর্ব্বজনে ॥
পলায় সহস্রচক্ষু কুবের বরুণ।
পবন শমন অগ্নি পলায় অরুণ ॥
অষ্টবসু নবগ্রহ অশ্বিনীকুমার।
অসুর কিন্নর যক্ষ যত ছিল আর ॥
পলাইয়া গেল যত ত্রৈলোক্যের জন।
বিষণ্ণ বদনে চাহে দেব ত্রিলোচন ॥
দূর হৈতে সব দেবগণ করে স্তুতি।
রক্ষা কর ভূতনাথ অনাথের গতি ॥

*   *   *   *   *

*   *   *   *   *

আপন অর্জ্জিত সৃষ্টি বিষে করে নাশ।
হৃদয়ে চিন্তিয়া আগু হৈলা কৃত্তিবাস॥
সমুদ্র জুড়িয়া বিষ আকাশ পরশে।
আকর্ষণ করি হর করিল গণ্ডূষে॥
দূর হৈতে সুরাসুর দেখয়ে কৌতুকে।
করিল গরল পান একই চুম্বকে॥
অঙ্গীকৃত কারণ লৈল ধর্ম্ম দেখাবারে।
কণ্ঠেতে রাখিলা বিষ না লৈলা উদরে॥
নীলবর্ণকণ্ঠ অদ্যাপিহ বিশ্বনাথ।
নীলকণ্ঠ নাম সেই হৈতে হৈল খ্যাত॥

কাশীরাম দাস।

স্বদেশ

জান না কি জীব তুমি, জননী জনমভূমি,
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে ?
ভূমিতে করিয়া বাস, ঘুমেতে পূরাও আশ,
জাগিলে না দিবা বিভাবরী।
কত কাল হরিয়াছ, এই ধরা ধরিয়াছ,
জননী-জঠর পরিহরি॥
যার বলে বলিতেছ, যার বলে চলিতেছ,
যার বলে চালিতেছ দেহ।
যার বলে তুমি বলী, তার বলে আমি বলি,
ভক্তিভাবে কর তারে স্নেহ॥
প্রসূতি তোমার যেই, তাহার প্রসূতি এই,
বসুমাতা মাতা সবাকার।
কে বুঝে ক্ষিতির রীতি, তোমার জননী ক্ষিতি,
জনকের জননী তোমার॥
কত শস্য ফলমূল, না হয় যাহার মূল,
হীরকাদি রজত কাঞ্চন।
বাঁচাতে জীবের অসু, বক্ষেতে বিপুল বসু,
বসুমতী করেন ধারণ॥

সুগভীর রত্নাকর, হইয়াছে রত্নাকর,
রত্নময়ী বসুধার বরে।
শূন্যে করি অবস্থান, করে করে কর-দান,
তরণি ধরণীবাসি-করে॥
বরিষা ধরার পদ, পেয়ে পদ, নদী, নদ,
জীবনে জীবন রক্ষা করে।
মোহিনী মহীর মোহে, বহ্নি বারি বন্ধু দোঁহে,
প্রেমভাবে চরে চরাচরে॥
প্রকৃতির পূজা ধর, পুলকে প্রণাম কর,
প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে।
বিশেষতঃ নিজদেশে, প্রীতি রাখ সবিশেষে,
মুগ্ধ জীব যার মোহমদে॥
ইন্দ্রের অমরাবতী, ভোগেতে না হয় মতি,
স্বর্গভোগ উপসর্গ সার।
শিবের কৈলাস-ধাম, শিবপূর্ণ বটে নাম,
শিবধাম স্বদেশ তোমার॥
মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।
সুধাকরে কত সুধা, দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার॥
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥

স্বদেশের প্রেম যত, সেই মাত্র অবগত,
বিদেশেতে অধিবাস যার।
ভাব-তুলি ধ্যানে ধরে, চিত্তপটে চিত্র করে,
স্বদেশের সকল ব্যাপার॥
স্বদেশের শাস্ত্রমতে, চল সত্য ধর্ম্মপথে,
সুখে কর জ্ঞান আলোচন।
বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা, পূরাও তাহার আশা,
দেশে কর বিদ্যাবিতরণ॥
দিন গত হয় ক্রমে, কেন আর ভ্রম ভ্রমে,
স্থির প্রেমে কর অবধান।
বাস করি এই বর্ষে, এই ভাবে এই বর্ষে,
হর্ষে কর বিভুগুণগান॥
উপদেশ বাক্য ধর, দেশে কেন দ্বেষ কর,
শেষ কর মিছে সুখ-আশা।
তোমার যে ভালবাসা, সে হোল না ভালবাসা,
আর কোথা পাবে ভাল বাসা?
এ বাসা ছাড়িবে যবে, আর কি হে আশা রবে,
প্রাপ্ত হয়ে আশা-নাশা বাসা।
কেবা আর পায় দেখা, এলে একা, যাবে একা,
পুনর্ব্বার নাহি আর আসা॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

কাশীরাম দাস

চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
ঢালিয়া সংস্কৃত হ্রদে রাখিলা তেমতি,
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।
কঠোরে গঙ্গায় পূজি' ভগীরথ ব্রতী
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন !)
সগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি ;
পবিত্রিলা আনি' মায়ে, এ তিন ভুবন ;
সেইরূপে ভাষা-পথ খননি' স্ব-বলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে।
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।—
হে কাশী ! কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্ !

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ

বিস্ময়ে কহিলা শূর,—"সত্য যদি তুমি
রামানুজ, কহ, রথি, কি ছলে পশিলা
রক্ষোরাজপুরে আজি ? রক্ষঃ শত শত,
যক্ষপতিত্রাস বলে, ভীম-অস্ত্রপাণি,
রক্ষিছে নগর-দ্বার ; শৃঙ্গধরসম
এ পুর-প্রাচীর উচ্চ ;—প্রাচীর উপরে
ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলীরূপে ;—
কোন্ মায়াবলে, বলি, ভুলালে এ সবে ?
মানবকুলসম্ভব, দেবকুলোদ্ভবে
কে আছে রথী এ বিশ্বে, বিমুখয়ে রণে
একাকী এ রক্ষোবৃন্দে ? এ প্রপঞ্চে তবে
কেন বঞ্চাইছ দাসে, কহ তা দাসেরে,
সর্ব্বভুক্ ? কি কৌতুক এ তব, কৌতুকি ?
নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্রি, কেমনে
এ মন্দিরে পশিবে সে ? এখনও দেখ
রুদ্ধদ্বার ! বর, প্রভু, দেহ এ কিঙ্করে,
নিঃশঙ্কা করিব লঙ্কা বধিয়া রাঘবে
আজি, খেদাইব দূরে কিষ্কিন্ধ্যা-অধিপে,
বাঁধি আনি রাজপদে দিব বিভীষণে—
রাজদ্রোহী। ওই শুন, নাদিছে চৌদিকে

শৃঙ্গ শৃঙ্গনাদিগ্রাম! বিলম্বিলে আমি,
ভগ্নোত্তম রক্ষঃ-চমূ, বিদাও আমারে!"
উত্তরিলা দেবাকৃতি সৌমিত্রি কেশরী,—
"কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরন্ত রাবণি!
মাটী কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে!
মদে মত্ত সদা তুই; দেব-বলে বলী,
তবু অবহেলা, মূঢ়, করিস্ সতত
দেবকুলে! এত দিনে মজিলি দুর্ম্মতি!
দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে!"
এতেক কহিয়া বলী উলঙ্গিলা অসি
ভৈরবে! ঝলসি আঁখি কালানল-তেজে,
ভাতিল কৃপাণবর, শক্র করে যথা
ইরম্মদময় বজ্র! কহিলা রাবণি,—
"সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু
লক্ষ্মণ; সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব
মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ? আতিথেয় সেবা,
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে—
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।
সাজি বীরসাজে আমি। নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথিকুল-প্রথা আঘাতিতে তারে।
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে;—কি আর কহিব?"
জলদ-প্রতিমস্বনে কহিলা সৌমিত্রি,—

"আনায়-মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে ? বধিব এখনি,
অবোধ, তেমতি তোরে ! জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর, ক্ষত্রধর্ম্ম, পাপি, কি হেতু পালিব
তোর সঙ্গে ? মারি অরি, পারি যে কৌশলে।"
কহিলা বাসবজেতা,—(অভিমন্যু যথা
হেরি সপ্ত শূরে শূর তপ্তলৌহাকৃতি
রোষে!)—"ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক্ তোরে,
লক্ষ্মণ ! নির্লজ্জ তুই। ক্ষত্রিয়-সমাজে
রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায়, শুনিলে
নাম তোর রথিবৃন্দ ! তস্কর যেমতি,
পশিলি এ গৃহে তুই ; তস্কর সদৃশ
শাস্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি !
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে,
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে,
পামর ? কে তোরে হেথা আনিল দুর্ম্মতি ?"
চক্ষের নিমিষে কোষা তুলি ভীমবাহু
নিক্ষেপিলা ঘোর-নাদে লক্ষ্মণের শিরে।
পড়িলা ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে,
পড়ে তরুরাজ যথা প্রভঞ্জনবলে
মড়মড়ে ! দেব-অস্ত্র বাজিল ঝনঝনি,
কাঁপিল দেউল যেন ঘোর ভূকম্পনে !
বহিল রুধির-ধারা ! ধরিলা সত্বরে
দেব-অসি ইন্দ্রজিৎ;—নারিলা তুলিতে

তাহায়! কার্ম্মুক ধরি কর্ষিলা; রহিল
সৌমিত্রির হাতে ধনুঃ! সাপটিলা কোপে
ফলক; বিফল বল সে কাজ-সাধনে!
যথা শুণ্ডধর টানে শুণ্ডে জড়াইয়া
শৃঙ্গধরশৃঙ্গে বৃথা, টানিলা তূণীরে
শূরেন্দ্র! মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে!
চাহিলা দুয়ার-পানে অভিমানে মানী।
সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে
ভীমতম শূল-হস্তে, ধূমকেতুসম
খুল্লতাত বিভীষণে—বিভীষণ রণে!
"এতক্ষণে"—অরিন্দম কহিলা বিষাদে,
"জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে! হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ? শূলিশম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী?
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।"
উত্তরিলা বিভীষণ,—"বৃথা এ সাধনা,
ধীমন্! রাঘবদাস আমি; কি প্রকারে

তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধ ?" উত্তরিলা কাতরে রাবণি,—
"হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে !
রাঘবের দাস তুমি ? কেমনে ও-মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে !
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে ;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায় ? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি ? জনম তব কোন্ মহাকুলে ?
কেবা সে অধম রাম ? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে ;
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল-সলিলে,
শৈবালদলের ধাম ? মৃগেন্দ্র কেশরী,
কবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে ? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে ?
কহ, মহারথি, একি মহারথি-প্রথা ?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা ! ছাড়হ পথ ; আসিব ফিরিয়া
এখনি ! দেখিব আজি কোন্ দেববলে,
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি !
দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,

রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের! কি দেখি
ডরিবে এ দাস হেন দুর্ব্বল মানবে?
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগল্‌ভে পশিল
দম্ভী; আজ্ঞা কর দাসে শাস্তি নরাধমে।
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল-কমলে
কীটবাস? কহ, তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি,—ভ্রাতৃপুত্র তব?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে?”

মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ, লক্ষ্যি রাবণ-আত্মজে,—

“নহি দোষী আমি, বৎস! বৃথা ভৎর্স মোরে
তুমি! নিজ-কর্ম্মদোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি!
বিরত সতত পাপে দেবকুল; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে!
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি! পরদোষে কে চাহে মজিতে?”

রুষিলা বাসবত্রাস! গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি,
কহিলা বীরেন্দ্র বলী,—“ধর্ম্মপথগামী,

হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি ;—কোন্ ধর্ম্মমতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পর পর সদা !
এ শিক্ষা হে রক্ষোবর ! কোথায় শিখিলে ?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা, হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্ব্বরতা কেন না শিখিবে ?
গতি যার নীচ-সহ নীচ সে দুর্ম্মতি ।"

হেথায় চেতন পাই মায়ার যতনে
সৌমিত্রি, হুঙ্কারে ধনু টঙ্কারিলা বলী ।
সন্ধানি বিন্ধিলা শূর খরতর শরে
অরিন্দম ইন্দ্রজিতে, তারকারি যথা
মহেষ্বাস শরজালে বিধেন তারকে !
হায় রে, রুধির-ধারা (ভূধর-শরীরে
বহে বরিষার কালে জলস্রোতঃ যথা,)
বহিল, তিতিয়া বস্ত্র, তিতিয়া মেদিনী !
অধীর ব্যথায় রথী, সাপটি সত্বরে
শঙ্খ, ঘণ্টা, উপহারপাত্র ছিল যত
যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিলা কোপে ;
যথা অভিমন্যু রথী, নিরস্ত্র সমরে
সপ্তরথি-অস্ত্রবলে, কভু বা হানিলা
রথচূড়া, রথচক্র ; কভু ভগ্ন অসি,

ছিন্ন চর্ম্ম, ভিন্ন বর্ম্ম, যা পাইলা হাতে !
কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসরণে,
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হ'তে
কর-পদ্ম-সঞ্চালনে ! সরোষে রাবণি
ধাইলা লক্ষ্মণ-পানে গর্জ্জি ভীমনাদে,
প্রহারকে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী !
মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে
ভীষণ মহিষারূঢ় ভীম দণ্ডধরে,
শূলহস্তে শূলপাণি ; শঙ্খ, চক্র, গদা
চতুর্ভুজে চতুর্ভুজ ; হেরিলা সভয়ে
দেবকুল রথিবৃন্দে সুদিব্য বিমানে।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাঁড়াইলা বলী
নিষ্ফল, হায় রে মরি, কলাধর যথা
রাহুগ্রাসে ; কিংবা সিংহ আনায়-মাঝারে !
ত্যজি ধনুঃ, নিষ্কোষিলা অসি মহাতেজাঃ
রামানুজ ; ঝলসিলা ফলক-আলোকে
নয়ন ! হায় রে, অন্ধ অরিন্দম বলী
ইন্দ্রজিৎ, খড়্গাঘাতে পড়িলা ভূতলে
শোণিতার্দ্র। থরথরি কাঁপিলা বসুধা ;
গর্জ্জিলা উথলি সিন্ধু ! ভৈরব আরবে
সহসা পূরিল বিশ্ব ! ত্রিদিবে, পাতালে,
মর্ত্ত্যে, মরামর জীব প্রমাদ গণিলা
আতঙ্কে ! যথায় বসি হৈম সিংহাসনে

সভায় কর্ব্বুরপতি, সহসা পড়িল
কনক-মুকুট খসি, রথচূড়া যথা
রিপুরথী কাটি যবে পাড়ে রথতলে !
সশঙ্ক লঙ্কের শূর স্মরিলা শঙ্করে !
প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল !
আত্মবিস্মৃতিতে, হায়, অকস্মাৎ সতী
মুছিলা সিন্দুর-বিন্দু সুন্দর ললাটে !
মূর্চ্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী
আচম্বিতে ; মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিল
শিশুকুল আর্ত্তনাদে, কাঁদিল যেমতি
ব্রজে ব্রজকুলশিশু, যবে শ্যামমণি,
আঁধারি সে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে !

অন্যায়-সমরে পড়ি, অসুরারি-রিপু,
রাক্ষস-কুল-ভরসা, পরুষ-বচনে
কহিলা লক্ষ্মণ শূরে,—"বীর-কুলগ্লানি,
সুমিত্রানন্দন, তুই ! শত ধিক্ তোরে !
রাবণনন্দন আমি, না ডরি শমনে !
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি
পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে !
দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে ? কি পাপে বিধাতা
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে ?
আর কি কহিব তোরে ? এ বারতা যবে
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে,

নরাধম? জলধির অতল সলিলে
ডুবিস্ যদিও তুই, পশিবে সে দেশে
রাজরোষ—বাড়বাগ্নিরাশিসম তেজে!
দাবাগ্নিসদৃশ তোরে দগ্ধিবে কাননে
সে রোষ, কাননে যদি পশিস্, কুমতি!
নারিবে রজনী, মূঢ়, আবরিতে তোরে।
দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন
ত্রাণিবে, সৌমিত্রি, তোরে, রাবণ রুষিলে?
কেবা এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে,
কলঙ্কি?" এতেক কহি, বিষাদে সুমতি
মাতৃপিতৃপাদপদ্ম স্মরিলা অন্তিমে।
অধীর হইলা ধীর ভাবি প্রমীলারে
চিরানন্দ! লোহ-সহ মিশি অশ্রুধারা,
অনর্গল বহি, হায়, আর্দ্রিল মহীরে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে।
নির্ব্বাণ পাবক যথা, কিংবা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

বৃত্র-সংহার

(ষষ্ঠ সর্গ)

বেষ্টিয়াছে ইন্দ্রপুরী দেব-অনীকিনী,
চৌদিকে বিস্তৃত যেন সাগর-সিকতা,
যোজন যোজন ব্যাপ্ত, প্রদীপ্ত ভাস্বতে—
দেবকুল সেইরূপ দিক্ আচ্ছাদিয়া।
দূরস্থিত, সন্নিহিত যত শৈলরাজি
অস্তোদয়-গিরিশৃঙ্গ প্রভায় উজ্জ্বল
অনন্তের সমুদয় নক্ষত্র বা যথা
বিস্তীর্ণ হইয়া দীপ্তি ধরে চতুর্দ্দিকে।
প্রাচীরে প্রাচীরে দৈত্য ভীষণদর্শন—
পাষাণ-সদৃশ বপু দীর্ঘ, উরস্বান্—
নানা অস্ত্র ধরি নিত্য করে পরিক্রম
ভীম দর্পে ভীম তেজে গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া,
জাগ্রত, সুসজ্জ, সদা যুদ্ধের সজ্জায়,
ভ্রমে দৈত্য বর্ম্মে বর্ম্মে, স্বর্গ আন্দোলিয়া,
আচ্ছাদি সুমেরু-অঙ্গ, বৈজয়ন্ত ঢাকি,
ঘোর শব্দ সিংহনাদ, অম্বর বিদারি!
অস্ত্রবৃষ্টি, শৈলবৃষ্টি, প্রতি-অহরহঃ,
অনন্ত আকুল করি উভয় সৈন্যেতে;

রাত্রি-দিবা যেন শূন্যে নিয়ত বর্ষণ,
বিদ্যুৎ-মিশ্রিত শিলা দিকে দিকে ব্যাপি।
ত্রিদশ-আলয়ে হেন অমর-দানবে
জ্বলিছে সমরবহ্নি নিত্য অহরহঃ;
বেষ্টিত অমরাবতী দেব-সৈন্যদলে।
সুদৃঢ়সঙ্কল্প উভ দেবতা-দনুজে।
অর্ণবের ঊর্ম্মিরাশি যথা প্রবাহিত
অহর্নিশ, অনুক্ষণ, বিরতি-বিশ্রাম,
স্রোতস্বতী বিধাবিত নিয়ত যদ্রূপ
ধারা প্রসারিয়া গতি সিন্ধু-অভিমুখে :—
সেইরূপ অবিশ্রাম দানব-অমরে
হয় যুদ্ধ অহরহঃ, স্বর্গ-বহির্দ্দেশে,
জয় পরাজয় নিত্য নিত্য অনিশ্চয়—
দৈত্যের বিজয় কভু, কখন ত্রিদশে।
সভাসীন বৃত্রাসুর সুমিত্রে সম্ভাষি
কহিছে গর্জ্জন করি বচন কর্কশ—
"যুদ্ধে নৈল পরাজিত এখন(ও) দেবতা
এখনও স্বরগ বেষ্টি দৈবত সকলে?
সিংহের নিলয়ে আসি শৃগালের দল
প্রকাশে বিক্রম হেন নির্ভয়-হৃদয়ে?
মত্তমাতঙ্গের শুণ্ডে করিয়া আঘাত
শ্বাপদ বেড়ায় হেন করি আস্ফালন?
ধিক্ আজি দৈত্য নামে! হে সৈনিকগণ!
সমরে অমর ত্রস্ত করিলা দানবে।

কোথা সে সাহস বীর্য্য শৌর্য্য পরাক্রম,
দনুজ যাহার তেজে চির-রণজয়ী ?
সসাগরা বসুন্ধরা যুদ্ধে করি জয়,
প্রকাশিল কতবার অতুল বিক্রম,
নাহি স্থান বসুধার কোথাও এমন,
কম্পিত না হয় আজি দানবের নামে—
পশিলা অমরাবতী জিনিয়া অবনী,
বিস্মিত করিয়া বসুন্ধরাবাসিগণে,
জিনিল স্বরগ যুদ্ধে অদ্ভুত প্রতাপে
মহাদম্ভী সুরকুলে সমরে লাঞ্ছিয়া ;
খেদাইলা দেববৃন্দে পাতালপুরীতে—
শশকবৃন্দের মত—দৈত্য-অস্ত্রাঘাতে
অচৈতন্য দেবগণ ব্যাপি যুগকাল
দুর্নিবার দৈত্যতেজ না পারি সহিতে !
সেই পরাজিত তিরস্কৃত সুরসেনা
আবার আসিয়া দম্ভে পশিল সংগ্রামে ;
না পারি জিনিতে তায় সুজিষ্ণু হইয়া
রে ভীরু দানবগণ ! নামে কলঙ্কিলা !
আপনি যাইব অদ্য পশিব সমরে ;
ঘুচাইব অমরের সমরের সাধ।"
বলিয়া গর্জ্জিলা বীর বৃত্র দৈত্যপতি,
ধরিলা শিবের শূল সিংহের বিক্রম।
দেখিয়া ত্রাসিত যত দানবসৈনিক,
বৃত্রাসুর-আস্য হেরি নিস্তব্ধ সকলে।

"আন্ রে সে শিবশূল— আন্‌রে অমর-
বিজয়ী ত্রিশূল যাহা দানিলা শঙ্কর।"
নিরথে মাতঙ্গযূথ যথা গজপতি
বিশাল বৃক্ষের কাণ্ড উপাড়ি, শুণ্ডেতে
তুলিয়া গগনমার্গে বিস্তারে যখন,
সু-উচ্চ শঙ্খের নাদে বৃংহতি করিয়া।
তখন বৃত্রের পুত্র বীর রুদ্রপীড়—
শোভিতমাণিকগুচ্ছ কিরীট যাহার,
অভেদ্য শরীর যার ইন্দ্রাস্ত্র ব্যতীত,
কহিলা পিতারে চাহি হ'য়ে কৃতাঞ্জলি ;—
কহিলা—"হে তাত জিষ্ণু দৈত্যকুলেশ্বর !
অভিলাষ নন্দনের নিবেদি চরণে,
কর অবধান পিতঃ, পূরাও বাসনা,
দেহ আজ্ঞা আমি অদ্য যাই এ সংগ্রামে
যশস্বিন্। যশঃ যদি সকলি আপনি
মণ্ডিবেন নিজ শিরে, কি উপায়ে তবে
আত্মজ আমরা তব হব যশোভাগী ?
কোন্ কালে আমরা তবে লভিব সুখ্যাতি,
কীর্ত্তি যাহা বীরলব্ধ বীরের আরাধ্য,—
বীরের বাঞ্ছিত যশঃ ত্রিভুবনে যাহা,
সকলি আপনি পিতা কৈলা উপার্জ্জন,
কি রাখিলে রণকীর্ত্তি মণ্ডিতে তনয়ে ?
ভাবিতে ত হয় তাত, ভবিষ্যতে চাহি,
সন্ততি পিতার নাম রাখিবে কিরূপে ?

জ্বালিলা যে যশোদীপ, প্রদীপ্ত কেমনে
রাখিবে তব অঙ্গজগণ অতঃপরে ?
জন্ম বৃথা ! কর্ম্ম বৃথা ! বৃথা বংশখ্যাতি !
কীর্ত্তিমান্ জনকের পুত্র হওয়া বৃথা।
স্বনামে যদি না ধন্য হয় সর্ব্বলোকে—
জীবনে জীবন-অন্তে চিরস্মরণীয় !
বিভব, ঐশ্বর্য্য, পদ সকলি সে বৃথা !
পিতৃভাগ্য হয় যদি ভোগ্য তনয়ের,
পূজ্য সেই কোন কালে নহে কোন লোকে,
জলবিম্ববৎ ক্ষণে ভাসিয়া মিশায় !
বিজয়ী পিতার পুত্র নহিলে বিজয়ী,
গৌরব সম্পদ্ তেজঃ নাহি থাকে কিছু,
ভ্রমিতে পশ্চাতে হয় ফেরুবৃন্দবৎ,
দানব-অমর-যক্ষ-মানব-ঘৃণিত !
সুরবৃন্দ পুনর্ব্বার ফিরিবে এ স্থানে,
তব বংশজাতগণে ভাবি তুচ্ছ কীট,
না মানিবে কেহ আর বিশ্ব-চরাচরে,
তেজস্বী দৈত্যের নামে হইয়া শঙ্কিত।
যশোলিপ্সা কদাচিৎ ভীরুর(ও) অন্তরে
উদ্দীপ্ত হইয়া তারে করে বীর্য্যবান্ !—
বীরের স্বর্গই যশঃ, যশই জীবন ;
সে যশে কিরীট আজি বান্ধিব শিরসে।
কর অভিষেক, পিতঃ, এ দাসেরে আজ
সেনাপতি-পদে তব, সমরে নিঃশেষি

ত্রিংশৎত্রিকোটি দেব, আসিয়া নিকটে
ধরিব মস্তকে দেখ অই পদরেণু।
জানিবে অসুর সুর—নহে সে কেবল
দানবকুলের চূড়া দানবের পতি,
অজেয় সংগ্রামে নিত্য—অনিবার্য্য রণে
অন্য বীর আছে এক—আত্মজ তাঁহার।"
চাহিয়া সহর্ষচিত্তে পুত্রের বদনে,
কহিলা দনুজেশ্বর বৃত্রাসুর হাসি ;—
"রুদ্রপীড় ! তব চিত্তে যত অভিলাষ,
পূর্ণ কর যশোরশ্মি বান্ধিয়া কিরীটে ;
বাসনা আমার নাই করিতে হরণ
তোমার সে যশঃপ্রভা পুত্র যশোধর !
ত্রিলোকে হয়েছ ধন্য, আরও ধন্য হও
দৈত্যকুল উজলিয়া দানব-তিলক !
তবে যে বৃত্রের চিত্তে সমরের সাধ
অদ্যাপি প্রোজ্জ্বল এত, হেতু সে তাহার
যশোলিপ্সা নহে পুত্র, অন্য সে লালসা,
নারি ব্যক্ত করিবারে বাক্য বিন্যাসিয়া !
অনন্ত তরঙ্গময় সাগরগর্জ্জন,
বেলাগর্ভে দাঁড়াইলে যথা সুখকর ;
গভীর শর্ব্বরীযোগে গাঢ় ঘনঘটা
বিদ্যুতে বিদীর্ণ হয়, দেখিলে সে সুখ—
কিংবা সে গঙ্গোত্রী-পার্শ্বে একাকী দাঁড়ায়ে
নিরখি যখন অম্বুরাশি ঘোর নাদে

পড়িছে পৰ্ব্বতশৃঙ্গে স্রোতে বিলুণ্ঠিয়া
ধরাধর ধরাতল করিয়া কম্পিত !—
তখন অন্তরে যথা দেহ পুলকিত
দুর্জ্জয় উৎসাহে হয় সুখবিমিশ্রিত,
সমর-তরঙ্গে পশি, খেলি যদি সদা
সেই সুখ চিত্তে মম হয় রে উত্থিত।
সেই সুখ সে উৎসাহ হায় কত কাল
না ধরি হৃদয়ে, জয় স্বর্গ যে অবধি,
চিত্তে অবসাদ সদা—কোথাও না পাই
দ্বিতীয় জগৎ যুদ্ধে লভি পুনর্ব্বার,
নাহি স্থান ত্রিভুবনে জিনিতে সংগ্রামে,
ভাবিয়া বৃত্রের চিত্তে পড়িয়াছে মলা ;
দেখ এ ত্রিশূল-অঙ্গে পড়িয়াছে যথা
সমর-বিরতি-চিহ্ন কলঙ্ক গভীর !
যাও যুদ্ধে তোমা অগ্র করি অভিষেক
সেনাপতি-পদে, পুত্র, অমর ধ্বংসিতে
যাও, যশোবিমণ্ডিত হইয়া আবার
এইরূপে আসি পুনঃ দাঁড়াও সাক্ষাতে।"
রুদ্রপীড় প্রফুল্লিত, পিতৃ-পদধূলি
সাদরে লইলা শিরে শুনিয়া ভারতী,
এ হেন সময়ে দূত নৈমিষ হইতে
প্রত্যাগত, সভাস্থলে হইল উপনীত।
দূরে দেখি দৈত্যপতি উৎসুক-হৃদয়,
কহিলা, "সন্দেশবহ, কি বারতা কহ।

কিরূপে এ পুরীমধ্যে প্রবেশিলে তুমি ?
কোথা ইন্দ্রজায়া শচী কোথা বা ভীষণ ?”
আশ্বস্ত হইয়া দূত কিঞ্চিৎ তখন
কহিতে লাগিলা পুরী-প্রবেশ-উপায়,
বায়ুতে চঞ্চল যথা বিশুষ্ক পলাশ,
রসনা তেমতি দ্রুত বিকম্পিত তার।
কহিলা, “প্রথম যবে আইনু এ স্থানে,
স্বর্গ হ'তে বহুদূর হিমাচলপথে
উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-শৃঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ
হইল আমার দেব-অনীকিনী-সহ।
নানা ছল নানা বেশ বিবিধ কৌশল
আশ্রয় করিয়া পরে হৈনু অগ্রসর,
চিনিতে নারিলা কেহ ; অতঃপর শেষে
পুরী-প্রান্তভাগে আসি হৈনু উপনীত।
প্রাচীর-নিকটে আসি অনেক চিন্তিয়া
উদয় হইল চিত্তে, জাগরিত যথা
সূর্য্য আদি দেব যত নিত্য অস্ত্রধারী,
ভ্রমে নিত্য অবিরত দ্বার নিরখিয়া।
আসন্ন বিপদ্ চিত্তে হইল উদয়,
জটিল কৌশল এক গূঢ়প্রতারণা—
ঐন্দ্রিলার পিতৃভূমি হিমালয়-পারে,
হয় যুদ্ধ সেইখানে গন্ধর্ব্ব-দানবে,
সেই সমাচার ল'য়ে ত্বরিত-গমনে
ঐন্দ্রিলা-নিকটে যাই, পিত্রাদেশে তাঁর,

দৈত্যকুলেশ্বর বৃত্র মহাবলবান্
সময়ে সহায় হন এ তাঁর প্রার্থনা।—
এ প্রস্তাবে দেবগণ শুভ ভাবি মনে
আদেশ করিল মোরে পুরী প্রবেশিতে ;
আদেশ পাইবামাত্র পুরীতে প্রবেশ
করিয়া প্রভুর পদে আসি উপনীত।"

শুনিয়া দূতের বাক্য কহে বৃত্রাসুর ;—
"এ বারতা দূত তোর অলীক কল্পনা
সঙ্গে শচী ইন্দ্রপ্রিয়া ভীষণ সংহতি—
শচী কি সে সূর্য্য আদি দেবে অবিদিত ?"

দানবরাজের বাক্যে দূতের রসনা
হইল জড়তাপূর্ণ কম্পবিরহিত—
যথা নব-কিশলয় বরষার নীরে
আর্দ্রতনু, বিলম্বিত তরুর শাখায়।
সুমিত্র দানব-মন্ত্রী কহিলা তখন,—
"দৈত্যেশ্বর, দূত বুঝি হৈলা অগ্রগামী,
পশ্চাতে ভীষণ ভাবি আ(ই)সে শচী-সহ
মঙ্গলবারতা নিত্য তড়িৎ-গমনা।"

নতমুখ নিম্নদৃষ্টি দূত ক্ষুণ্ণমতি,
কহিলা,—"না মন্ত্রি, ব্যর্থ আশ্বাস তোমার
নৈমিষ-অরণ্যে শচী জয়ন্তের সনে
করিছে নির্ভয়ে বাস—ভীষণ নিহত।"

"ভীষণ নিহত।"—গর্জ্জিলা দানবপতি।
"হা রে রে বালক—জয়ন্ত ইন্দ্রের পুত্র,

আমার সংহতি সাধ বিবাদে একাকী !—
দম্ভ তোর এত ?" বলি ছাড়িলা নিশ্বাস ;
"রুদ্রপীড় পুত্র, শুন কহি সে তোমারে,"
কহিলা তনয়ে চাহি গাঢ় নিরীক্ষণে—
"যশোলিপ্সা চিতে তব অতি বলবতী,
কর তৃপ্ত জয়ন্তেরে করিয়া আহুতি ;
শচীরে আনিতে চাহ অমরাবতীতে,
অন্যথা না হয় যেন, যাহ ধরাধামে ;
শত যোদ্ধা সুসৈনিক বীর-অগ্রগণ্য
লহ সঙ্গে অচিরাৎ পালহ আদেশ ।"

কৃতাঞ্জলি হ'য়ে মন্ত্রী সুমিত্র তখন
কহিলা,—"দৈত্যেন্দ্র, এবে দেব-পরিবৃত
বিস্তীর্ণ এ স্বর্গপুরী, কি প্রকারে কহ
কুমার ভেদি এ ব্যূহ হবেন নির্গত ?
যুদ্ধে পরাজয়ি যদি দেব-অনীকিনী,
নির্গত হইতে হয় আনিতে শচীরে,
না বুঝি তবে বা সিদ্ধ সত্বর কিরূপে
করিবে কুমার কহ, তব অভিপ্রেত ।
অসংখ্য এ দেব-সেনা দুর্জ্জয় সংগ্রামে,
অমর তাহাতে সবে সুদৃঢ়-প্রতিজ্ঞ,
শঙ্কিত নহেক কেহ অন্য-অস্ত্রাঘাতে,
মূর্চ্ছিত না হবে শিব-ত্রিশূল-বিহনে"।
তবে কি আপনি যুদ্ধে করিবেন গতি
কুমার-সংহতি অদ্য, দানব-ঈশ্বর ?

বিমুক্ত করিয়া পথ পাঠান যদ্যপি,
কি প্রকারে পুনঃ হেথা হবে বা নিবেশ ?"
দৈত্যেশ কহিলা ;—"মন্ত্রি, সেনাপতি-পদে
বরণ করেছি পুত্রে, না যাব আপনি,
রুদ্রপীড়ে দিব এই ত্রিশূল আমার,
যাইবে আসিবে শূলহস্তে অবারিত।"
নিষেধ করিলা মন্ত্রী তেয়াগিতে শূল,—
"পুরী-রক্ষা না হইবে অভাবে তাহার,
উপস্থিত হয় যদি সঙ্কট তাদৃশ
সমূহ দৈত্যের বল হবে নিঃসহায়।"
ভ্রূকুটি করিয়া তবে ললাট-প্রদেশে
স্থাপিয়া অঙ্গুলিদ্বয়, গর্ব্ব প্রকাশিয়া
কহিলা দানবপতি ;—"সুমিত্র হে, এই—
এই ভাগ্য যত দিন থাকিবে বৃত্রের,
জগতে কাহার সাধ্য নাহি সে আমায়
সমরে পরাস্ত করে—কিংবা অকুশল ;
অনুকূল ভাগ্য যার অসাধ্য কি তার—
ধর রে ত্রিশূল, পুত্র, বীর রুদ্রপীড় !"
রুদ্রপীড় কহে, "মন্ত্রি, কেন ত্রস্ত এত ?
জান না কি অভেদ্য এ আমার শরীর ?
বাসবের অস্ত্র ভিন্ন বিদীর্ণ কখন
না হইবে এই দেহ অন্য প্রহরণে।
ইন্দ্র নাহি উপস্থিত, চিন্তা কর দূর,
যাইব অমর-ব্যূহ ভেদিয়া সত্বর,

আসিব আবার ব্যূহ ভেদিয়া তেমতি
শচীরে লইয়া সঙ্গে এ স্বরগপুরে।
হে তাত, ত্রিশূল রাখ, নাহি রুদ্রতেজ
দেহেতে আমার, উহা নারিব তুলিতে;
বীর কভু নাহি রাখে নিষ্ফল আয়ুধ
বিব্রত হইতে পশি সংগ্রামের স্থলে।”

এইরূপে করিয়া ক্ষান্ত মন্ত্রী, বৃত্রাসুরে,
শত সুসৈনিক দৈত্য সংহতি লইয়া
অসুর-কুমার শীঘ্র প্রাচীর-সন্নিধি
উপনীত হৈলা সুখে সুসজ্জিত বেশে।
অনুসঙ্গী বীরগণ সহিত মন্ত্রণা
করিতে, কহিলা কেহ যুদ্ধ অবিধেয়,
কহিলা বা অন্য কেহ সমর উচিত—
রুদ্রপীড় নিপতিত উভয়-সঙ্কটে।
নিজ ইচ্ছা বলবতী, যশোলিপ্সা গাঢ়,
ঘটনা দুর্ঘট আর সুযোগ ঈদৃশ;
যুদ্ধই তাঁহার ইচ্ছা একান্ত প্রবল,
ছল কি কৌশল তাঁর নহে অভিপ্রেত।
নিরুপায় কোন মতে সমরে সম্মত
না পারি করিতে অন্য সঙ্গিগণে সবে,
অগত্যা সম্মতি দিলা অবশেষে তবে
অন্য কোন সদুপায় করিতে সুস্থির।
স্থির হৈল অবশেষে কাহার বচনে,
ভীষণের সহচর দূত যে কৌশলে

পশিলা নগরীমধ্যে, অবলম্বি তাহা,
নির্গত হইয়া গতি কর্ত্তব্য নৈমিষে।
কল্পনা করিয়া স্থির, দ্বারদেশে কোন,
আসি উপনীত দ্রুত—আসিয়া সেখানে
তুলিলা প্রাচীর-শিরে সুশুভ্র পতাকা,
দানবের যুদ্ধ-চিহ্ন শূল-বিরহিত।
উড়িল কেতন শুভ্র শূন্যে বিস্তারিত;
প্রকাণ্ড অর্ণবপোত ছিঁড়িয়া বন্ধন,
বাদাম উড়িল যেন আকাশমার্গেতে,
সমরকেতন অন্য হৈল সঙ্কুচিত।
বাজিল সম্ভাষ-শঙ্খ, দূত কোন জন
বার্ত্তা ল'য়ে প্রবেশিলা অমর-শিবিরে;
কহিলা সেনানীবর্গে উচ্চসম্ভাষণে,—
"বৃত্রাসুর দৈত্যপতি যে হেতু প্রেরিলা
ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্য হিমালয়পারে,
গন্ধর্ব্ব-সমরে তাঁর বিপন্ন জনক
দৈত্যেশ বৃত্রের ইচ্ছা প্রেরিতে সহায়
শত যোদ্ধা সেই স্থানে শীঘ্র অবিরোধে;
দেবকুল তাহে যদি থাকহ সম্মত,
সংগ্রামে বিশ্রাম তবে দেহ কিছু কাল,
বহির্গত হৈতে তবে দেহ শত যোধে,
ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্যে করিতে প্রস্থান।"

বার্ত্তা শুনি দেবপক্ষ-সেনাধ্যক্ষগণ—
বরুণ, পবন, অগ্নি, ভাস্কর, কুমার—

মিলিত হইয়া সবে করিলা মন্ত্রণা,
কি কর্ত্তব্য দানবের এ-বিধ প্রস্তাবে।
নিষেধ করিলা পাশী—প্রচেতা সুধীর,—
"উচিত না হয় পথ দিতে দৈত্যযোধে,
কপট, বঞ্চক, ক্রুর, দিতিসুত অতি,
নহেক উচিত বাক্যে প্রত্যয় তাদের!
ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্য হৈতে দূত কেহ
যদিও আসিয়া থাকে অজ্ঞাতে আমার,
বিশ্বাস কি তথাপি সে দূতের বচনে?
সেখানে থাকিলে পাশী না ছাড়িত তায়।"
সূর্য্য-অভিপ্রায়—"দৈত্য-যোদ্ধা শত জন
ঐন্দ্রিলার পিত্রালয়ে যাক অবিরোধে,
দেব-যোদ্ধা কিন্তু কেহ পশ্চাতে তাদের
গমন করুক যেন না পারে ফিরিতে।"
অগ্নি কহে—"দুই তুল্য আমার নিকটে,
নিষেধ নাহিক তার নাহি অনিষেধ,
অমর দৈত্যের সনে যেইখানে যাক্,
সম্মুখে পশ্চাতে শত্রু কি তাহে প্রভেদ?"
সতত অস্থিরচিত্ত পবন চঞ্চল,
কভু অভিমতে এর, কভু অন্যমতে,
অভিমত দিলা তার—সদা অনিশ্চিত—
যে কহে যখন মিলে তাহার(ই) সহিত।
মহাসেন, সেনাপতি সকলের শেষে
কহিলা পার্ব্বতীপুত্র—"বিপক্ষে দুর্ব্বল

করাই কর্ত্তব্য কার্য্য যুদ্ধের বিধানে ;
দৈত্যের প্রস্তাব দেবপক্ষে শ্রেয়স্কর।
স্বর্গ ছাড়ি মহাযোদ্ধা বীর শত জন
ধরাতে করিলে গতি দেবেরই মঙ্গল,
হীনবল হবে পুরী রক্ষক-বিহনে,
শ্রেয়ঃকল্প ছাড়িবারে অভিপ্রেত তাঁর।"

সেনাপতি-বাক্যে অন্য দেবতা সকলে
সম্মত হইলা—ধীর প্রচেতা ব্যতীত ;
বার্ত্তা ল'য়ে বার্ত্তাবহ প্রবেশি নগরে
রুদ্রপীড়-সন্নিধানে নিবেদিলা দ্রুত ;
মহাহর্ষ হৈল সবে ; দৈত্য-যোধ শত
নিষ্ক্রান্ত হইলা শীঘ্র ছাড়িয়া অমরা,
আহ্লাদে করিলা গতি পৃথিবী-উদ্দেশে
নৈমিষ অরণ্যে যথা শচী নিবসতি।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিমালয়

(১)

অসীম নীরদ নয়,
ও-ই গিরি হিমালয় !
উথুলে উঠেছে যেন অনন্ত জলধি ;
ব্যেপে দিগ্‌দিগন্তর,
তরঙ্গিয়া ঘোরতর,
প্লাবিয়া গগনাঙ্গন জাগে নিরবধি।

(২)

বিশ্ব যেন ফেলে পাছে
কি এক দাঁড়ায়ে আছে !
কি এক প্রকাণ্ড কাণ্ড মহান্ ব্যাপার !
কি এক মহান্ মূর্ত্তি,
কি এক মহান্ স্ফূর্ত্তি,
মহান্ উদার সৃষ্টি প্রকৃতি তোমার !

(৩)

পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম,
তুচ্ছ তারা সূর্য্য সোম
নক্ষত্র, নখাগ্রে যেন গণিবারে পারে !
সম্মুখে সাগরাম্বরা
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা,
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারে !

(৪)

ঝটিকা দুরন্ত মেয়ে
বুকে খেলা করে ধেয়ে,
ধরিত্রী গ্রাসিয়া সিন্ধু লোটে পদতলে !
জ্বলন্ত অনল ছবি
ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে রবি,
কিরণ জ্বলন জ্বালা মালা শোভে গলে ।

(৫)

ও-ই কিবা ধবধব
তুঙ্গ তুঙ্গ শৃঙ্গ সব
উর্দ্ধমুখে ধেয়ে গেছে ফুঁড়িয়া অম্বর ।
দাঁড়াইয়া পাদ-দেশে
ললিত হরিত বেশে
নধর নিকুঞ্জরাজি সাজে থরে থর !

(৬)

ও-ই গণ্ডশৈল-শিরে
গুল্মরাজি চিরে চিরে
বিকশে গৈরিক ঘটা ছটা রক্তময় !
তৃণ তরু লতা-জাল,
অপরূপ লালে লাল ;
মেঘের আড়ালে যেন অরুণ উদয় !

(৭)

কিবা ও-ই মনোহারী
দেবদারু সারি সারি,
দেদার চলিয়া গেছে কাতারে কাতার।
দূর দূর আলবালে,
কোলাকুলি ডালে ডালে,
পাতায় মন্দির গাঁথা মাথায় সবার!

(৮)

তলে তৃণ লতা পাতা
সবুজ বিছানা পাতা,
ছোট ছোট কুঞ্জবন হেথায় হোথায়।
কেমন পেখম ধরি,
কেকারব করি করি,
ময়ূর ময়ূরী সব নাচিয়া বেড়ায়।

(৯)

ফেনিল সলিল-রাশি,
বেগভরে পড়ে আসি,
চন্দ্রলোক ভেঙ্গে যেন পড়ে পৃথিবীতে!
সুধাংশু-প্রবাহ-পারা
শত শত ধায় ধারা,
ঠিকরে অসংখ্য তারা ছোটে চারি ভিতে!

(১০)

শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঠেকে ঠেকে,
লম্ফে লম্ফে ঝোঁকে ঝোঁকে,
জেলের জালের মত হয়ে ছত্রাকার,

ঘুরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে,
ফেনার আরশি ওড়ে,
উড়েছে মরাল যেন হাজার হাজার !

(১১)

নেমে নেমে ধারাগুলি,
করি করি কোলাকুলি,
একবেণী হয়ে হয়ে নদী বয়ে যায় ;
ঝরঝর কলকল
ঘোর রবে ভাঙ্গে জল
পশু পক্ষী কোলাহল করিয়া বেড়ায় ।

(১২)

কিবা ভৃগু-পাদ-মূলে
উথুলে উথুলে দুলে
ট'লে ঢ'লে চলেছেন দেবী সুরধুনী ;
কবির যোগীর ধ্যান,
ভোলা মহেশ্বর-প্রাণ,
ভারত-সুরভি-গাভী, পতিতপাবনী ।
পুণ্যতোয়া গিরিবালা !
জুড়াও প্রাণের জ্বালা !
জুড়াও ত্রিতাপ-জ্বালা মা তোমার জলে ।

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ।

হিমালয়

হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত
প্রভাতের দ্বার হ'তে সন্ধ্যার পশ্চিম নীড়পানে
দুর্গম দুরূহ পথে কি জানি কি বাণীর সন্ধানে !
দুঃসাধ্য উচ্ছ্বাস তব শেষপ্রান্তে উঠি আপনার
সহসা মুহূর্ত্তে যেন হারায়ে ফেলেছে কণ্ঠ তার
ভুলিয়া গিয়াছে সব সুর,—সামগীত, শব্দহারা
নিয়ত চাহিয়া শূন্যে বরষিছে নির্ঝরিণী ধারা !
হে গিরি, যৌবন তব যে দুর্দ্দম অগ্নিতাপবেগে
আপনারে উৎসারিয়া মরিতে চাহিয়াছিল মেঘে—
সে তাপ হারায়ে গেছে, সে প্রচণ্ড গতি অবসান,
নিরুদ্দেশ চেষ্টা তব হয়ে গেছে প্রাচীন পাষাণ !
পেয়েছ আপন সীমা, তাই আজি মৌন শান্ত হিয়া
সীমাবিহীনের মাঝে আপনারে দিয়েছ সঁপিয়া !

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

সিদ্ধার্থের বৈরাগ্য

রাজপথ

(বৃদ্ধের প্রবেশ)

সিদ্ধার্থ। এ কি ভীষণ আকার সম্মুখে আমার !
নরাকার কিন্তু নহে নর !
শুষ্ক চর্ম্ম অঙ্গে আবরণ ;
অবনত যেন মহাভারে—
উন্নত করিতে নারে শির।
কহ হে সারথি, কোন্ জাতি জীব এই ?

সারথি। নর-জাতি শুন হে কুমার,
অবনত বার্দ্ধক্যের ভারে,
অসহায় ভ্রমে ধরা'পরে,
জরাজীর্ণ শোচনায় দশা।

সিদ্ধা। এ দশা কি হয় সবাকার ?
অথবা কি দৈবের বিপাকে
এ দশা ইহার ?
নর-জাতি সবে কি হে বার্দ্ধক্য-অধীন ?

সার। হায় প্রভু, কাল বলবান্।
কৈশোর যৌবন কালের নিয়ম,
বার্দ্ধক্য তেমতি মতিমান্
এ দশা সবার,

নিস্তার নাহিক এতে কার,—
দেহিমাত্র বার্দ্ধক্য-অধীন।

সিদ্ধা। আমি—গোপা—ফুল্লকান্তি সহচরী সবে—
জরাগ্রস্ত হব কি সময়ে?

সার। যুবরাজ, সবে সমনিয়ম-অধীন;
রাজা কিংবা প্রজা—সমভাবে স্পর্শ করে কালে!

সিদ্ধা। এই সুখ ধরে কি সংসার?
জরার নিস্তার নাহি কার!
এই হেতু জীবনধারণ!
সুখের যৌবন—এইমাত্র পরিণাম!
হায়, হেন কারাগারে,
কোন্ সুখে বাস করে নরে?
কি কারণ শাসন-আলয়ে
উঠে জয়-জয়-ধ্বনি?

(জনৈক রুগ্ণের প্রবেশ)

রুগ্ণ। আমায় ধর, আমার প্রাণ যায়, আমার চারদিকে আগুন জ্বলছে—আমার অস্থিগ্রন্থি সব শিথিল হচ্ছে—আমায় ধর!

সিদ্ধা। জীর্ণ-শীর্ণ হের চমৎকার!
দেহ-ভার চরণ না বহে;
কহে—অনল চৌদিকে,
কম্পে ঘন ঘন,
মহাহিমে জর-জর তনু যেন!—
বার্দ্ধক্য কি স্পর্শিল ইহারে!

সার। মহারোগে শীর্ণ কলেবর—
অস্থিগ্রন্থি কাঁপে নিরন্তর,
কিন্তু দেহে ঘোর তাপ
বল-ক্ষয় রোগের প্রভাবে!

সিদ্ধা। কহ বিচক্ষণ,
এও কি হে দেহের নিয়ম?
এ দশা কি হয় সবাকার?

সার। চলে দেহ যন্ত্রের সমান,
হে ধীমন্,
কেবা জানে কবে প্রাপ্ত হইবে বিকার!
দেহমাত্রে রোগ করে অধিকার,
এ নিয়ম না হয় খণ্ডন।

সিদ্ধা। এই ছার দেহের গৌরব?
এই হেতু বৈভব-লালসা?
কলেবর রোগের আগার,
যত্ন এত তার, পীড়ার পোষণ-হেতু?
কুসুম-সৌরভ, তপন-গৌরব,
চন্দ্রমার হাসি,
চিত্তফুল্লকর কহে যাহা ভ্রান্ত নরে,
ব্যঙ্গ্য করে রুগ্‌ণ জনে!
বুঝিতে না পারি,
কি হেতু এ ধরাধামে বাস,
ক্ষণস্থায়ী সুখ-আশ কেন করে নরে!

(অদূরে মৃত দেহ দেখিয়া)

স্পন্দহীন, হের পথমাঝে,
জড় বা চেতন
নির্ণয় করিতে নারি !
রুক্ষকেশা বিবশা রমণী
পাশে বসি করিছে রোদন !
কহ বিবরণ, কিবা এই শোচনীয় ছবি?
দেখ—দেখ, বস্ত্রে করি আচ্ছাদন
কাষ্ঠ-সম ল'য়ে যায় স্পন্দহীন দেহ !

সার। বিচিত্র কালের গতি, শুন যুবরাজ !
আছিল চেতন,
এবে অচেতন—মৃত্যুর পরশে।
মহানিদ্রাগত !
এ অভাগা আর না জাগিবে

সিদ্ধা। কহ সত্য ছন্দক আমায়,
এ কি এই অভাগার কুলরীতি,
কিংবা সবাকার ও-ই পরিণাম ?
মহানিদ্রা-কোলে আমিও কি করিব শয়ন ?

সার। কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য, মরণ—
ক্রমে ক্রমে ফলে কালে যুবরাজ !
এই মানবের পরিণাম—
মৃত্যু ফেরে সাথে,
নাহিক নির্ণয় কবে কার হরিবে চেতন।

সিদ্ধা। বুঝিলাম—জলবিম্ব-সম এ শরীর !
গৌরব ইহার কিবা ?

অম্বুবিম্ব-প্রায় নর উঠে,
অম্বুবিম্ব-প্রায় পুনঃ টোটে।
পাছে মৃত্যু ফিরে লক্ষ্য নাহি করে ;
ভ্রান্ত নরে তবু করে সুখ-আশা !
জেনে শুনে অন্ধ রহে চিরদিন !
না জানি কি অলক্ষ্য প্রভাবে
ভুলায় মানবে,
দেখেও না দেখে,
জেনেও না জানে ;
আচরণে হয় অনুমান,
যেন অনন্ত সময়ে
ক্ষয় না হইবে কায় !
ধিক্—ধিক্ সংসার-প্রয়াস,
ধিক্ সুখ-আশ,
ধিক্ এ জীবন, ধিক্ এ চেতন !
শত ধিক্ ভঙ্গুর এ দেহে !
ভাবি মনে আমার—আমার !
কেবা কার মৃত্যু-পরে ?
ও-ই হাহাকারে কাঁদিছে রমণী—
কর্ণমূলে না পরশে ধ্বনি,
ধরায় সম্বন্ধ নাহি আর !

(ভিক্ষুকের প্রবেশ)

দেখ—দেখ,
গৈরিক বসন, প্রশান্ত বদন,

কমণ্ডলু করে—ধীরে করে আগমন।
কহ মোরে এ রহস্য কিবা ?

সার। বাসনা করিয়ে পরিহার,
ভ্রমে দ্বার দ্বার,
ভিক্ষাজীবী সংসার-সম্বন্ধ-হীন ;
সুখ-আশে দিয়া জলাঞ্জলি,
নির্জ্জনে ঈশ্বরে পূজে ;
ব্রহ্ম-উপাসনা বিনা নাহিক কামনা

সিদ্ধা। কোথা ব্রহ্ম ? কোথা তাঁর স্থান ?
শুনি ত্রিভুবন সৃজন তাঁহার ;
তবে কেন রোগ শোক জরা,
দুঃখের আগার ধরা ?
মৃত্যু কেন এ জীবনের পরিণাম ?
জীবকুল কিবা অপরাধী,
নিরবধি সহে দুঃখ ?
সন্তানের দুর্গতি দেখিতে
পিতা কভু নাহি পারে !
এ সংসার সন্তাপ-সাগর
সহে নর অশেষ যন্ত্রণা,
কেন ব্রহ্ম না করে মোচন ?
রোগ-শোকে করে আর্ত্তনাদ,
এ সংবাদ ব্রহ্ম নাহি পায় ?
কিংবা ব্রহ্ম,
শক্তিহীন দুঃখের মোচনে ?

তত্ত্ব আছে অবশ্য ইহার ;
শাস্ত্রব্যাখ্যা সকলি অসার,
শাস্ত্রকার অজ্ঞান সকলে !
সর্ব্বশক্তিমান্ যদি ভগবান্,
দয়াবান্ কভু সে ত নয় !
সত্বর চালাও রথ—
যাব আমি পিতার সদনে ;
লইব বিদায়, ভ্রমিব ধরায়
জ্ঞানালোক অন্বেষণে।
দুঃখের উপায়
পারি যদি করিতে নির্ণয়,
দেশে দেশে জনে জনে দিব উপদেশ ;
কাঁদে প্রাণ এ দুর্গতি হেরি,
আর গৃহে রহিতে না পারি ;
মমতায় আর নাহি বদ্ধ রব !
মহাকার্য্য সম্মুখে আমার,
অলসে না হরিব জীবন।
মহাকার্য্যে যদি মম তনু হয় ক্ষয়,
মৃত্যুকালে প্রবোধিব মনে,
যথাসাধ্য করেছি উদ্যম।

[সকলের প্রস্থান।]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

মহম্মদ ঘোরীর মন্ত্রণা-সভা

সম্বোধিয়া দূতগণে জিজ্ঞাসিলা ঘোরী,
মধুর গম্ভীর ভাষে,—
"হিন্দুস্থান-মাঝে
ছিলে সবে, এতদিন; কি দেখিলে সেথা?
কেমন সে দেশ বল; সম্পদ্, বিভব,
লোকের প্রকৃতি, ধর্ম্ম, যা' কিছু দেখেছ,
বল বিস্তারিয়া সবে; অগ্রে বল, আলি!"
সম্ভ্রমে নোয়ায়ে শির, ভূমি স্পর্শ করি',
আরম্ভিলা আলি :—
"কি কহিব, জাঁহাপনা!
অদ্ভুত, অপূর্ব্ব দেশ। বিশ্বস্রষ্টা যেন
সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে তা'রে নিরুপম করি'
গ'ড়েছেন ধরাধামে। সুনীল আকাশ,
সমুজ্জ্বল, দিবাভাগে, তপন-কিরণে;
জ্যোতির্ম্ময়, নিশাকালে, নক্ষত্রনিকরে;
দীপ্তিমান্ চন্দ্রালোকে। তুষার-ঝটিকা
না জানে সে দেশে কেহ। মধুর পবন
বহে সেথা সংবৎসর; স্রোতস্বতী যত
অমৃত-সলিলে পূর্ণ। তরুলতাগণ

ফলে ফুলে শোভাময়। নাহি জানি নাম,
আস্বাদে, সৌরভে কিন্তু চিত্ত বিমোহিত।
বিশাল সে দেশ; কোথা গিরি সুমহান্,
গগনে তুলিয়া শির, আছে বিরাজিত;
কোথা বনভূমি, পূর্ণ ভীষণ শ্বাপদে;
কোথা রম্য উপবন, পুষ্পে সুশোভিত,
মুখরিত বিহগের মধুর সঙ্গীতে।
যোজন-যোজন-ব্যাপী ক্ষেত্র স্নিগ্ধ-শ্যাম
শোভে কোথা; কোথা নদী বহে কল কলে;
খনি-গর্ভে জন্মে মণি; সাগরে মুকুতা;
নারী সেথা নিরুপমা। সমৃদ্ধা নগরী;
ফলে, শস্যে পূর্ণ পল্লী। কি ক'ব অধিক,
স্বর্গ স্বর্গ বলে লোক, স্বর্গ হিন্দুস্থান।"

হাসিয়া কহিলা ঘোরী,—

"হেন স্বর্গ হতে

কেন, তবে, এলে ফিরি' ?"

উত্তরিলা দূত,—

"আসিলাম, জাঁহাপনা! পথ দেখাইতে,
সঙ্গে পুনঃ যাব ব'লে।"

কহিলেন ঘোরী,—

"কহ, দূত! কহ শুনি, কোন্ কোন্ স্থান
দেখিয়া এসেছ তুমি।"

নিবেদিলা দূত,—

"এসেছি হেরিয়া, প্রভো! যমুনার তীরে
প্রাচীন নগরী দিল্লী, পূর্ণ ধনে, জনে;
জয়স্তম্ভে, দেবালয়ে, সুরম্য প্রাসাদে
অনুপম ধরা-মাঝে। দেখেছি কনোজ,
অবস্থিত গঙ্গাতটে; নানা দেশজাত
পণ্য-দ্রব্যে পরিপূর্ণ। দেখেছি আজ্‌মীর,
মরুসিন্ধু-বক্ষে রম্য, শ্যামদ্বীপ-সম
শোভাময়। হেরিয়াছি মথুরা নগরী,
বারাণসী, পুণ্যতীর্থ উভয় হিন্দুর;
আর(ও) কত শত স্থান। হিন্দুস্থানে গিয়া
এসেছি যা' নিরখিয়া বর্ণিবার নয়।"

"কি তুমি দেখেছ, এবে, বলহ, হানিফ্‌।"
সম্বোধি দ্বিতীয় দূতে কহিলেন ঘোরী,—
"কোন্ বেশে ছিলে সেথা?"

উত্তরিলা দূত,—

"মৌনী সন্ন্যাসীর বেশে। করেছি ভ্রমণ
তীর্থে তীর্থে, গ্রামে গ্রামে, নগরে প্রান্তরে;
দেখিয়াছি রাজা, প্রজা, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ।
পশি' কভু যজ্ঞশালে, কভু দেবালয়ে,
হেরিয়াছি ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার হিন্দুর;
শুনিয়াছি শাস্ত্রপাঠ, হ্রীং, ক্লীং, ওঁ।
কিন্তু, জাঁহাপনা! আমি না পারি বুঝিতে
কেন বিশ্বস্রষ্টা, হেন মনোহর দেশে,
এ হেন অধম জাতি করিলা সৃজন,

ধর্ম্মহীন, জ্ঞানহীন! এক, অদ্বিতীয়
ভুলি' পরমেশে আছে মূর্ত্তি-পূজা লয়ে।
অদ্ভুত তা'দের ধর্ম্ম; কেহ পূজে শিলা,
কেহ নদী, কেহ তরু। কেহ আঁখি মুদি'
করে মহাশূন্য ধ্যান। বিচিত্র তা'দের
মনোভাব, পূজারীতি। কহে কোন জন,
'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ'; আবার কেহ বা
নৃত্য করে নরবলি করিয়া প্রদান।
কেহ শাক্ত, কেহ শৈব, বৈষ্ণব কেহ বা;
কেহ পূজে বুদ্ধে, কেহ পূজে জিনদেবে।
নাহি হিতাহিত-জ্ঞান; মুক্তিলাভ-তরে
কেহ ডুবে নদীজলে; গিরিশৃঙ্গ হ'তে
পড়ে কেহ লম্ফ দিয়া; রথচক্রতলে
হয় কেহ নিষ্পেষিত; বক্ষে বিঁধে শূল;
বিদারে রসনা বাণে। নির্ম্মম নিষ্ঠুর;
পুত্রে দেয় ভাসাইয়া সাগরের জলে;
দগ্ধ করে, অবিভেদে, মাতায়, সুতায়,
বাঁধি' চিতা-কাষ্ঠে, তা'র মৃত পতি সনে;
বাজায় দামামা, যদি করে আর্ত্তনাদ।
বলে সবে হিন্দু মোরা, কিন্তু পরস্পর
জাতিধর্ম্মদ্বেষে, নিত্য, রত বিসংবাদে;
নাহি সখ্য, নাহি প্রেম। উচ্চবর্ণ, যদি
চামার, চণ্ডাল আদি হীনজাতি নরে
স্পর্শে কভু, স্নান করি' শুচি হয় তবে।

নহে বুদ্ধিহীন তা'রা, তর্কে সুনিপুণ ;
রচিয়াছে বহু গ্রন্থ। কিন্তু নাহি জানি,
কেন হেন মতিভ্রান্ত ! ব্যথিত অন্তর,
হিন্দুর দুর্ম্মতি হেরি'। সুলতান মামুদ,
ভাঙ্গি' দেবালয়, অর্থ করিয়া হরণ,
দণ্ডিলা বিধর্ম্মিগণে। কিন্তু, জাঁহাপনা !
ফলে নাহি ফল তাহে। থামিলে ঝটিকা
দাঁড়ায় যেমন তরু, পুনঃ, তুলি' শির,
তেমনি উঠেছে হিন্দু। তীব্র শাস্তি বিনা
না করিবে জ্ঞানলাভ। মস্‌লিম সমাজে
ধার্ম্মিকের বন্ধু এক জাঁহাপনা বিনা
এ অধর্ম্ম, অনাচার করিতে উচ্ছেদ
না আছে অপর কেহ। কালক্ষেপ আর
না হয় উচিত, প্রভো ! সঙ্কটে, বিপদে,
মস্‌লিমের বল যিনি, মহান্‌ ঈশ্বর,
হ'বেন সহায় তিনি।"

নীরবিলা দূত।

ঘোরীর ললাট-দেশ হইল কুঞ্চিত।
ত্যজি' মালা জপ, ফিরি', কুতবের পানে
চাহিলেন মৈয়ুদ্দিন। কহিলেন ঘোরী,—
"কি তুমি দেখেছ সেথা, বল, জাঁহান্দর !"

কহিলা তৃতীয় দূত,—

"সত্য, জাঁহাপনা !
হিন্দুস্থান-সম দেশ নাহি এ ধরায়।

কিন্তু যে ফণীর শিরে থাকে মহামণি
দন্ত তা'র বিষে ভরা। নিরখি' তা'দের
বলবীর্য্য, বুঝিয়াছি বীর হিন্দুজাতি ;
দুর্দ্ধর্ষ সমরক্ষেত্রে। বুঝিয়াছি আর(ও)
ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু ; হ'ক ধর্ম্ম তাহাদের
ভ্রমাত্মক, তবু প্রাণ দিবে তা'র তরে ;
প্রজা সেথা রাজ-ভক্ত ; রাজার আদেশে
অনলে, গরলে, জলে না ডরে মরিতে।
আছে জাতিভেদ সত্য, কিন্তু হিন্দু নামে
এক সূত্রে বাঁধা সবে। না বুঝি', না ভাবি'
হিন্দুস্থান-আক্রমণ উপযুক্ত নয়।
দেখিয়াছি হিন্দুস্থানে আছে তরু এক,
বট নামে ; মহাবাহু করিয়া বিস্তার,
আবরিয়া রাখে গ্রাম ; শাখা হ'তে তা'র
সূক্ষ্ম সূত্রসম মূল, পরশিয়া ভূমি,
ক্রমে হয় মহাতরু ; আকর্ষিয়া রস,
রহে সঞ্জীবিত, মূল বৃক্ষ ধ্বংস হ'লে।
তেমতি এ হিন্দুজাতি ধরে, জাঁহাপনা!
অপূর্ব্ব জীবনী শক্তি ; হ'ক মূলচ্ছেদ,
উৎপাটন, শাখা তবু রহিবে বাঁচিয়া।
কি কাজ বিবাদে তবে হেন শত্রুসহ ?
কি ফল প্রতিমাভঙ্গে, লুণ্ঠনে, পীড়নে ?"
"শুন, দূত!"
জাঁহান্দরে কহিলেন ঘোরী,—

"লভিয়াছ অভিজ্ঞতা, রহি' হিন্দুস্থানে ;
পার কি বলিতে তুমি সমর-কৌশল
কিরূপ হিন্দুর ? অশ্ব, গজ, পদাতিক
শিক্ষিত কেমন ? অসি, শূল, ধনুর্ব্বাণ—
কোন্ অস্ত্রে পটু তা'রা ?"

উত্তরিলা দূত,—

"নহি যোদ্ধা আমি, প্রভো ! বর্ণিব তথাপি
দেখিয়াছি যাহা ; হিন্দু বলী গজবলে।
সচল পর্ব্বত-সম গজযূথ যবে
হয় যুদ্ধে অগ্রসর, নাহি শক্তি কা'র(ও)
রোধিতে তা'দের বেগ ; প্রতিদ্বন্দ্বি-সেনা
চূর্ণ হয় দণ্ডমাত্রে। দেখিয়াছি আর(ও)
শরক্ষেপে অদ্বিতীয় হিন্দুপদাতিক,
অব্যর্থ সন্ধানী সবে। বিশ্বাস আমার
না পারিবে মুসলমান আঁটিতে হিন্দুরে
গজে, পদাতিক সৈন্যে ! দ্বিতীয় রুস্তম
জাঁহাপনা ! করুন তা' উচিত যা' হয়।"
ইঙ্গিতে বিদায় করি' রাজদূতগণে
কহিলেন তবে ঘোরী,—

"শুনিলে ত সবে,
যা কহিলা দূতগণ ? কিবা যুক্তি বল।"

কহিলা কুতব,—

"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—

চিরদিন ঘোষে লোক।
এ সৌন্দর্য্য-ভোগ যদি, পুরুষ হইয়া,
না করিনু, বৃথা জন্ম অবনীমণ্ডলে।”

যোগীন্দ্রনাথ বসু

বঙ্গভূমি

প্রণমি তোমারে আমি, সাগর-উত্থিতে
ষড়ৈশ্বর্য্যময়ি, অয়ি জননি আমার।
তোমার শ্রীপদ-রজঃ এখনো লভিতে
প্রসারিছে করপুট ক্ষুব্ধ পারাবার।

শতশৃঙ্গ-বাহু তুলি' হিমাদ্রি—শিয়রে
করিছেন আশীর্ব্বাদ—স্থিরনেত্রে চাহি';
শুভ্র মেঘ-জটাজাল দুলে বায়ুভরে,
স্নেহ-অশ্রু শতধারে ঝরে বক্ষঃ বহি'।

জ্বলিছে কিরীট তব—নিদাঘ-তপন,
ছুটিতেছে দিকে দিকে দীপ্তরশ্মি-শিখা;
জ্বলিয়া—জ্বলিয়া উঠে—শুষ্ক কাশবন,
নদীতট—বালুকায় সুবর্ণ-কণিকা।

গভীর সুন্দর-বনে তুমি শ্যামাঙ্গিনী,
বসি' স্নিগ্ধ বটমূলে—নেত্র নিদ্রাকুল !
শিরে ধরে ফণা-ছত্র কাল-ভুজঙ্গিনী,
অবলেহে পা-দু'খানি আগ্রহে শার্দ্দূল !

নব-বরষার চূর্ণ জলদ-কুন্তল,
উড়িয়ে—ছড়িয়ে পড়ে শ্রীমুখ আবরি' !
চাতকী ডাকিছে দূরে,শিখিনী চঞ্চল,
মেঘমন্দ্রে কৃষকের চিত্ত যায় ভরি' ।

বিস্তীর্ণ পদ্মার তুমি ভগ্ন উপকূলে
বসে' আছ মেঘস্তূপে অসিত-বরণা !
নক্রকুল নত-তুণ্ড পড়ি' পদমূলে,
তুলি' শুণ্ড করিযূথ করিছে বন্দনা ।

সরে মেঘ, ফুটে ধীরে বদন-চন্দ্রমা !
বিভোর চকোর উড়ে নয়ন-সোহাগে ;
লুটে ভূমে শ্রীঅঙ্গের শ্যামল সুষমা,
চরণ-অলক্তরাগ তড়াগে তড়াগে ।

মূর্ত্তিমতী হ'য়ে সতি এস ঘরে ঘরে,
রাখ' ক্ষুদ্র কপর্দ্দকে রাঙ্গা পা-দু'খানি !
ধান্য-শীর্ষ স্বর্ণঝাঁপি লও রাঙ্গা করে—
ভুলে' যাই—সর্ব্ব দৈন্য, সর্ব্ব দুঃখ-গ্লানি !

ছুটি নবোৎসাহে মাঠে ল'য়ে গাভীদলে,
হিমসিক্তভূণভূমি শুষ্ক পদ্মদল ;
হরিত ধান্যের ক্ষেত্রে, পীত রৌদ্রতলে
বিছায়ে দিয়েছ তব সুবর্ণ-অঞ্চল !

কুজ্ঝাটি-সায়াহ্নে হেরি—মৃগযূথ-সাথে
ছুটিছ নির্ঝর-তীরে চকিতা চঞ্চলা !
মদির-মধুক-বনে, ম্লান জ্যোৎস্না রাতে
ল'য়ে তুমি ঋক্ষ-শিশু ক্রীড়ায় বিহ্বলা !

নিস্তব্ধ জয়ন্তী-চূড়ে সান্দ্র অন্ধকার,
কণ্টকীলতায় গেছে গিরিভূমি ভরি' ;
গহ্বরে গহ্বরে বন্য-বরাহ-ঘুৎকার,
বহিছে উত্তর-বায়ু শিহরি' শিহরি'।

হেরি—তুমি সাশ্রুনেত্রে অবনত-শিরে
পরিত্যক্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমিছ দুঃখিনী !
ভগ্নস্তূপে, শিলাখণ্ডে, বিনষ্ট মন্দিরে,
খুঁজিছ পুত্রের কীর্ত্তি—অতীত কাহিনী !

অশোকে কিংশুকে গেছে ছাইয়া প্রান্তর,
পিককণ্ঠ-কলতান্ উঠে দিকে দিকে ;
চূত-মুকুলের গন্ধে মরুত-মন্থর,
এস হৃৎ-পদ্মাসনে, সর্ব্বার্থ-সাধিকে !

এস—চণ্ডিদাস-গীতি, শ্রীচৈতন্য-প্রীতি,
রঘুনাথ-জ্ঞানদীপ্তি, জয়দেব-ধ্বনি !
প্রতাপ-কেদার-বাঞ্ছা, গণেশ-সুকৃতি,
মুকুন্দ-প্রসাদ, মধু-বঙ্কিম-জননি !

অক্ষয়কুমার বড়াল।

ধাত্রী পান্না

দশ মাস গর্ভে তোরে করেছি ধারণ,
স্নেহের পুতুলি তুই, তুলি তোরে বুকে,
করায়েছি স্তন্যপান, লালন পালন।
কত যে করেছি, নিজে কি বলিব মুখে।
সমুদ্রের পার আছে, তল আছে তার।
অতল অপার মাতৃস্নেহ-পারাবার !

অগাধ সে স্নেহসিন্ধু, অভাগী পান্নার
নিয়তির ফলে আজি শুষ্ক মরুস্থল !
মন্দাকিনী-নীরধারা, স্বাদু দেবতার,
বৈতরণী-স্রোত তাহে রহিল প্রবল।
শিরীষকুসুম আজি কঠিন কুলিশ,
মলয়জ পঙ্ক হ'লো দুর্গন্ধ পুরীষ।

বাঘিনী, রুধির পানে নিয়ত লোলুপা,
আপন সন্তানে তারো প্রবল মমতা ;
পরসুত-ঘাতিনী পূতনা গোপীরূপা,
নিজপুত্রে স্তনদানে করেনি খলতা ;
বাঘিনী, রাক্ষসী, বড় নির্দ্দয় জগতে,
তারা কিন্তু শতগুণে ভাল আমা হ'তে।

হায় বৎস এ বীভৎস কার্য্য-সম্পাদনে
পাপীয়সী পান্না বই সাধ্য আর কার ?
পরলোকগত পতি, তাঁর স্থাপ্য ধনে
ডাকাতি করিতে আজি প্রবৃত্তি আমার !
পতিকুলে দিতে, বাপ ! নিবাপ-অঞ্জলি,
কেহ না রহিবে, তোরে যমে দিলে বলি !

কেন রে অজস্র অশ্রু হৃদি বজ্রসারে
পড়িস্ বহিয়া, পান্না পাশরিবে স্নেহ।
'অশ্বত্থামা হত' এই মিথ্যা সমাচারে
কুরুক্ষেত্র রণে দ্রোণ ত্যজিলেন দেহ ;
মহারথ তিনি, তবু বাৎসল্যের দাস !
নারী হয়ে বীরধর্ম্ম করিব প্রকাশ।

স্বার্থত্যাগ মহামন্ত্রে দীক্ষা যার আছে,
কঠোর বীরের ধর্ম্ম পালে সেই জনে,
আত্ম-পরিজন-স্নেহ তুচ্ছ তার কাছে,
স্থিরলক্ষ্য একমাত্র সঙ্কল্পসাধনে।

ভীরুতা মমতা, দুয়ে নিকট সম্বন্ধ,
কাপুরুষ ক্ষুদ্র-চেতা সদা স্বার্থে অন্ধ।

কুলপাংশুলার গর্ভে জনম যাহার,
সেই দাসী-পুত্র হবে মিবারের রাজা?
খদ্যোতে হরিয়া লবে দ্যুতি চন্দ্রমার?
মৃগেন্দ্র-বিক্রমে বনে বিচরিবে অজা?
অসুরে অমৃতভাণ্ড করিবে হরণ?
কুকুরে যজ্ঞের হবি করিবে লেহন?

না দিব ঘটিতে হেন, বাঁচাব কুমারে;
হিন্দুর গৌরব-রবি রাণাবংশধর
রহিবে অক্ষত দেহে, বলুক্ আমারে
অপত্যঘাতিনী লোকে, তাহে নাহি ডর।
দাতাকর্ণ লভে পুণ্য, বধি বৃষকেতু,
আমার অপত্যবধ হবে ধর্ম্মহেতু।

এস পুত্র। পরাইব রত্ন-আভরণ,
সাজাব তোমারে স্বর্ণ-খচিত সুবেশে,
পালঙ্কের অঙ্কে তোমা করিয়া স্থাপন
কাঁপাব চামর-বাতে কাকপক্ষ-কেশে।
নির্জ্জল নিশ্চল নেত্রে চাব মুখপানে,
যাবৎ না হও ছিন্ন ঘাতক-কৃপাণে।

পলাও উদয়সিংহ, সিংহের শাবক,
শৃগালের বৃত্তি এবে আশ্রয় তোমার ;
জ্বলিবে যখন তব পৌরুষ-পাবক,
উৎপাত-পতঙ্গ পুড়ে হবে ছারখার।
ঢাকুক্‌ প্রভাত-রবি কুহেলী-তিমির,
অচিরে প্রদীপ্ত তেজে উঠিবে মিহির।

যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

স্বদেশ আমার

স্বদেশ আমার! নাহি করি দরশন
তোমা সম রম্যভূমি নয়ন-রঞ্জন।
তোমার হরিত ক্ষেত্র, আনন্দে ভাসায় নেত্র,
তটিনীর মধুরিমা তোষে প্রাণ মন।
প্রভাতে অরুণ-ছটা, সায়াহ্ন-অম্বরে
সুরঞ্জিত মেঘমালা কান্ত রবিকরে,
নিশীথে সুধাংশুকর, তারা-মাথা নীলাম্বর,
কে ভুলিবে, কে ভুলিবে থাকিতে জীবন!

কোথায় প্রকৃতি এত খুলিয়ে ভাণ্ডার
বিতরেন মুক্ত করে শোভারাশি তাঁর ?
প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি বনে, প্রতি কুঞ্জ উপবনে
কোথা এত—কোথা এত বিমোহে নয়ন ?
বাসন্ত কুসুমরাজি বিবিধ বরণ
চুম্বি কোথা এত স্নিগ্ধ বহে সমীরণ ?
তরুরাজি তব সম, কলকণ্ঠ বিহঙ্গম,
পাইব না, পাইব না খুঁজিয়া ভুবন !
কোথাকার দৃশ্যাবলী সুচারু এমন ?
যথায় যাইব আমি, তোমারে জনমভূমি,
ভুলিব না, ভুলিব না জীবনে কখন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

লক্ষ্যপথে

দৈন্য যদি আসে, আসুক্, লজ্জা কিবা তাহে ?
মাথা উঁচু রাখিস্।
সুখের সাথী মুখের পানে যদি নাহি চাহে,
ধৈর্য্য ধরে' থাকিস্।
রুদ্ররূপে তীব্র দুঃখ যদি আসে নেমে,
বুক ফুলিয়ে দাঁড়াস্।
আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় পড়ে ভেঙ্গে,
ঊর্দ্ধে দু'হাত বাড়াস্।
চোখের জলে ভিজে আওয়াজ কেউ যেন না শোনে,
মাকে যখন ডাকিস্।
তাঁর-ই দেওয়া অন্ধকারের গাঢ়তম কোণে,
মুখখানি তোর ঢাকিস্।
আধি-ব্যাধির ধান-দূর্ব্বা পূর্ণ আশীর্ব্বাদে,
মাথায় ঝরে' পড়ুক্।
বাসা-ভাঙ্গা সুখের আশা জীর্ণ জরার সাথে,
স্তব্ধ হ'য়ে মরুক্।
কোথায় তুমি তথাগত ব্যাধি-জরা-জয়ী ?
দাঁড়াও এসে কাছে !
নিত্য উৎসরিত তোমার আলোর ঝরা কই
অন্ধকূপের মাঝে ?

ভগ্ন স্তূপের জীর্ণ মঞ্চের সুপ্ত ছায়া জুড়ে'
মৃত্যু বাসা বাঁধে।
অমানিশার রুদ্ধকারায় ক্ষুব্ধ বায়ু ঘুরে'
নিঃশ্বসিয়ে কাঁদে।
বিশ্বপটের চারুদৃশ্য মুছে গেল বলে'
বুক যেন না দমে।
নির্ভয়ে তুই রাখ্‌ রে মাথা কালরাত্রির কোলে;
কর্‌বে কিবা যমে?
থাক্‌বে দুঃখ, দৈন্য, জরা শুকিয়ে ঘাটের পাড়ে,
তুচ্ছ করিস্‌ তাকে।
ঐ শোন্‌ রে বাজিয়ে বাঁশী নদীর পরপারে,
কে যেন রে ডাকে।
সুর বেঁধে নে ওরে আতুর, পরপারের গাথার
মধু-ঝরা সুরে।
ক্লান্তি-ভরা শান্তি-হরা গুরু বোঝা মাথার
ফেলে দিয়ে দূরে,
গাও রে প্রীতির নবগীতি! মৃত্যু মরুক্‌ কেঁদে,—
কেউ পাবে না সাড়া।
যাক্‌ না ডুবে রূপের জগৎ! নূতন বিশ্ব বেঁধে
সোজা হয়ে দাঁড়া।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বিজয়া *

বিনামেঘে বজ্রাঘাত,
অকস্মাৎ ইন্দ্রপাত,
বিনাবাতে নিভে গেল মঙ্গল-প্রদীপ।
শমন পাইত শঙ্কা,
সম্মুখে শোনাতে ডঙ্কা,
প্রবাসে তস্করবেশে হইল প্রতীপ॥

দুর্দ্দম প্রতাপে পুষ্ট,
স্পষ্টবাদে স্তব্ধ দুষ্ট,
অশিষ্ট-শাসনপটু শিষ্টের সহায়
বিদ্যাপীঠে গোষ্ঠিপতি,
একচেষ্ট হৃষ্টমতি,
জয়পত্র-লিপ্ত ভালে সর্ব্বত্র সভায়॥

দ্বিজবুদ্ধি, তেজে ক্ষত্র,
কর্ম্মক্ষেত্রে যত্র তত্র,
অধিপতি একচ্ছত্র জন্ম অধিকার।
প্রতিভার পূর্ণদৃষ্টি,
করিত নূতন সৃষ্টি,
ধ্বংসমুখী নহে মাত্র চিত্ত অবিকার॥

* সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু উপলক্ষে।

কেশাগ্র নখাস্তে দীপ্ত,
জাগ্রৎ জীবন লিপ্ত,
সুস্থ দেহ দীপ্ত মন সুবিরাট্ কায়।
মরণের হোলো বশ্য,
মুহূর্ত্তে হইল ভস্ম,
অধরের চিরহাস্য নিমেষে শুখায়॥

বঙ্গ-কণ্ঠ শূন্য ক'রে,
বিহার কি হার হরে,
অগ্নি জ্বেলে দিলি দ্বেষে ভগ্নীর অন্তরে।
অহিংসার জন্মভূমি,
বুদ্ধের জননী তুমি,
বিস্মৃতিতে বিসর্জ্জিলি গৌতম-মন্তরে॥

ধ্যানে যাঁর ছিল দৃষ্টি,
নবীন নালন্দা-সৃষ্টি,
ভারতের ভারতীরে জাগাতে আবার।
আলো দিতে এ জগতে,
জ্ঞান-জ্যোতি প্রাচ্য হ'তে,
পুনরায় যায় যাতে বারিতে আঁধার॥

না হইতে কর্ম্ম-সাঙ্গ,
মধ্যপথে ব্রত-ভঙ্গ,
বঙ্গের বরাঙ্গ বীর লুকাল কোথায়।

তন্দ্রাহীন কর্ম্ম-রঙ্গে
বিরোধ বিশ্রাম সঙ্গে,
আলস্য উপাস্য চির হোলো ছলনায় ॥

সার্থক পুরুষ নাম,
পৌরুষের পূর্ণধাম,
ক্ষমবান্ দম্ভি-দর্প করিবারে চূর্ণ।
দীনজনে আশুতোষ,
বিদ্রোহীরে রুদ্ররোষ,
বিদ্বানে বন্ধুত্ব-বাঁধে বেঁধে নিতে তূর্ণ ॥

এ বঙ্গের যত ছাত্র,
ছিল তব স্নেহপাত্র,
তারাই তো পুত্র মিত্র স্বাগত অতিথি।
অনর্গল গৃহদ্বার,
ঢল ঢল হৃদাধার,
কত অশ্রুজল দেব মুছায়েছ নিতি ॥

মাতৃ-গোত্রে প্রীতি অতি,
আশুতোষ সরস্বতী—
উপাধি-ভূষণ তব বিজয়-নিশান।
দেখিতে দেখিতে হায়,
সরস্বতীপূজা সায়,
বিষাদের বিজয়ায় প্রতিমা-ভাসান ॥

এ নগরী নিরানন্দে,
সাজাইয়া পুষ্প-গন্ধে
দেব-দেহ লয়ে স্কন্ধে করিল বহন।
জগত জাগায়ে নামে,
ফিরে গেলে নিজ ধামে,
আদিগঙ্গা-তীর্থ-তীরে দেহের দাহন ॥

অমৃতলাল বসু।